মুহাম্মদ, জিহাদ ও ইসলামের সহিংস প্রসার

এম এ খান

প্রথম প্রকাশ

মে ২০১২

গ্রন্থস্বত্ব
প্রকাশক

প্রকাশক
ব- দ্বীপ প্রকাশন
৬৩ কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
২৫৩- ২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড,   কাঁটাবন
ঢাকা- ১২০৫

মুদ্রণ
ব- দ্বীপ প্রকাশন মুদ্রণ বিভাগ

প্রচ্ছদ
সানিউর রহমান

মূল্য : টাকা ৩০০.০০

ISBN : 978-984-8289-26-6

Muhammad, Jihad O Islamer Sahingsa Prosar by M A. Khan. Published by Ba-dweep Prakashan, 63, Concord Emporium Shopping

Complex, 253-54 Elephant Road, Kantaban, Dhaka-1205. Price : $ 50.00

প্রকাশকের ভূমিকা

জিহাদ হচ্ছে ইসলামের প্রাণশক্তির উৎস। জিহাদের মাধ্যমে মুহাম্মদ কীভাবে ইসলামের প্রসার ঘটিয়েছেন মূলত সেই বিষয়েই এই গ্রন্থে বলা হয়েছে। লেখক এম. এ. খানের 'জিহাদ : জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরকরণ, সাম্রাজ্যবাদ ও দাসত্বের উত্তরাধিকার' নামক গ্রন্থের প্রথম অংশ অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত হওয়ায় মূল গ্রন্থের সঙ্গে এর বিষয়বস্তুতে মিল আছে। তবে এটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি গ্রন্থ, যা পাঠকদেরকে ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার প্রক্রিয়ায় মুহাম্মদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা দিবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

মে ২০১২

সূচী

অধ্যায় ১ সূচনা ৭
অধ্যায় ২ ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ১৩
অধ্যায় ৩ নবীর জীবন ও জিহাদের জন্ম ২০
অধ্যায় ৪ ইসলামের প্রসার: শক্তির জোরে না শান্তিপূর্ণ উপায়ে ৯৯
উপসংহার ১৯৪
Bi bl i ogr aphy ১৯৫

অধ্যায় ১

সূচনা

বিশ্বের প্রায় এক- চতুর্থাংশ মানুষ আজ মুসলিম: বাংলাদেশে শতকরা ৯০ ভাগ, পাকিস্তানে ৯৬ ভাগ, ভারতে ১৬ ভাগ। বিশ্ব- জনসংখ্যার এ বিশাল অংশের ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম মুসলিমদের জন্য কেবল একটা ব্যক্তিগত ধর্মই নয়, সেটি তাদের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানও বটে। অন্য কথায়, ইসলাম মুসলিমদের জন্য আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনার উৎস। অথচ আমার ৩৫ বছরের মুসলিম জীবনে ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মুসলিমদের সাথে যথেষ্ট উঠা- বসার ভিত্তিতে খুবই কম মুসলিমকে দেখেছি, যারা ইসলাম সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখে। ইসলাম যদি জীবনের পূর্ণাঙ্গ জীবন্তবিধানই হয়, তাহলে প্রকৃত ইসলামী জীবন যাপনের জন্য ইসলামকে বুঝা - অথাৎ কুরআন, হাদীস ও সিরার (মহানবীর জীবনী) ভাষ্যকে হৃদয়ঙ্গম করা - প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। অথচ এ অঞ্চলের খুব কম মুসলিমই তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কুরআন পড়ে; হাদীস ও সিরার কথা না- হয় বাদই দিলাম। এবং যেসব অল্প- সংখ্যক মুসলিম কুরআন পড়ে, তাদের ব্যাপক সিংহভাগ তা পড়ে আরবী ভাষায় - যার অর্থ কিছুই বুঝে না তারা।

সার্বিকভাবে এ অঞ্চলের শিক্ষিত মুসলিমদেরও শতকরা ৯৯ ভাগ কুরআনে ধারণকৃত তাদের জীবন যাপনের নির্দেশনা সম্পর্কে কোন সঠিক জ্ঞান রাখে না। অথচ ইসলামকে জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিধান হিসেবে অনুকরণ করতে হলে কুরআনের পাশাপাশি তাদেরকে হাদীস এবং সিরার উপরও যথেষ্ট জ্ঞান রাখতে হবে। আমরা মুসলিমরা অহঙ্কারের সাথে বলি: ইসলাম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং পূর্ণাঙ্গ ও সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন

বিধান - যার মানে হচ্ছে, মুসলিমদের জন্য পৃথিবীতে সার্থক ও সফল জীবনযাপনের জন্য ইসলামের বাইরে, তথা কুরআন- হাদীস- সিরার বাইরে, আর কিছুই জানার, বুঝার বা শিখার আবশ্যকতা নাই। অথচ এ অঞ্চলে মাতৃভাষায় বা বোধগম্য কোন ভাষায় কেবল কুরআন পড়ে ও বোঝে এমন মুসলিমের সংখ্যা খুবই নগণ্য; হাদীস- সিরার কথা তো আসেই না। কাজেই প্রশ্ন জাগে : আমরা ক'জন প্রকৃত অর্থে ইসলামকে আমাদের ধর্ম তথা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করেছি? এবং প্রশ্নটির উত্তর কারোরই অজানা থাকার কথা নয়।

অন্যদিকে ইসলামের জন্ম হয়েছিল সুদূর আরব মরুভূমিতে। সেখান থেকে ইসলাম কীভাবে আমাদের এ অঞ্চলে এসেছিল এবং কীভাবে তা ভারতবর্ষের বেশ বড় সংখ্যক অধিবাসীর মাঝে বিস্তার লাভ করেছিল - সে সম্পর্কেও আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। ইসলামের আগমন ও বিস্তার সম্পর্কে এ অঞ্চলের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের (অমুসলিমেরও) জ্ঞানের পরিধি হচ্ছে: ৭১২ সালে যুবক ইসলামী বীর মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষে সুমহান ইসলামের আলোক- বর্তিকা নিয়ে আসেন, কিংবা ইসলামের সুমহান বীর বখতিয়ার খিলজী ১২০৪- ৫ সালে বিহার ও বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে সুদূর দক্ষিণ- পূর্ব ভারতে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিলেন। কিন্তু তারপর কীভাবে বিরাট সংখ্যক ভারতীয় অমুসলিম (হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি) ইসলামের পতাকা তলে হাজির হলো, সে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। এ বিষয়ে যারা একটু বেশী জ্ঞান রাখেন, তাদের ধারণা : খাজা মইনুদ্দিন চিশ্‌তী, নিজামুদ্দিন আউলিয়া ও শাহ্‌জালাল প্রমুখ সুমহান সূফীরা (পীর- দরবেশ) এসে ইসলামের শান্তির বার্তা জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেন, যাতে উদ্বেলিত হয়ে এ অঞ্চলের অমুসলিমরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। অথচ ভারতে আগত সর্বাধিক খ্যাতনামা ও সুমহান সূফী- পীর নিজামুদ্দিন আউলিয়ার জীবনী 'ফাওয়াইদ- উ- ফুয়াদ'- এ তার চাহনির কেরামতিতে মাত্র দুজন দই বিক্রেতাকে ইসলামে দীক্ষিত করার কথা বর্ণিত হয়েছে; [1] এবং দাক্ষিণাত্য ও কাশ্মীরের সুবিখ্যাত সূফীদেরকে আমরা দেখি চরম অত্যাচার- নির্যাতন চালিয়ে অমুসলিমদেরকে মুসলিম

---

[1] Lal, K. S. (1990) *Indian Muslims: Who Are They*, Voice of India, New Delhi, p. 93

বানাতে।[2] একইরূপে বাংলায় পীর শাহ্জালালের আগমন ঘটেছিল তলোয়ার হাতে গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ইসলামের প্রকৃত ভিত্তি এবং আমাদের ভারতবর্ষীয় অঞ্চলে তথা আরবাঞ্চল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের বিস্তার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই কম অথবা বাস্তবতা- ভিত্তিক নয়।

ওদিকে ২০০১ সালে ওসামা বিন লাদেনের আল- কায়েদা সন্ত্রাসী দল কর্তৃক ইসলামী জিহাদের নামে আমেরিকায় ৯/১১ হামলার পর জিহাদ তত্ত্বটি সর্বত্র আলোচনার লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। এবং জিহাদ প্রকৃতপক্ষে কী সে বিষয়ে চলছে মস্তিষ্ক- দগ্ধকারী বিতর্ক। সে বিতর্কের উপর কিছুটা আলোকপাত করা যাক এখানে।

ইসলামী 'জিহাদ' কিংবা 'ধর্মযুদ্ধ'- এর অর্থ হলো আল্লাহর পথে লড়াই করা, যা কুরআনের বহু আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ স্বয়ং ইসলামের ধর্মতত্ত্বে সন্নিবেশিত করেছেন। যেমন বলা হয়েছে কুরআনের ২:১৯৩ নং আয়াতে: লড়াই করে যাও তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়ে; তবে সীমা লঙ্ঘন করো না, কেননা আল্লাহ্সীমা লঙ্ঘনকারীকে ভালবাসেন না। কুরআনে জিহাদ সম্পর্কে এ ধরনের ২০০- টিরও বেশী আয়াত রয়েছে। বর্তমান সময়ের সহিংস জিহাদের সুবিখ্যাত নায়ক ওসামা বিন লাদেন অবিশ্বাসীদের (অমুসলিমদের) বিরুদ্ধে তার জিহাদী প্রচারণার যে ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা হলো : [3]

মুসলিম ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে আল্লাহর সংক্ষিপ্ত ভাষ্য: 'আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি। এক আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত তোমাদের ও আমাদের মধ্যে অনন্তকাল ঘৃণা ও শত্রুতা বিরাজ করবে।' সুতরাং (মুসলিমদের) অন্তরে (অমুসলিমদের প্রতি) একটা প্রচণ্ড বিদ্বেষমূলক শত্রুতা রয়েছে। আর এ প্রচণ্ড শত্রুতা অর্থাৎ লড়াই নিবৃত্ত হবে যদি অবিশ্বাসীরা ইসলামের কর্তৃত্বের কাছে নত হয়, অথবা যদি তাদের শরীর থেকে রক্তঝরা বন্ধ হয়ে যায়, অথবা যদি মুসলিমরা সে সময় দুর্বল ও অসমর্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু কোন

---

2 Khan M. A. (2009) *Islamic Jihad: A Legacy of Forced Conversion, Imperialism and Slavery*, iUniverse inc., New York, p. 116, 128-130.

3. Raymond Ibrahim, *the two Faces of Al Qaeda*, Chronicle Review, 21 September 2007.

সময় যদি (মুসলমানদের) হৃদয় থেকে এ ঘৃণা অন্তর্হিত হয়, সেটা হবে স্বধর্ম ত্যাগের শামিল। অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে নবীর প্রতি সর্বশক্তিমান আল্লাহর বাণীর সত্যিকার মর্মকথা হচ্ছে: 'ও নবী! অবিশ্বাসী ও ভণ্ডদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; তাদের প্রতি নির্মম হও। তারা দুর্ভাগা, তাদের স্থান নরকে।' অতএব এটাই হচ্ছে অবিশ্বাসী ও মুসলিমদের মধ্যকার সম্পর্কের মূল ভিত্তি। অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে মুসলিম পরিচালিত যুদ্ধ, বিদ্বেষ এবং ঘৃণাই আমাদের ধর্মের ভিত্তি। আমরা একে তাদের প্রতি ন্যায়বিচার ও দয়া বলেই মনে করি।

অপরদিকে জিহাদের ধর্মীয় ভিত্তি যে অমুসলিমদের প্রতি মুসলিমদের এ একমুখী ও লাগামহীন বিদ্বেষ, সে মতবাদের বিরোধিতা করেন অনেকে। বহু মধ্যপন্থী মুসলিম ও ইসলামের পণ্ডিত বলেন যে, আল-কায়েদা ও তার সমমনা ইসলামী দলগুলোর দ্বারা সংঘটিত বেপরোয়া সহিংস কর্মকাণ্ডকে অবশ্যই জিহাদ বলা যায় না। তারা মনে করেন, জিহাদ হলো শান্তিপূর্ণ আধ্যাত্মিক সংগ্রাম, সহিংসতার সাথে যার কোন সম্পর্ক নাই। প্রেসিডেন্ট বুশের মত তারাও মনে করেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম এবং এর সাথে সহিংসতার কোন সম্পর্ক নেই। অনেক অমুসলিম ইসলামী পণ্ডিতও দাবী করেন যে, ইসলামের ইতিহাসের উৎকর্ষ বা বিশুদ্ধতার চিহ্ন হলো সহনশীলতা, শান্তি ও সমতা, যা খ্রীষ্টানরা তাদের মুসলিম (যেমন স্পেনে) ও অন্যান্য অখ্রীষ্টান প্রজাদের (যেমন ইউরোপ ও আমেরিকার প্যাগান ও ইহুদী) প্রতি দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে।

ব্রাসেল্‌সে ১৯-২১ ফেব্রুয়ারী ২০০৮-এ ইস্ট-ওয়েস্ট ইনস্টিটিউট আয়োজিত একটি সন্ত্রাসবিরোধী সম্মেলনে বক্তারা দাবী করেন যে, আল-কায়েদার সহিংসতা থেকে 'জিহাদ' শব্দটিকে আলাদা করতে হবে। কারণ অধিকাংশ মুসলিমের মতে 'জিহাদ' মানে আধ্যাত্মিক একটা সংগ্রাম। অপশক্তির দ্বারা 'জিহাদ' শব্দটির আরও ছিনতাই হোক, সেটি তারা চান না। সম্মেলনে ইরাকী পণ্ডিত শেখ মোহাম্মদ আলী বলেন, 'নিজ আত্মার ভিতরের সকল অশুভ প্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রামই হলো জিহাদ; ইসলামে কোনো জিহাদী সন্ত্রাসবাদ নেই।'

জিহাদ দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা বিস্তার অথবা জীবনে অত্যন্ত ইতিবাচক কিছু করার জন্য সংগ্রাম হতে পারে - এ কথার উপর জোর দিয়ে পাকিস্তানের জয়েন্ট চীফস অব আর্মি স্টাফের সাবেক চেয়ারম্যান জেনারেল এহসান উল হক বলেন: 'সন্ত্রাসবাদীদেরকে জিহাদী বলে আখ্যায়িত করা হলো ইসলামের উপলব্ধির ঘাটতির প্রতিফলন' অথবা দুর্ভাগ্যবশত, 'একটি ইচ্ছাকৃত অপব্যবহার।'[4] ৯/১১'র পর থেকে আল-কায়েদা জিহাদের নামে কোরাস গাওয়া শুরু করার পর মুসলিম তথা অনেক অমুসলিম পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ জিহাদের অহিংস ধারণার সপক্ষে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। ড্যানিয়েল পাইপ্‌স জিহাদের ইতিবাচক চিত্র সম্পর্কে সে সব পণ্ডিতদের বেশ কয়েকটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন, যা এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো।[5]

জিহাদ সম্পর্কে হার্ভার্ড ইসলামীক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট জায়েদ ইয়াসিন (বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত) ২০০২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রদান অনুষ্ঠানে 'মাই আমেরিকান জিহাদ' শিরোনামে এক বক্তৃতায় বলেন, 'জিহাদের সত্য ও বিশুদ্ধ রূপ, যা সকল মুসলিম কামনা করে, তা হলো নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে হলেও যা সঠিক, যা ন্যায়সঙ্গত, তা-ই করা। নিজস্ব নৈতিক আচরণের জন্য এটি একটি ব্যক্তিগত সংগ্রাম।' সে অনুষ্ঠানে হার্ভার্ডের ডীন মাইকেল শিনাজীল, ইসলাম ধর্মের উপর বিশেষ কোন জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও, জিহাদকে ন্যায় বিচার এগিয়ে নেওয়া এবং নিজেদেরকে ও সমাজকে জানার জন্য ব্যক্তিগত সংগ্রাম আখ্যা দিয়ে জিহাদ সম্পর্কে ইয়াসিনের ব্যাখ্যাকে স্বীকৃতি দেন। এবং হার্ভার্ড ইসলামীক সোসাইটির উপদেষ্টা প্রফেসর ডেভিড মিটেন সত্যিকারের জিহাদকে মুসলিমদের সহজাত প্রবৃত্তিকে জয়, ঈশ্বরের পথ অনুসরণ ও সমাজে ভাল কাজ করার সংগ্রাম হিসেবে বর্ণনা করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অনেকেই জিহাদের এ ধারণা প্রচার করছেন। উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জো এলডার

---

4. *What is jihad? Language still hinders terror fight*, Reuters, 20 Feb, 2008.
5. Pipes D (2003) *Militant Islam Reaches America*, WW Norton, New York, p. 258-68

জিহাদকে 'ধর্মীয় সংগ্রাম হিসেবে দেখেন, যা ধর্মের গভীর ব্যক্তিগত সংগ্রামকে ঘনিষ্ঠরূপে প্রতিফলিত করে।' ওয়েলস্লি কলেজের অধ্যাপক রোক্সেন ইউবেন্তএর কাছে জিহাদের অর্থ হলো 'আবেগ প্রতিহত করা ও একজন শ্রেয়তর মানুষে পরিণত হওয়া।' এদিকে জর্জিয়া- সাউদার্ন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক পার্সেলস্জিহাদকে দেখেন 'নিজের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রামরূপে'। আর্মস্ট্রং আটলান্টিক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক নেড রিনালডুক্সি'র কাছে জিহাদের লক্ষ্য হলো, 'ভিতরে ভাল মুসলিম হওয়া ও বাহিরে একটা ন্যায় সমাজ সৃষ্টি করা।' নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফরিদ ইসেক- এর কাছে জিহাদের অর্থ 'বর্ণবাদ প্রতিরোধ ও নারী অধিকারের জন্য কাজ করা'। ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামীক স্টাডিজের বিশিষ্ট অধ্যাপক ব্রুস লরেন্স- এর কাছে জিহাদের অর্থ হলো 'একজন ভাল ছাত্র, একজন ভাল সহকর্মী, একজন ভাল ব্যবসায়িক অংশীদার হওয়া। সর্বোপরি ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করা। তার মতে, এমন কি অমুসলিমরাও জিহাদের নৈতিক উৎকর্ষ অর্জনের চেষ্টা করতে পারে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ অন্যায়পূর্ণ পৃথিবীতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজস্ব পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তনের মাধ্যমে জিহাদের উৎকর্ষ অর্জন করতে পারে।

জিহাদের এ অহিংস ও মঙ্গলমুখী ধারণার বিরুদ্ধে আল- কায়েদাসহ অসংখ্য মৌলবাদী ইসলামী দল উল্লসিত চিত্তে দাবী করে যে, অবিশ্বাসীদের, বিশেষ করে পশ্চিমা ও পশ্চিম- ঘেঁষা মিত্র ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সরকারের বিরুদ্ধে তাদের পরিচালিত সহিংস কর্মকাণ্ডই হলো জিহাদ। অনেক সময় তারা তাদের যুক্তির সপক্ষে কুরআন থেকে উদ্ধৃতি ও নবী মুহাম্মদের জীবনের উদাহরণ তুলে ধরে। স্পষ্টতঃ জিহাদের এ উগ্রবাদী মতবাদের ব্যাপারে যথেষ্ট মতানৈক্য বা অস্বীকৃতি রয়েছে।

স্পষ্টত জিহাদের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে ব্যাপক বিতর্ক রয়েছে, রয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দাবী, যা সাধারণ পাঠক বা মুসলিমকে ফেলে দেবে চরম বিভ্রান্তির মাঝে। একই রকম সমস্যা বা বিভ্রান্তি রয়েছে ইসলামের অন্যান্য বিষয় বা দাবীতেও। মুসলিমদের দাবীতে ইসলাম

ধর্মের অর্থ হচ্ছে শান্তি - অর্থাৎ ইসলাম মানবজাতির জন্য এনেছিল শান্তি ও ন্যায়ের বার্তা। যেমন আমরা ভারতবর্ষীয় অঞ্চলের মুসলিমরা বলে থাকি যে, মুহাম্মদ বিন কাসিম ভারতবর্ষে কিংবা বখতিয়ার খিলজী বাংলায় ইসলামের শান্তির আলোক বর্তিকা এনে দিয়েছিলেন। অথচ ইসলামের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখি কেবলই যুদ্ধ, খুনাখুনি, রক্তপাত, কিংবা ভারতবর্ষের দিকে তাকালে দেখি তলোয়ার হাতে মুহাম্মদ বিন কাসিম বা বখতিয়ার খিলজী ভারতীয়দের রক্তে রাস্তা রঞ্জিত করেছেন। একইভাবে মুসলিমদেরকে শিখানো হয় যে: নবী মুহাম্মদ এসেছিলেন পৃথিবীতে স্বর্গীয় শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দিতে, পৃথিবীকে শান্তিতে ভরে তুলতে। কুরআনে আল্লাহ স্বয়ং বলেছেন যে, তিনি নবী মুহাম্মদকে প্রেরণ করেছিলেন মানবজাতির প্রতি করুণা হিসেবে। অথচ নবী মুহাম্মদের জীবনের দিকে তাকালে - বিশেষত তাঁর জীবনের শেষ ১০ বছরের দিকে, যখন তিনি বাহুবলে শক্তিশালী হয়ে উঠেন - আমরা দেখি কেবলই যুদ্ধ, খুনাখুনি ও রক্তপাত।

যুদ্ধ, খুনাখুনি ও রক্তপাতের সাথে শান্তির কী সম্পর্ক রয়েছে? সত্যিকার শান্তিপূর্ণভাবে ধর্ম প্রচার ও প্রসারের কথা বললে আমরা তাকাতে পারি বাংলা ও বিহার থেকে সুদূর মধ্য এশিয়া, চীন, জাপান ও কোরিয়া পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারের দিকে। সেসব সুদূর ভূখণ্ডে সফল প্রচার ও বিস্তার লাভের জন্য বৌদ্ধ ধর্মকে তলোয়ারধারী যোদ্ধাবাহিনীর লেজ ধরে এগোতে হয় নি। বরং সেসব দূর দেশে আমাদের ভারতবর্ষীয় অঞ্চল থেকে পাঠানো হয়েছিল কিছু নিরীহ ও শান্তিবাদী ধর্ম প্রচারক।

কাজেই ইসলামের দিকে উঁকি মারলে আমরা লক্ষ্য করি যে, ধর্মটির প্রত্যেকটি বড় বড় মৌলিক দাবী বা বিষয় আত্ম- বিতর্কে বা দ্বন্দ্বে পূর্ণ। এরূপ কিছু বিষয় হচ্ছে:

১) ইসলামের প্রকৃত বার্তা কি বা জিহাদের প্রকৃত অর্থ কি?

২) সে বার্তার প্রচার ও প্রসারে নবী মুহাম্মদের কর্মপন্থা কী ছিল? এবং

৩) ইসলামের পূণ্যভূমি আরব দেশ থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত তথা বিশ্বব্যাপী ধর্মটির প্রসার কিভাবে ঘটেছিল?

বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে এটাও অস্বীকার করার উপায় নাই যে, ভুল ধারণা বশত হোক বা নাই হোক, সহিংস ইসলামী দলগুলো 'আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধের' অকাট্য বিশ্বাসে ভবিষ্যতে নারী- শিশুসহ নিরীহ মানুষের উপর সহিংসতা ও সন্ত্রাস অব্যাহত রাখবে। এজন্য মানব জীবন ও সমাজ ভোগ করবে অবর্ণনীয় দুঃখ- দুর্দশা, ক্ষয়ক্ষতি ও ধ্বংসযজ্ঞ। আজকের বিশ্বে প্রতিটি জাতির মধ্যে মুসলিমরা যে যথেষ্ট শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত, সে ব্যাপারে দ্বিমত নেই কারও। পশ্চিমা দেশগুলোতে মুসলিমদের মধ্যে উচ্চ জন্মহারের কারণে ও অতি- জনবহুল ইসলামী বিশ্ব থেকে জনপ্রবাহ বৃদ্ধির ফলে স্থানীয় জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। ফলে, জনসংখ্যার বর্তমান প্রবণতা অনুযায়ী মুসলিমরা চলতি শতাব্দীর মধ্যভাগেই অনেক পশ্চিমা দেশে প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় হয়ে উঠতে পারে। আর বর্তমান সহিংস মৌলবাদী উত্থানের জৌলুস যদি মুসলিমদের মধ্যে অব্যাহত থাকে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে সহনশীল সভ্য বিশ্বের স্থিতিশীলতা বিপন্ন হতে পারে। বিশ্বের আধুনিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল ভবিষ্যতের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হলে সকল জাতিকে এসব মৌলবাদী ইসলামী দলগুলোর আদর্শ ও কর্মকাণ্ডকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করতে হবে সামরিক ও আদর্শিক উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে।

বিশ্বব্যাপী, বিশেষত মুসলিম দেশগুলোতে, জঙ্গী মুসলিমরা জিহাদের নামে যে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটাচ্ছে, সে প্রেক্ষাপটে তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। সেজন্যে মুসলিম ও অমুসলিম সকলকেই জরুরী ভিত্তিতে অনুধাবন করতে হবে 'জিহাদের প্রকৃত অর্থ কি', 'ইসলামের প্রকৃত বার্তা কি' ইত্যাদি। এসব প্রশ্নগুলোর প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি ব্যতীত কর্তৃপক্ষ ও জনগণের পক্ষে জিহাদের নামে গোঁড়া মুসলিমদের মাঝে গড়ে ওঠা উত্তরোত্তর সহিংস প্রবণতার বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিকার সম্ভব হবে না।

ইসলামের মৌলিক ধর্মীয় গ্রন্থের (কুরআন, হাদীস ও সিরা) উপর ব্যাপক গবেষণার ভিত্তিতে 'জিহাদের প্রকৃত অর্থ কি', 'ইসলামের প্রকৃত মর্ম কি' ইত্যাদি প্রশ্নগুলো সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ও দ্বন্দ্বহীন ধারণা দেওয়ার প্রয়াস করা হয়েছে এ বইটিতে। এতে নবী মুহাম্মদের জীবনী আলোচিত হয়েছে, যেভাবে তিনি আল্লাহর নিকট থেকে

ধারাবাহিকভাবে প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন পবিত্র কুরআনে সন্নিবেশিত করার জন্যে। বইটি ব্যাখ্যা করবে কখন ও কী পরিস্থিতিতে আল্লাহ ইসলামী ধর্মতত্ত্বে জিহাদের ধারণাটি সংযোজন করেন এবং প্রদর্শন করবে ইসলামের নবী কীভাবে জিহাদ মতবাদটির প্রয়োগ করেছিলেন ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠায়। ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য নবী মুহাম্মদের প্রতিষ্ঠাকৃত আদর্শ কর্ম- পদ্ধতি পরবর্র্তীতে যুগ যুগ ধরে ইসলামের বিস্তারে কীভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল বা কী ভূমিকা রেখেছিল - তাও বিস্তারিত আলোচিত হবে মূল ইসলামী ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে।

অধ্যায় ২
ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস

মুসলিমরা বিশ্বাস করে যে, ইসলাম হলো নবী ইব্রাহিমের অনুসারীদের সর্বশেষ একেশ্বরবাদী ধর্ম। ইসলামের ঈশ্বর হলেন আল্লাহ, যিনি ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরও ঈশ্বর। আল্লাহ মানবজাতিকে তাঁর পথ- নির্দেশনা প্রচারের জন্য আদম ও হাওয়া- কে সৃষ্টির পর থেকে পর্যায়ক্রমে এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর বা নবী প্রেরণ করেছেন। নবী- পয়গম্বরগণের এ পরম্পরায় আদম প্রথম, মুহাম্মদ সর্বশেষ। সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সব নবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি ছিলেন সর্বকালের জন্য মানবজীবনের র্স্বোচ্চ পূর্ণতাপ্রাপ্ত মানুষ। সর্বশেষ ও সর্বসেরা নবী ঈশ্বরের পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ ‘কুরআন’ আনয়ন করেন এবং ঈশ্বরের চূড়ান্তকৃত ধর্ম ‘ইসলাম’ প্রতিষ্ঠা করেন। ঈশ্বর- প্রেরিত আগের ধর্মবিশ্বাসগুলো, যেমন ইহুদী ও খ্রীষ্টধর্ম, ইসলামের তুলনায়

অসমপূর্ণ ও হীনতর। অন্যসকল ধর্মকে বাতিল ও প্রতিস্থাপন করার জন্য ইসলামধর্ম প্রেরণ করেছেন এ দাবী করে আল্লাহ্ কুরআনে বলেন: 'তিনি (আল্লাহ্) তাঁর প্রেরিত নবী (মুহাম্মদ)-কে পথ-নির্দেশ ও (একমাত্র) সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে অন্য সকল ধর্মের উপর তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন (কুরআন ৪৮:২৮)।[6]
ইসলাম দাবী করে যে, সময়ের সাথে ইহুদীরা তাদের ধর্মশাস্ত্রকে বিকৃত বা পরিবর্তিত করেছে (কুরআন ২:৫৯)। সুতরাং এটা বাতিল ও পরিত্যাজ্য। এ ব্যাপারে খ্রীষ্ট ধর্মশাস্ত্র কিছুটা ভাল মূল্যায়ন পেয়েছে: এটা এখনও বৈধ, যদিও ইসলামের চেয়ে হীনতর। কুরআন দাবী করে যে, খ্রীষ্টানরা তাদের মূল ধর্মগ্রন্থের কিছু অংশ ভুলে গেছে (কুরআন ৫:১৪) এবং এর উপদেশ তারা ভুল বুঝেছে। যেমন তারা ভ্রান্তভাবে যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র মনে করে (কুরআন ৫:৭২, ১১২:২, ১৯:৩৪-৩৫, ৪:১৭১)। কুরআন এটাও দাবী করে যে, খ্রীষ্টানরা ভুলবসত যীশুকে তিনজনের একজন, অর্থাৎ 'ট্রিনিটি' বা তিন ঈশ্বর-এর একজন বলে গণ্য করে (কুরআন ৫:৭৩, ৪:১৭১)। খ্রীষ্টানরা যদিও ভুলভাবে ধর্মচর্চা করে, তবুও আল্লাহ্ তাদের ধর্মকে বাতিল করেন নি, তবে আশা করেছেন যে ইসলামের দ্বারা পরিণামে তা বাতিল হয়ে যাবে (কুরআন ৪৮:২৮)। আশ্চর্যের বিষয় হলো, কেমন করে ইহুদীরা তাউরাত (ওল্ড টেস্টামেন্ট) বিকৃত করেছে, কিংবা কীভাবে খ্রীষ্টানরা বাইবেল (নিউ টেস্টামেন্ট)-এর অংশবিশেষ ভুলে গেছে বা ভুল বুঝেছে - আল্লাহ্ সেটি ব্যাখ্যা করার জন্য কিংবা সেসব অংশগুলো সংশোধনের জন্য নবী মুহাম্মদকে না পাঠিয়ে, তাঁর নেতৃত্বে একটি সম্পূর্ণ নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে পৃথিবীতে পাঠান!
ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দুটো প্রাথমিক ভিত্তির উপর: প্রথমত কুরআনে ধারণকৃত স্বর্গীয় বা দৈববাণী এবং দ্বিতীয়ত নবীর ঐতিহ্য ও বাণী, যাকে হাদীস বা সুন্নাহ বলা হয়। দৈববাণী হলো মানব জাতির প্রতি ঈশ্বরের নিজস্ব বার্তা, যা আরবি কুরআনে অপরিবর্তিত রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। মুহাম্মদ-কর্তৃক ইসলাম ধর্ম প্রচার ও বিস্তার কালে

---

[6]. The Quranic reference has been included in the parenthesis within the text. Quran 48:28 stands for Quranic chapter 48, Verse 28. One of the three most acceptable translations of the Quran, hosted by the University of Southern California (http://www. usc. edu/dept/MSA/quran/), has chosen for linguistic clarity.

(৬১০-৬৩২ সাল) আল্লাহ তাঁর বার্তাবাহক জিব্রাইলের মারফৎ অল্প অল্প করে তাঁর প্রত্যাদেশগুলো মুহাম্মদের নিকট পৌঁছে দেন। মুহাম্মদ ছিলেন একজন নিরক্ষর মানুষ। প্রত্যেকবার জিব্রাইল ঈশ্বরের ঐশীবাণী নিয়ে এসে মুহাম্মদকে তা পড়ে শোনাতেন, যতক্ষণ-না তাঁর তা মুখস্ত হতো। অতঃপর নবী ঈশ্বরের বাণীসমূহ নির্ভুল রাখার জন্য তাঁর শিক্ষিত শিষ্যদের দ্বারা লিখিয়ে রাখতেন ও কিছু প্রিয় শিষ্যদের দ্বারা সেগুলো মুখস্ত করাতেন। নবীর মৃত্যুর পর ঐসব প্রত্যাদেশ পুস্তকাকারে সংকলিত করা হয়, যা 'কুরআন' নামে পরিচিত। সুতরাং কুরআনে ধারণকৃত বিষয়সমূহ হলো মানবজীবনকে, যেভাবে ঈশ্বর কামনা করেন, ঠিক সেভাবে পরিচালিত করার জন্য তাঁর নিজের বাণী। সেরূপ জীবন যাপনকারী একজন বিশ্বাসী মৃত্যুর পর আল্লাহর স্বর্গে গমন করে সেখানে তাঁর অসীম অনুগ্রহ উপভোগের সুযোগ পাবে।

ইসলামের দ্বিতীয় উপাদান - বলতে গেলে ইসলাম ধর্মের অপর অর্ধাংশ - হলো নবীর প্রথাগত ঐতিহ্য: অর্থাৎ নবী মুহাম্মদের কথা ও কর্মকাণ্ডসমূহ, যাকে সমষ্টিগতভাবে হাদীস বা সুন্নাহ বলা হয়। ঈশ্বর-প্রেরিত অগণিত নবীর মধ্যে যেহেতু মুহাম্মদ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও মানবীয় পূর্ণতার মূর্ত প্রতীক, সুতরাং স্বর্গে আল্লাহর অনুগ্রহ অর্জনের জন্য মুসলিমদেরকে, তথা মানবজাতিকে, নবীর মত নিষ্পাপ বা নিখুঁত জীবনযাপন করতে হবে। আর তার একমাত্র উপায় হলো নবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা।

ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী মুসলিমদের মধ্যে যারা নবী মুহাম্মদের মতো জীবন অতিবাহিত করতে পারবে, তারা কোন নরক-যন্ত্রণা ভোগ না করে সরাসরি স্বর্গে (বেহেস্তে) প্রবেশ করবে। কিন্তু কোন মুসলিমের পক্ষে মুহাম্মদের নিষ্পাপ জীবনের সমকক্ষ হওয়া অসম্ভব। সুতরাং অধিকাংশ মুসলিমকে প্রথমে কিছুকাল ইসলামের নরক বা দোযখের ভয়ঙ্কর অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ হতে হবে। তাদের নরকবাসের সময়কাল নির্ধারিত হবে পার্থিব জীবনে তারা কী পরিমাণ পাপ করেছে তার উপর। অতঃপর তারা স্বর্গে গমন করবে অনন্তকালের জন্য।

মুসলিমদের মধ্যে আর একটিমাত্র দল নরকের আগুনে দগ্ধ না হয়ে স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে। এরা হলো তারা, যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করবে, অর্থাৎ তারা যখন জিহাদ বা

পবিত্র ধর্মযুদ্ধে মারা যাবেন (কুরআন ৯:১১১; তৃতীয় অধ্যায়ে আরো দেখুন)। অতএব নবী মুহাম্মদের জীবদ্দশায় তাঁর নির্দেশে কিংবা পরিচালনায় যুদ্ধ করতে গিয়ে যে শত শত মুসলিম মৃত্যুবরণ করেছে এবং পরবর্তীকালে শতাব্দীর পর শতাব্দী-ব্যাপী যে লাখ লাখ মুসলিম ইসলামের পবিত্র যুদ্ধে মারা গেছে এবং এখনও মারা যাচ্ছে বা ভবিষ্যতে মারা যাবে - তারা সরাসরি ইসলামের স্বর্গে পদার্পণ করবেন। অন্যান্য মুসলিমরা, যারা স্বাভাবিকভাবে মারা যাবে, তাদেরকে আল্লাহ-কর্তৃক সমগ্র পৃথিবী ধ্বংসের পর 'শেষ বিচারের দিন' পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কারণ ঐদিন আল্লাহ নির্ণয় করবেন স্বর্গে গমনের আগে কতকাল তাদেরকে নরকে কাটাতে হবে।

সুতরাং মুসলিমদের মাঝে নবী মুহাম্মদের জীবনের, অর্থাৎ তাঁর কথা ও কর্মকাণ্ডের সাথে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমকক্ষ হওয়ার একটা সর্বজনীন আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়। মুসলিম জীবনের অপর পরম আকাঙ্ক্ষাটি হলো অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে ইসলামী জিহাদ বা পবিত্র যুদ্ধে শহীদ হওয়া, বিশেষত ইসলামের পরিধি সমপ্রসারণের জন্য অমুসলিম-নিয়ন্ত্রিত ভূখণ্ড দখলের জন্য যেসব যুদ্ধ। ইসলামের শুরুতে বিকাশমান মুসলিম সমপ্রদায় মদীনায় নবী মুহাম্মদ পরিচালিত জিহাদ-পেশায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছিল। সে সকল যুদ্ধে লুণ্ঠিত মালামালের (ধর্মীয়ভাবে স্বীকৃত) উপর নির্ভর করেই তারা জীবিকা নির্বাহ করতো (তৃতীয় অধ্যায় দেখুন)।

নবুয়তীর তেইশ বছরকাল ধরে নবী আল্লাহর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিলেন। সকল পরিস্থিতিতে - তা হোক যুদ্ধে কোন সঙ্কট, যুদ্ধ-বন্দীদের বিষয়ে কোন সমস্যা কিংবা পরিবারের কোন বিবাদ মীমাংসা - জীবনের পদে পদে আল্লাহ মুহাম্মদকে পরিচালিত করতেন। নবীর সকল কাজকর্মে আল্লাহ অবিরাম নজর রাখতেন। যখনই নবী কোন ভুল করতেন, তৎক্ষণাৎ আল্লাহ হাজির হতেন পরামর্শ দিতে বা সে ভুল সংশোধন করতে। এরূপে নবুয়তীকালে মুহাম্মদের প্রতিটি কথা ও কাজ ছিল স্বর্গীয় বা দিব্যভাবে পরিচালিত, অর্থাৎ দিব্য প্রকৃতির। কাজেই 'সহি মুসলিম' হাদীসের অনুবাদক ও বিশিষ্ট পণ্ডিত আব্দুল হামিদ সিদ্দিকী সুন্নতকে স্বর্গীয় সৃষ্টি বলে দাবী করে বলেন: '. . . কুরআন ও সুন্নতের উপদেশাবলী কোন মানব শক্তি থেকে উদ্ভূত নয়, এর সবই

ঈশ্বরের প্রত্যাদিষ্ট; সুতরাং এগুলো সকল বস্তুগত ও ইহলৌকিক বিবেচনার উর্ধ্বে।’ [7] এ কারণে ইসলামে নবীর সুন্নতসমূহ ধর্মগ্রন্থ কুরআন্তবহির্ভূত কিন্তু আধা-স্বর্গীয় হিসেবে বিবেচিত, যা মুসলিমদেরকে অতি সতর্কতার সাথে অনুসরণ করতে হবে।

মুসলিমদের জন্য নবী মুহাম্মদের জীবনের সমকক্ষ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা কেবল একটা সূত্রবদ্ধ সিদ্ধান্ত নয়। আল্লাহ কুরআনের নির্দেশ প্রতিপালনের সাথে সাথে নবীকে অনুসরণ করতেও বারবার মুসলিমদেরকে নির্দেশ করেছেন। কুরআনে বারংবার বলা হয়েছে: আল্লাহকে (অর্থাৎ কুরআনকে) এবং তাঁর প্রেরিত নবীকে (অর্থাৎ সুন্নতকে) মেনে চলো (কুরআন ৩:৩২; ৪:১৩, ৫৯, ৬৯; ৫:৯২; ৮:১, ২০, ৪৬, ৯:৭১; ২৪:৪৭, ৫১-৫২, ৫৪, ৫৬; ৩৩:৩৩; ৪৭:৩৩; ৪৯:১৪; ৫৮:১৩; ৬৪:১২)। কাজেই ইসলাম ধর্মে কুরআনের নির্দেশাবলী ও সুন্নত হলো প্রায় সমমানের দু’টি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যাহোক ইসলামের কিছু আধুনিক ও সুশিক্ষিত কৈফিয়তদাতা, শুধু বিরোধিতার কারণে হোক কিংবা অজ্ঞতার কারণে, আল্লাহর সুস্পষ্ট সতর্কবাণী সত্ত্বেও সুন্নতকে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সচেষ্ট। তার কারণ হাদীসে বর্ণিত নবীর কিছু কিছু সুন্নত বা কার্যকলাপ আধুনিক চেতনা ও মূল্যবোধের কাছে অগ্রহণযোগ্য, এমনকি ঘৃণ্য। তারা কুরআনকে ইসলামের একমাত্র সংবিধানরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। এখানে উল্লেখ্য যে, নবী মুহাম্মদের মৃত্যুর পর ২০০ বছরেরও বেশী সময় ধরে বিশিষ্ট ইসলামী পণ্ডিতগণের দ্বারা কুরআনের বাণীর সঙ্গে যথাযথ মিল রেখে সুন্নত সংকলিত হয়েছিল, এবং তা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইসলামের বিশেষজ্ঞ (উলেমা)-দের দ্বারা স্বীকৃত হয়ে এসেছে।

‘শরীয়া’ বা ‘বিত্র ইসলামী আইন’ হলো ইসলামের আরেকটি অপরিহার্য উপাদান। শরীয়া আইন ইসলামের পৃথক কোন উপাদান নয়, বরং তা কুরআন ও সুন্নত থেকেই উদ্ভূত।

নবী মুহাম্মদ ঈশ্বরের বাণীসমূহ তার শিষ্যদের মাধ্যমে খণ্ডে খণ্ডে লিপিবদ্ধ ও মুখস্থ করালেও তিনি সেগুলোকে পুস্তকাকারে সংকলিত

---

7. *Sahih Muslim by Imam Muslim*, Translated by Siddiqi AH, Kitab Bhavan, New Delhi, 2004 edition, Vol. I, p. 210–11, note 508.

করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। এখন যে কুরআনকে আমরা চিনি, তা ইসলামের তৃতীয় খলীফা ওসমানের শাসনামলে (৬৪৪- ৬৫৬ সাল) সঙ্কলিত করা।

একইভাবে আল্লাহ বারংবার মুসলিমদের বলেছেন, নবী মুহাম্মদকে অনুসরণ করতে; তবুও তিনি তাঁর কাজ ও অবদান সম্বলিত জীবনী - যা বিশ্ব ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত মুসলিমদেরকে অনুসরণ করতে হবে - তা লিখে কিংবা অন্যদের দ্বারা লিখিয়ে রেখে যাওয়ার বিষয়টি উপেক্ষা করেছেন। স্পষ্টতঃ আল্লাহও মুহাম্মদকে তাঁর (খোদার) বাণীসমূহ একটা পুস্তকে (অর্থাৎ কুরআন) একত্রিত করতে কিংবা মুহাম্মদের আত্মজীবনী (অর্থাৎ সুন্নত) লিখে রেখে যাওয়ার নির্দেশ দিতে বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। অথচ ইসলাম ধর্মের এ দু'টি মৌলিক উপাদান মুসলিমদেরকে সর্বকালে কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।

নবীর মৃত্যুর পর কয়েকজন বুদ্ধিমান মুসলিম আল্লাহ ও তাঁর নবীর এ দুর্বলতাগুলো উপলব্ধি করেন ও তা পূরণ করতে সচেষ্ট হন। তারা উপলব্ধি করেন যে, ইসলাম ধর্মকে অবিকৃত ও আদি অবস্থায় রাখতে হলে স্বর্গীয় বাণী ও সুন্নতের পদ্ধতিগত বিন্যাস জরুরী। সুতরাং আল্লাহর পূর্বেকার ধর্মগ্রন্থ 'গস্‌পেল' ও 'তোরা' (বাইবেল ও তাউরাত)'র ক্ষেত্রে ঘটা বিকৃতির মতো ঘটনা এড়ানোর জন্য তারা মুহাম্মদের মৃত্যুর প্রায় দুই দশক পর আল্লাহর দৈববাণীগুলো একত্রিত করে কুরআন সংকলন করেন।

অতঃপর অভিজ্ঞ ইসলামীক পণ্ডিতদের দুটো ধারা ইসলামকে সঠিক পথে রাখার নিমিত্তে পৃথক দুটো বিশাল কার্য- প্রকল্পে নিয়োজিত হয়।

প্রথম প্রকল্পটি ছিল নবীর সুন্নত একত্রিত করা। ৭৫০ সালের দিকে ধার্মিক মুসলিম পণ্ডিত ইবনে ইসহাক কর্তৃক নবীর প্রথম জীবনী সংকলনের মধ্য দিয়ে তা শুরু হয়। তারপর থেকে বহু বিখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত ও গবেষক নবীর জীবনের ওপর অনেক দুঃসাধ্য ও পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার কাজে নিয়োজিত হন। অগণিত মানুষের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য তারা হেজাজ থেকে সিরিয়া, পারস্য, মিসর তথা আরবের সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন এবং নবীর হাজার হাজার কথা, কাজ ও উপদেশ একত্রিত করেন। এদের মধ্যে ছয়জন অত্যন্ত মেধাবী ও দক্ষ

হাদীস সংকলক রয়েছেন, যাদের সংকলিত হাদীস খাঁটি বা সহি হিসেবে স্বীকৃত:

১. আল-বুখারী (৮১০-৮৭০) সংগ্রহ করেছেন ৭২৭৫টি খাঁটি হাদীস, যাকে বলা হয় 'সহি বুখারী'।

২. মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ (৮২১-৮৭৫), বুখারীর একজন শিষ্য, সংগ্রহ করেছেন ৯২০০টি খাঁটি হাদীস, যাকে 'সহি মুসলিম' বলা হয়।

৩. আবু দাউদ (৮১৭-৮৮৮) সংগ্রহ করেছেন ৪৮০০টি খাঁটি হাদীস, যাকে 'সুনান আবু দাউদ' বলা হয়।

৪. আল-তিরমিযী (মৃত্যু ৮৯২)।

৫. ইবনে মাজা (মৃত্যু ৮৮৬)

৬. ইমাম নাসাই (জন্ম ২১৫ হিজরী)।

সুন্নত সংকলনের সময়কালে আবির্ভাব ঘটে আরেকটি ধারার অতিশয় মেধাবী ইসলামী পণ্ডিতগণের। তারা কুরআনের বাণী ও হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যার ভিত্তিতে মুসলিম সমাজের প্রয়োজনীয় আইনসমূহ সুনির্ধারিতভাবে সূত্রবদ্ধ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এক্ষেত্রে চারজন বিশিষ্ট মুসলিম পণ্ডিতের উদ্যোগে চারটি প্রধান ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ইসলামী আইনশাস্ত্র (জুরিসপ্রুডেন্স) বা 'ফিকাহ্' নামে পরিচিত। তারা হলেন:

১. ইমাম আবু হানিফা (৬৯৯-৭৬৭) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'হানাফী' আইনশাস্ত্র। দক্ষিণ এশিয়া, তুরস্ক, বলকান অঞ্চল, চীন এবং মিসরের মুসলিমরা এ ধারার অনুসারী।

২. ইমাম মালিক বিন আনাস (৭১৫-৭৯৫) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'মালিকী' আইনশাস্ত্র। উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকা এবং কয়েকটি আরব দেশের মুসলিমরা এ মতের অনুসারী।

৩. ইমাম আল শাফী (৭৬৭-৮২০) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'শাফী' আইনশাস্ত্র। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মিসর, সোমালিয়া, ইরিত্রিয়া ও ইয়েমেনের মুসলিমরা এ সমপ্রদায়ের অনুসারী।

৪. ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল (৭৮০-৮৫৫) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'হাম্বালী' আইনশাস্ত্র। সৌদী আরব ও অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের মুসলিমরা এর অনুসারী।

বিখ্যাত মুসলিম ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুনের মতে 'ফিকাহ্' হলো: 'আল্লাহর বিধি-বিধান সংক্রান্ত জ্ঞান, যা ব্যক্তির কর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত - যারা নিজে থেকেই ইসলামে কোনটা অবশ্যকরণীয় (ওয়াজিব), কোনটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ (হারাম), কোনটা গ্রহণযোগ্য (মানদিউব), কোনটা অননুমোদিত (মাকরূহ), অথবা কোনটা শুধু অনুমতি-প্রাপ্ত (মুবাহ্) সে ব্যাপারে আইন মেনে চলতে বাধ্য'।[8]

চারটি প্রধান ইসলামী আইনশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাদের ছাত্ররা ইসলামী আইন ও অনুশাসন সংক্রান্ত একটি সার সংক্ষেপ তৈরীর জন্য তিন শতাব্দীরও বেশী সময় ধরে অসাধারণ গবেষণা চালান, সামগ্রিকভাবে তাকে পবিত্র ইসলামী আইন বা 'শরীয়া' বলা হয়। ইসলামের এ আইনশাস্ত্রগুলোর মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে সামান্য ব্যতিক্রম থাকলেও মৌলিক পার্থক্য একেবারেই নগণ্য।

ইসলামের খোদ আল্লাহ পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত জীবনবিধানরূপে সমগ্র মানবজাতির জন্য 'ইসলাম' উপস্থাপন করেছেন (কুরআন ৫:৩১)। অর্থাৎ ইসলাম হলো আল্লাহর প্রত্যাশানুযায়ী মানব জীবনযাপনের জন্য একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ জীবনবিধান। সুতরাং ইসলামী ধর্মবিধানে মানব জীবনের প্রত্যেকটি সম্ভাব্য ঘটনা, পরিসি' তি ও কর্মের জন্য একটি সমাধান বা দিকনির্দেশনা রয়েছে। জীবনের প্রতিটি অবস্থায় অনুসরণের জন্য শরীয়া'য় রয়েছে একটি স্বর্গীয় আইন, কর্মপ্রণালী ও অনুশাসন - হতে পারে তা খাদ্যগ্রহণ, মলমূত্র ত্যাগ, যৌনকর্ম, নামাজ আদায়, যুদ্ধ করা অথবা অন্য যে কোন বিষয়ে।

মুসলিম জীবনের সকলক্ষেত্রে শরীয়া আইন পরিব্যাপ্ত - হোক সে আধ্যাত্মিক, সামাজিক, আর্থিক বা রাজনৈতিক। ইসলামে আধ্যাত্মিক ও ইহলৌকিক বা জাগতিকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ইসলাম হলো মানবজাতির ইহজাগতিক সমস্যার 'একের ভিতর সব'

---

8. Levy R (1957) *The Social Structure of Islam*, Cambridge University Press, U.K., p. 150

সমাধান। তুর্কীর মুসলিম পণ্ডিত ড. সেদাত লেসিনার দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন: 'ইসলাম শুধু একটি ধর্মই নয়, একটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাও বটে।'[9] ভারতের আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এম. উমরউদ্দিন বলেন, ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক অবিভাজ্য। তিনি দাবী করেন: 'সাধারণ অর্থে ইসলাম একটি ধর্ম নয়। ধর্মের কারবার শুধু মানুষের অন্তরের চেতনাকে নিয়ে - যার সাথে সামাজিক কর্মকাণ্ডের কোন যৌক্তিক সম্পর্ক নেই - এমন ধারণা ইসলামে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, সর্বোপরি ইসলামে তা ঘৃণিত।'[10] ইসলামের ধর্মীয় অনুশাসন মানবজীবনের সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে - এ যুক্তির ওপর জোর দিয়ে তিনি আরো বলেন: 'ইসলাম সবকিছুকে আলিঙ্গন করে, একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, যাতে মানবকর্মকাণ্ডের প্রতিটি স্তর ও মানবিক আচরণের প্রতিটি ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত।'

সংক্ষেপে কুরআন ও সুন্নত হলো ইসলামের দু'টো প্রাথমিক সংবিধান। এ দু'টো প্রাথমিক উৎস থেকেই উদ্ভব ঘটেছে শরীয়া আইনের। কুরআন, সুন্নত ও শরীয়া আইন একত্রে ইসলাম ধর্মের পূর্ণাঙ্গ ভিত্তি রচনা করে। এগুলো সকল স্থানে, সর্বকালে ও সকল সমাজে মুসলিমদের জন্য অপরিহার্য ও পূর্ণাঙ্গ পথপ্রদর্শক।

---

[9]. Laçiner S, *The Civilisational Differences As a Condition for Turkish Full-Membership to the EU*; Turkish Weekly, 9 Feb. 2005

[10]. Umaruddin M (2003) *The Ethical Philosophy of Al-Ghazzali*, Adam Publishers & Distributors, New Delhi, p. 307

অধ্যায় ৩

নবীর জীবন ও জিহাদের জন্ম

‘আমি বিজয়ী হয়েছি সন্ত্রাসের মাধ্যমে।’ - (নবী মুহাম্মদ, বুখারী ৪:৫২:২২০)

‘মুহাম্মদ হলেন মানবচরিত্রের মহিমান্বিত আদর্শ।’ - (আল্লাহ, কুরআন ৬৮:৪, ৩৩:২১)

অনেক মুসলিম মনে করে যে, সপ্তম শতাব্দীতে পৃথিবীতে সর্বশেষ পয়গম্বর হিসেবে আবির্র্ভূত হয়ে মানবজাতির কাছে আল্লাহর চূড়ান্ত ধর্মমত প্রচারের জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ মুহাম্মদকে সৃষ্টি করেছিলেন। ব্যাপকভাবে প্রচারিত একটি কথা রয়েছে যে, মুহাম্মদকে জনৈক শিষ্য প্রশ্ন করেন: ‘সবকিছু সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ কোন জিনিসটি

সৃষ্টি করেন।' উত্তরে নবী বলেন: 'আল্লাহ্ সর্বপ্রথম তাঁর নিজের আলো থেকে তোমাদের নবীর আলো সৃষ্টি করেন।' [13]

নবী মুহাম্মদের জীবন ছিল সর্বকালের পূর্ণতাপ্রাপ্ত নিখুঁত জীবন (ইনসান্তই কামিল)। তাঁর জীবন ছিল নৈতিক উৎকর্ষ ও পুণ্যে পরিপূর্ণ, অনৈতিকতা ও পাপ বিবর্জিত। তাঁর চরিত্রে মানবীয় বৈশিষ্ট্যের ভাল দিকগুলো সর্বোচ্চ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল - হোক তা তাঁর যৌন নৈতিকতা, দয়ামায়া বা অন্য কোন ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে, খারাপ বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে আদৌ ছিল না; থাকলেও তা ছিল সবচেয়ে নগণ্য মাত্রায়।

তিনি ছিলেন অভ্রান্ত ও নিষ্পাপ, যেহেতু আল্লাহ নিজেই তাঁকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করেছিলেন। কুরআনে বলা হয়েছে: 'আমরা (আল্লাহ্) কি তোমার (মুহাম্মদের) বক্ষ প্রসারিত করে সেখান থেকে সমস্ত ভার (পাপ) অপসারিত করি নি?' (কুরআন ৯৪:১-২)। তিনি ছিলেন সবচেয়ে দয়ালু, নির্দোষ, সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ ও ক্ষমাশীল এবং সর্বাধিক মহানুভব ও সৎ। অপরদিকে, তাঁর চরিত্রে আদৌ কোন নিষ্ঠুরতা বা বর্বরতা ছিল না। আল্লাহ্ নিজেই এ সত্যতা জ্ঞাপন করেন এভাবে: 'এবং আমরা (আল্লাহ্) পৃথিবীর প্রতি অনুকম্পা করে তোমাকে (মুহাম্মদকে) পাঠিয়েছি' (কুরআন ২১:১১৭)।

'নৈতিক বিশুদ্ধতার জন্যই আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে' এ কথা বলে নবী মুহাম্মদ স্বয়ং গর্ব করতেন। ইসলামের এক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও পুনরুজ্জীবনবাদী ইমাম গাজ্জালী (মৃত্যু ১১১১) - নবী মুহাম্মদের পর যাঁকে দ্বিতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হয় - তার বিবেচনায় 'জীবনের সর্বক্ষেত্রে নবী ছিলেন একজন আদর্শ, সর্বোচ্চ উৎকর্ষতায় বিশুদ্ধ বা পরিপূর্ণ মানুষ।' নবীর ব্যক্তিগত চরিত্রের বিশালত্ব বা মহত্ত্ব সম্বন্ধে গাজ্জালী আরও লিখেন:

প্রেরিত মহাপুরুষ সর্বদাই আল্লাহর কাছে আনত চিত্তে তাঁকে সর্বোচ্চ নৈতিক গুণাবলী ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী করার জন্য প্রার্থনা

---

13. Haddad GF, *The First Thing That Allah Created Was My Nur*, Living Ialam website: http://www.livingislam. org/fiqhi/fiqha-e30.html

করেছেন। তিনি ছিলেন অসামান্য নম্রতার প্রতীক এবং মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে মহৎ, সাহসী, ন্যায়বান ও ধার্মিক। ...নির্যাতিতরূপে, স্বামী হিসেবে, নেতা ও বিজয়ীরূপে নবী নৈতিক আচরণের যে উচ্চমান প্রদর্শন করে গেছেন, তা তাঁর আগে বা পরে কেউ কখনও পারেনি।[14]

অতএব নবী মুহাম্মদ হলেন মানবজাতির কাছে মঙ্গল, ন্যায়বিচার ও দয়ার সর্বোচ্চ মূর্ত প্রতীক। জীবনে তিনি যা কিছু করেছেন, সেটাই ছিল সবচেয়ে উত্তম; মুসলিম কিংবা অমুসলিম, সবার সাথে তিনি যে আচরণ করে গেছেন, তা ছিল সবচেয়ে ন্যায্য ও ক্ষমাশীল। এ অধ্যায়ে সংক্ষেপে নবী মুহাম্মদের জীবন - বিশেষ করে আরবের অমুসলিম মূর্তিপূজক, ইহুদী ও খ্রীষ্টান, বারবার তিনি যাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন - তাদের সঙ্গে তাঁর আচরণ আলোচনা করা হবে। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, মুসলিমরা তর্কাতীতভাবে বিশ্বাস করে যে এসব লোকদের সঙ্গে মুহাম্মদের আচরণ (নীচে বর্ণিত) সর্বক্ষেত্রে ছিল সবচেয়ে সুন্দর, ন্যায্য ও ক্ষমাশীল।

এ অধ্যায়ে মুহাম্মদ কর্তৃক ইসলাম প্রতিষ্ঠাকালীন জিহাদ সম্পর্কে আল্লাহ যেসব প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছিলেন, তার বিস্তারিত আলোচনা হবে। অধ্যায়টি পাঠ করে পাঠকগণ জিহাদের সত্যিকার অর্থ (আল্লাহ-কর্তৃক যেরূপে প্রকাশিত হয়েছিল) এবং জিহাদের প্রকৃত স্বরূপ ও তার বাস্তব প্রয়োগ - যা নবী মুহাম্মদ আল্লাহর নির্দেশের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত থেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন - তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

জন্ম ও প্রাথমিক জীবন (৫৭০- ৬১০ খ্রীষ্টাব্দ)

নবী মুহাম্মদ ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে আরবের মরুশহর মক্কার কুরাইশ বংশের একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কুরাইশরা ছিল তৎকালীন মক্কা নগরীর প্রধান গোষ্ঠী। তৎকালে মক্কা মরু উপত্যকার একটি কৌশলগত অবস্থানে অবস্থিত ছিল, যার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছিল দু'টি প্রধান বাণিজ্য পথ। এর একটি হিমায়ারকে যুক্ত করেছিল প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ার সাথে; অন্যটি সংযুক্ত করেছিল ইয়েমেন, পারস্য উপসাগর ও ইরাককে। এ কৌশলগত অবস্থানের কারণে মক্কা ভারত মহাসাগর (পূর্ব আফ্রিকাসহ) ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যে যাতায়াতকারী মরু- বাণিজ্য

---

[14]. Umaruddin, p. 66-67.

কাফেলাগুলোর ট্রানজিট- পয়েন্টরূপে কাজ করত। মক্কার মধ্য দিয়ে মিসর, সিরিয়া, রোম, বাইজেন্টাইন, পারস্য ও ভারতীয় বাণিজ্য কেন্দ্রসমূহের মধ্যে বিপুল পরিমাণ পণ্যসামগ্রী চলাচল করতো।
এভাবে মক্কা হয়ে উঠেছিল তৎকালীন ব্যবসা- বাণিজ্যের একটি ব্যস্ত কেন্দ্র ও মরুভূমির বাণিজ্য কাফেলাগুলোর জন্য পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহের জন্য নিয়মিত থামার বা বিশ্রামের স্থান। ফলে এ অঞ্চলের দুই বৃহৎ শক্তি, পারস্য ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য, মক্কার নেতাদের সাথে মিত্রতা করে মক্কাকে স্ব- স্ব নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেষ্টা করত।[15]
কুসাই বিন কিলাব ছিলেন প্রথম কুরাইশ, যিনি মক্কার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান করায়ত্ত করেন। তিনি ৪৫০ সালের দিকে বাইজেন্টাইন সম্রাটের সমর্থনে অন্যান্য গোত্রের সঙ্গে আঁতাত করে তৎকালীন মক্কার শাসকগোষ্ঠী খুজায়া'- দের ক্ষমতাচ্যুত করে মক্কায় কুরাইশ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মক্কা শাসন ও পবিত্র কা'বা ঘরের প্রশাসনের জন্য সামরিক সাজসরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্রের বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে যে, তিনি ঈশ্বরের পবিত্র গৃহ কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ ও বিশালাকৃতি করেন, যা এর আগের শাসকদের আমলে ছিল অবহেলিত। তিনি কা'বার পুনর্গঠন ও পুনঃনির্মাণ করে তার ভেতরে আল- লাত, আল- উজ্জা ও আল- মানাত নামক নাবাতাইয়ানদের তিন দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আরব পৌত্তলিক ধর্মমতে এ তিন দেবী ছিল তাদের ঈশ্বর (হুবাল বা আল্লাহ)- এর কন্যা।
মুহাম্মদের পিতামাতাকে প্রতিনিয়ত অভাবের মধ্যে জীবন যাপন করতে হতো। পিতা আব্দুল্লাহর মৃত্যুর সময় মা আমিনা তাঁকে গর্ভে নিয়ে ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এরপর তাঁর মায়ের অভাব- অনটন আরও প্রকট হয়ে উঠে। মক্কার উচ্চবিত্তদের (যেমন কুরাইশ) মধ্যে তৎকালে নবজাতককে বেতনভুক্ত পালক মায়ের কাছে রেখে লালনপালনের একটা নিয়ম ছিল।[16] পালক মাকে বেতন দিতে অসমর্থ তাঁর মা এক সপ্তাহ বয়সের শিশু মুহাম্মদকে হালিমা নামের এক বেদুইন

---

[15]. Walker B (2002) *Foundation of Islam*, Rupa & Co, New Delhi, p.37
[16]. Muir W (1894) *The Life of Mahomet*, London, p. 129-30

মহিলার কাছে অর্পণ করেন।[17] হালিমা তার একই বয়সের নিজ ছেলের সঙ্গে মুহাম্মদকে লালন্তপালনের দায়িত্ব নিয়ে চলে যায়।
হালিমা অতঃপর চার বছর বয়সী মুহাম্মদকে প্রথম মক্কায় ফিরিয়ে আনে তাঁর মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করানোর জন্য। এ সম্পর্কে কথিত আছে যে, মুহাম্মদকে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করায় হালিমার পরিবারের ভাগ্য খুলে গিয়েছিল। কাজেই তারা মুহাম্মদকে বড় না হওয়া পর্যন্ত রাখতে চায়। সে মোতাবেক মুহাম্মদের পালক মাতাপিতা পুনরায় তাঁকে নিয়ে যায়। কিন্তু তাঁর বয়স যখন পাঁচ বছর তখন একদিন হালিমা মুহাম্মদকে মক্কায় এনে আমিনার কাছে ফিরিয়ে দেয়। জানা যায়, হালিমা মুহাম্মদকে ফিরিয়ে দেওয়ার সময় তাঁকে নিয়ে সংঘটিত একটি অলৌকিক কাহিনী ব্যক্ত করে। বলা হয়, ধবধবে সাদা পোশাক পরিহিত দুই ব্যক্তি মুহাম্মদের কাছে আসে ও তাঁকে মাটিতে শোয়ায়। তারা তাঁর বুক চিড়ে ফেলে এবং (কিছু) অনুসন্ধান করে।[17K] পরবর্তীতে আল্লাহ এ ঘটনাটিকে মুহাম্মদের পাপ মুছে ফেলে তাঁকে পবিত্রকরণের বিষয় হিসেবে বর্ণনা করেন (কুরআন ৯৪:১- ২)। এ দাবীর সত্যতার সমর্থনস্বরূপ জানা যায়, মুহাম্মদ তাঁর কাঁধের দুই অস্থির মাঝখানে একটি চিহ্ন নিয়ে ফেরেন। পরবর্তীতে এ চিহ্নকে তাঁর 'নবুয়তীর সিলমোহর' হিসেবে বর্ণনা করা হয় (সহি বোখারী ৪:৭৪১, তিরমিযী ১৫২৪)।
আমিনা অতি যত্নের সাথে মুহাম্মদকে লালন পালন করেন। কিছুকাল পরে তিনি মুহাম্মদকে মদীনায় নিয়ে আসেন। মদীনার অবস্থান মক্কা থেকে ২১০ মাইল উত্তরে, ১০ থেকে ১২ দিনের পথ। মুহাম্মদের প্রমাতামহী মদীনায় খাজরাজ বংশের মেয়ে হওয়ায় এ বংশের সঙ্গে মুহাম্মদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ মদীনা থেকে মক্কায় ফেরার পথে তাঁর মা মারা যান। তখন তাঁর বয়স মাত্র ছয় বছর। তাঁর প্রিয় দাদা আবদ- আল মুত্তালিব মারা যাবার পর চাচা আবু তালিব কিশোর মুহাম্মদের লালন্তপালন করেন। যাহোক তাঁকে কঠিন সময়ের মুখোমুখি হতে হয় অতি অল্প বয়সে। কিশোর বয়সেই তিনি মেষ

---

[17]. Ibn Ishaq, *The Life of Muhammad*, trs. A Guillaume, Oxford University Press, Karachi, 2004 imprint, p. 71.
[17K]. Ibid, p. 71-72.

পালকের কাজ করতেন এবং গবাদী পশু চারণ করে একাকী নিঃসঙ্গ সময় কাটাতেন। মুহাম্মদের বয়স যখন পঁচিশ, তখন মক্কার সবচেয়ে ধনী মহিলাব্যবসায়ী চল্লিশ বছর বয়স্কা খাদিজার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এ বিবাহ তাঁর ভাগ্যে নাটকীয় পরিবর্তন আনে ও তাঁর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে। এর আগে খাদিজা মুহাম্মদকে তার ব্যবসা দেখাশোনার জন্য নিয়োজিত করেছিল। ব্যবসা লাভজনকভাবে পরিচালনার মাধ্যমে অচিরেই তিনি খাদিজার মন জয় করেন। পনেরো বছরের কম বয়সী তরুণ, মেধাবী ও সামর্থ্যবান যুবক মুহাম্মদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে খাদিজা তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন।[18]

ওয়ারাকা বিন নওফেল নামে খাদিজার এক বয়স্ক চাচাত ভাই ছিল। তার ধর্মীয় বিশ্বাসে কোন দৃঢ়তা ছিল না। প্রথমে তিনি একেশ্বরবাদে আকৃষ্ট হয়ে ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেন, পরে খ্রীষ্টান হন।[19] ওয়ারাকা ছিলেন ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টান। হাদীসে বলা হয়েছে যে, মাঝে মাঝে তিনি আরবী ভাষায় 'গস্‌পেল' পড়তেন (বুখারী ৪:৬০৫)। ওয়ারাকার সাথে খাদিজার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকায় খাদিজাও একেশ্বরবাদের, বিশেষ করে খ্রীষ্টান ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এ সময় পর্যন্ত মুহাম্মদ কুরাইশদের বহুঈশ্বরবাদী পৌত্তলিক ধর্মের সব আচার- অনুষ্ঠান পালন করতেন। কিন্তু বিবাহের পর খাদিজা ও ওয়ারাকার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার পর মুহাম্মদ পৌত্তলিকতা চর্চা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেন এবং একেশ্বরবাদী ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি উৎসাহী হয়ে উঠেন। জানা যায়, বিয়ের অল্প কিছুদিন পর তিনি মক্কার নিকটবর্তী হীরা পর্বতের একটি গুহায় ধ্যান করার জন্য বছরের একটা সময় অতিবাহিত করা শুরু করেন। এ গুহাতেই প্রতি রমজান মাসে তাঁর দাদা ধ্যানমগ্ন থাকতেন। মক্কার একেশ্বরবাদী 'হানিফ' সমপ্রদায়ের (নীচে দেখুন) লোকদের মধ্যে পর্বতের গুহায় এরূপ ধ্যানমগ্ন হওয়ার একটা রীতি ছিল। মুসলিমরা বিশ্বাস করে: ঈশ্বরের সান্নিধ্য প্রাপ্তির আশায় মুহাম্মদ

---

18. It should be noted here that widowed khadijah was looking for an able agent to run her businesses. Her nephew, named Khuzaima, once met Muhammad when he was on a business trip overseas with his uncle, Abu Taleb. Khuzaima spotted Muhammad's business talent, which he had mastered while accompanying his uncle's trade-caravans to various destinations since the age of twelve. Khuzaima later introduced him to Khadijah for employing him to run her businesses.

19. Ibn Ishaq, p. 83

ধ্যানস'   হয়ে এ গুহায় সময় কাটাতেন এবং এরূপে পনের বছর ধ্যান করার পর তিনি নতুন ধর্ম ইসলাম প্রচারের জন্য ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন।

ইহুদী ধর্মেও সিনাই পর্বতের গুহায় মূসা নবীর ধ্যানমগ্ন হওয়ার একই রকম কাহিনী প্রচলিত। জানা যায়, মূসা নবী সেখানে ঈশ্বর (জেহোবা/ইয়াওয়ে)- এর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। ঐ কাহিনীর দ্বারা মুহাম্মদ অনুপ্রাণিত হয়ে থাকতে পারেন। ইসলামী সাহিত্যে কিছু নজীর রয়েছে যা থেকে আমরা জানতে পারি যে,   মুহাম্মদ গুহায় একা সময় কাটাতেন না সব সময়;   কখনও কখনও স্ত্রী খাদিজা এবং ওয়ারাকাও সঙ্গ দিতেন। ইসলামী সাহিত্য আরো জানায় যে,   ওয়ারাকার সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে মুহাম্মদ তাঁর ধ্যানমগ্নতার শেষ দিকে ও নবুয়তীর প্রথম দিকে মাঝে মাঝেই ইহুদী রাব্বি ও খ্রীষ্টান যাজকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। ধারণা করা হয় যে, ধ্যানমগ্নতার বছরগুলোতে মুহাম্মদ জনচক্ষুর অন্তরালে হীরা পর্বতের গুহায় একেশ্বরবাদী ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মের সাথে নিজেকে পরিচিত করেন। হয়তোবা এর উদ্দেশ্য ছিল: মক্কার পৌত্তলিকদের মাঝে ইব্রাহীমপন্থী একত্ববাদী ধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে নিজেকে প্রস্তুত করা।

নবুয়তীর মক্কা পর্ব (৬১০- ৬২২)

উপরোক্ত পটভূমিতে ও হীরা পর্বতের গুহায় পনের বছর ধ্যান করার পর (৪০ বছর বয়সে, ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে) মুহাম্মদ একদিন দাবী করেন যে, এক অদৃশ্য কণ্ঠস্বর থেকে কিছু বার্তা শুনেছেন তিনি।[20] এ ঘটনা সর্বপ্রথম বিশ্বাস করেন তাঁর স্ত্রী খাদিজা ও ওয়ারাকা। তারা আপাতঃ বিভ্রান্ত মুহাম্মদের মনে এই বলে প্রত্যয় আনেন যে, একটা নতুন ধর্ম প্রচারের জন্য স্বর্গীয় দূত বা ফেরেশতা জিব্রাইলের মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। ওয়ারাকা মুহাম্মদকে বলেন: 'নবুয়তীর রীতি অনুযায়ী এটা সেই ফেরেশতা, যাঁকে ঈশ্বর মূসার কাছে প্রেরণ করেছিলেন। ঐশীবাণী পাওয়া পর্যন্ত যদি বেঁচে থাকি, তবে আমি তোমাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করবো' (বোখারী ৪:৬০৫)। যাহোক ওয়ারাকা কখনই ইসলাম গ্রহণ করেন নি এবং খ্রীষ্টান হিসেবেই মারা যান।

---

[20]. Ibid, p. 111

মুহাম্মদ তাঁর একেশ্বরবাদী ঈশ্বরের নাম দেন আল্লাহ্, যা ছিল আরব পৌত্তলিক ধর্মের প্রধান দেবতার নাম।[21] এ অঞ্চলে ঈশ্বর বুঝাতে সাধারণত এ নামটিই ব্যবহৃত হতো। তাঁর স্বর্গীয় মিশন জনসমক্ষে প্রচারের আগে তিন বছর মুহাম্মদ তাঁর সঙ্গী-সাথী ও পরিবারের সদস্যদের মাঝে গোপনে তাঁর কথিত ঐশীবাণী প্রচার করেন। স্থানীয় পৌত্তলিক ঐতিহ্য অনুযায়ী কা'বা ঘর বিবেচিত হতো 'ঈশ্বরের ঘর' রূপে। কিন্তু মুহাম্মদের ঐশীবাণী দাবী করে যে, কা'বা তাঁর ঈশ্বরেরই 'পবিত্র স্থান', যা স্থাপন করেছিলেন ইহুদীদের আদি পিতা ইব্রাহীম ও তাঁর পুত্র ইসমাইল। ইসলামে উভয়েই অতি মর্যাদাশীল নবী বলে গণ্য। তিনি শুরুতে তাঁর নতুন ধর্মকে 'ইব্রাহীমের ধর্ম' বলে অভিহিত করেন এবং মক্কার বহুঈশ্বরবাদীদেরকে পৌত্তলিকতা ছেড়ে তাঁর ধর্মমত অনুসরণের আহ্বান জানান। মুহাম্মদ কীভাবে মক্কার পৌত্তলিকদেরকে তাঁর ধর্ম অনুসরণের আহ্বান জানান ও কা'বাকে তাঁর ঈশ্বরের নিজস্ব ঘর বলে দাবী করেন, এখানে তা উদ্ধৃত হলো :

এরপর যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা কল্পনা করবে, তারা হবে নীতি লঙ্ঘনকারী। বলো, আল্লাহ্ সত্যভাষী। সুতরাং ইব্রাহীমের সত্যধর্ম অনুসরণ করো। তিনি পৌত্তলিকদের মধ্যেকার ছিলেন না"। দেখো, প্রথম পবিত্রস্থান (কা'বা) মানবজাতির জন্য নির্দিষ্ট করা হয় বেক্কায় (মক্কা), একটি মহিমান্বিত স্থান, জনগণের জন্য একটি দিক-নির্দেশক; যেখানে রয়েছে সুস্পষ্ট স্মৃতিস্মারক (আল্লাহ্র দিক নির্দেশনার); 'এটা সেই স্থান যেখানে ইব্রাহীম প্রার্থনার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন; এবং যে-ই এখানে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। এবং আল্লাহ্র উদ্দ্যেশে এ ঘরের দিকে তীর্থ করা মানবজাতির কর্তব্য। এবং তার জন্য, যে ঐ স্থানাভিমুখে পথ খুঁজে পায়। আর যে অবিশ্বাস করে (তাকে জানতে দাও): দেখ! আল্লাহ্ সকল সৃষ্ট জীব থেকে স্বাধীন।' (কুরআন ৩:৯৪-৯৭)

এ ধরনের দৈববাণী স্বাভাবিকভাবেই মক্কার ধর্মপ্রাণ কুরাইশদের মাঝে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। তাদের অধিকাংশই মুহাম্মদের ধর্ম প্রত্যাখ্যান

---

[21]. Muhammad's father's name was Abdullah, meaning slave of Allah.

করে। তারা কিছুতেই কা'বার তত্ত্বাবধানের ভার মুহাম্মদের হাতে তুলে দেয়নি। বলা হয় যে, প্রায় ১৩ বছর মক্কায় প্রচার চালানোর পর ৬২২ সালের জুন মাসে মুহাম্মদ মক্কার কুরাইশদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে মদীনায় আশ্রয় গ্রহণ করেন বলে দাবী করা হয়। সে সময়কালে মুহাম্মদ অল্পসংখ্যক, মোটামুটি ১৫০ জনকে ইসলামে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হন। মদীনায় নিজেকে নিরাপদ করার পর পরবর্তী আট বছরব্যাপী তিনি কুরাইশদের জীবনযাত্রা ও ধর্ম ধ্বংস করার এক নির্মম কর্মকাণ্ড গ্রহণ করেন। ৬৩০ সালে তিনি মক্কা দখল করে কা'বার সকল মূর্তি ধ্বংস করেন। পরিশেষে তিনি মক্কার পৌত্তলিকদেরকে মৃত্যুর হুমকি দিয়ে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেন।

এবার আমরা মুহাম্মদের মক্কা ত্যাগ এবং কুরাইশদের নির্মমতা ও অসহিষ্ণুতা সম্বন্ধে মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত কিছু জনপ্রিয় কাহিনী বিশ্লেষণ করব।

মুহাম্মদকে কি মক্কা থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল?

মুসলিমরা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করে যে, ৬২২ সালে কুরাইশরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদেরকে জোর- পূর্বক মক্কা থেকে তাড়িয়ে দেন। ফলে তাঁরা মদীনায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হন, যা ইসলামের ইতিহাসে 'হিজরত' হিসেবে পরিচিত। এ কাহিনী অনুসারে, নবী মুহাম্মদকে হত্যা করতে কুরাইশরা লোক পাঠায়। কুরাইশরা এ ষড়যন্ত্রের খবর মুহাম্মদ ফেরেস্তার মারফত জানতে পেয়ে অতি- বিশ্বস্ত অনুসারী আবু বকরকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা থেকে পালান। খুনীরা ধাওয়া করলে তাঁরা মক্কা থেকে প্রায় এক ঘণ্টার পথ 'থর' পর্বতের গুহায় আশ্রয় নেন। ধাওয়াকারীরা সে গুহার কাছে এলে দেখতে পায় যে, গুহার মুখে কবুতর ইতিমধ্যে বাসা বেঁধে ডিম পেড়েছে। পরন্তু একটা মাকড়সা গুহার প্রবেশ পথে তৎক্ষণাৎ জাল বিস্তার করে। ঐ মুহূর্তে গুহাটিতে কোন মানুষ প্রবেশ করা অসম্ভব ভেবে ধাওয়াকারীরা ফিরে যায়। অতঃপর মুহাম্মদ ও আবু বকর রাতের অন্ধকারে গুহা থেকে বেরিয়ে মদীনার দিকে যাত্রা করেন এবং ১২ দিন পর মদীনায় পৌঁছান। এ গল্প ইসলামী লোক- গাঁথায় ও সাহিত্যে মুহাম্মদকে রক্ষায় আল্লাহর এক অলৌকিক কর্ম রূপে পেশ করা হয়েছে।

মুহাম্মদকে হত্যার জন্য কুরাইশদের এ উদ্যোগ ইসলামী সাহিত্যে একটা পরিচিত কাহিনী হলেও কয়েকটি কারণে এর সত্যতা প্রমাণ করা দুরূহ। প্রথমতঃ মক্কায় ধর্মপ্রচারকালে মুহাম্মদ অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা করেন কয়েকবার। মুহাম্মদ- কর্তৃক মক্কার বিদ্যমান ধর্ম, প্রথা ও রীতিনীতির অপমান বা অমর্যাদার ফলে ৬১৫ সালের দিকে মক্কাবাসীরা তাঁর নবুয়তী কার্যকলাপের বিরোধী হয়ে উঠে, যা তাঁর ধর্মপ্রচার অনেকটা দুরূহ করে তোলে। এ সময় তাঁর শিষ্যদেরকে তাদের পূর্বপুরুষের ধর্মে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য নিজস্ব পরিবারের লোকেরা প্রলুব্ধ করতে থাকে। সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামী ইতিহাসবিদ আল- তাবারী জানান: কুরাইশরা এ সময় কিছু মুসলিমকে পৌত্তলিক ধর্মে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম হয়, "যা ইসলামী সম্প্রদায়কে আন্দোলিত করে তুলে"। আল- তাবারী লিখেছেন নব- মুসলিমরা তাদের আগের ধর্মে ফিরে যেতে পারে এ ভয়ে মুহাম্মদ তাঁর শিষ্যদেরকে আবিসিনিয়ায় (ইথিওপিয়া) অভিবাসিত হওয়ার নির্দেশ দেন।[22] এ র্নিদেশের পর পরিবারের চাপে উদ্বিগ্ন প্রায় এক ডজন শিষ্য স্ত্রী- সন্তান নিয়ে ছোট ছোট দলে গোপনে আবিসিনিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করে। ৬১৬ সালে আবার এরকম আরেকটি অভিবাসন জোয়ার আসে। বিভিন্ন হিসাব মতে, মুহাম্মদের ৮২ থেকে ১১১ জন শিষ্য আবিসিনিয়ায় অভিবাসিত হয়েছিলেন। এ স্বনির্বাসিত শিষ্যরা মক্কায় ও পরে মদীনায় ফিরে আসেন ৬ মাস থেকে ১৩ বছরের মধ্যে। স্বনির্বাসিতদের মধ্যে কয়েকজন আবিসিনিয়ায় খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। মুহাম্মদ তাঁর শিষ্যদের আবিসিনিয়া যেতে নির্দেশ করেন শুধুমাত্র তাদেরকে পৌত্তলিক ধর্মে ফিরে যাওয়া থেকে রক্ষার জন্যই নয়, সেখানে একটা নির্বিঘ্ন আশ্রয়স' ল খুঁজে পাওয়ার জন্যেও। কেননা ভবিষ্যতে মক্কায় তাঁর মিশন ব্যর্থ হলে বা তাঁর অবস্থান বিপজ্জনক হয়ে উঠলে, তাঁর নিজেরও অন্যত্র আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

মুহাম্মদ কুরাইশদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম ও রীতি- নীতির প্রতি মর্যাদাহানি ও অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহার অব্যাহত রাখলে উত্যক্ত কুরাইশরা ৬১৭ সালে তাঁর অনুসারীদেরকে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে তাদের উপর

---

[22]. Al- Tabari (1988) *The History of Al-Tabari*, Trs. WM Watt and MV McDonald, State University of new York Press, Vol. VI, p.45.

অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে। দু'বছর পর (৬১৯ সালে) এ অবরোধ উঠিয়ে নেওয়া হয়। অবরোধ প্রত্যাহার হলেও মুহাম্মদের ধর্মপ্রচার প্রায় স' বির হয়ে পড়ে; কেননা প্রকাশ্য প্রচারণা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। এমন পরিস্থিতিতে অন্যত্র একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থানের সন্ধানে তিনি ৬১৯ সালে তা'য়েফ গমন করেন। মুহাম্মদ কুরআনে ইতিপূর্বে তা'য়েফীদের প্রধান দেবী আল-লাত'কে অবমানিত করেছিলেন; তথাপি তা'য়েফবাসীরা মুহাম্মদের আগমনে বাধা দেয় নি। তা'য়েফের জনগণকে তিনি তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলামে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, তিনি মক্কার কুরাইশদের বিরুদ্ধে তা'য়েফীদেরকে শত্রুভাবাপন্ন করে তোলার চেষ্টা করেন। উল্লেখ্য যে, কুরাইশ ও তা'য়েফীদের মধ্যে ভাল ব্যবসায়িক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। সেখানে দশ দিন অবস্থানকালে মুহাম্মদ তা'য়েফী নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে ও কুরাইশ-বিরোধী উদ্দেশ্য সফল করতে চেষ্টা করেন। ইবনে ইসহাক তাঁর তা'য়েফ মিশন সম্পর্কে বলেন: নবী তাদের সাথে বৈঠক করেন এবং ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি জন্মভূমি মক্কায় তাঁর বিপক্ষীদের বিরুদ্ধে সাহায্যের আবেদন জানান। কিন্তু তা'য়েফে তাঁর দ্বিমুখী উদ্দেশ্য - তাদেরকে ইসলামে দীক্ষিতকরণ ও কুরাইশদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া - দু'টোই ব্যর্থ হয়। মক্কায় ফেরার পর কুরাইশদের শত্রুতা আরো বেড়ে যেতে পারে, এ আশঙ্কায় মুহাম্মদ তা'য়েফ থেকে ফেরার আগে সেখানে যেসব আলোচনা হয়েছে তা গোপন রাখার জন্য তা'য়েফবাসীদেরকে অনুরোধ করেন।[23]

এ খবর কোন না কোন উপায়ে মক্কায় পৌঁছে যায়। তবুও কুরাইশরা তাঁর বিরুদ্ধে মারাত্মক কোন অসন্তোষ প্রকাশ করে নি এবং মক্কায় ফেরার পর তাঁকে কোনরকম বিরোধিতার মোকাবিলা করতে হয় নি।

যাহোক, ৬১৯ সালে স্বেচ্ছায় মুহাম্মদের তা'য়েফে আশ্রয় গ্রহণের প্রয়াস ও আবিসিনিয়ায় দুই-দুই বার তাঁর শিষ্যদেরকে প্রেরণ, এটা

---

[23]. Ibn Ishaq, p. 192-93.

অবিশ্বাস্য করে তুলে যে কুরাইশগণ কর্তৃক হত্যার চেষ্টার কারণে তিনি মদীনায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এখানেই শেষ নয়; নিম্নে বর্ণিত ৬২০ সালের প্রথমদিকে মুহাম্মদের মদীনায় আশ্রয় গ্রহণের অতিশয় আগ্রহ কুরাইশগণ-কর্তৃক তাঁকে হত্যার দাবীকে আরও অবিশ্বাস্য করে তোলে।

মক্কায় মুহাম্মদের মিশন স' বির হয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় ৬২০ সালে কা'বায় তীর্থকালে (হজ্জ্ব) তিনি মদীনার কয়েকজন তীর্থযাত্রীর কাছে তাঁর ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করেন এবং তাদের ছয় জন ইসলাম গ্রহণ করে। মুহাম্মদ মক্কায় তাঁর ধর্ম প্রচারে অসুবিধার কথা ব্যক্ত করে মদীনায় অভিবাসিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে তাদের কাছে জানতে চান, সেখানে তারা তাঁকে রক্ষা করতে পারবে কিনা।[24] কিন্তু নতুন ধর্মান্তরিতরা তাঁকে নিরাশ করে; কেননা মদীনায় তখন দুটো গোষ্ঠীর মধ্যে রক্তাক্ত বিবাদ চলছিল। তারা তাঁকে খানিকটা সুবিধাজনক সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে বলে।

পরবর্তী বছরের তীর্থকালে আগের বছরের ধর্মান্তরিতদেরসহ মোট বার জন মদীনার তীর্থযাত্রী 'আকাবা' নামক স্থানে মুহাম্মদের সাথে গোপনে সাক্ষাৎ করে। এ সাক্ষাতে তারা ইসলামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, যা ইসলামী ঐতিহ্যে 'প্রথম আকাবার শপথ' হিসেবে পরিচিত।[25] মুহাম্মদ মদীনার শিষ্যদেরকে নতুন ধর্মের নিয়ম-কানুন শিখানোর জন্য মূসাব ইবনে ওমা'য়ার নামক মক্কার এক অনুসারীকে তাদের সঙ্গে মদীনায় প্রেরণ করেন। মদীনায় মুহাম্মদের ধর্ম প্রসারের চেষ্টায় মূসাব খুবই সফল হন।

পরবর্তী তীর্থকালে (৬২২) পঁচাত্তর জন ইসলাম-গ্রহণকারী মদীনার নাগরিক (তিয়াত্তর জন পুরুষ, দু'জন নারী) মূসাবের সঙ্গে মক্কায় আসে ও আকাবায় পুনরায় একটি গোপন বৈঠক করে। মুহাম্মদের চাচা আল-আব্বাস তাঁর সঙ্গে এ গুপ্ত বৈঠকে এসেছিলেন। মুহাম্মদের মদীনায় স্থানান্তরের ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করে আল-আব্বাস বলেন: 'যদিও মক্কায় নবীর আত্মীয়স্বজন ও শিষ্যরা তাঁকে রক্ষা করবে, কিন্তু

---

24. Muir, p.114
25. Ibn Ishaq, p.198-99

তিনি (মুহাম্মদ) তোমাদের (মদীনার ধর্মান্তরিতদের) কাছ থেকে নিরাপত্তা পছন্দ করছেন। তোমরা যদি সমাধানে আসতে পার এবং তাঁকে রক্ষায় সমর্থ হও, তাহলে শপথ কর। কিন্তু তোমাদের সামর্থ্য সম্পর্কে যদি সামান্য সন্দেহ থাকে, তাহলে সে পরিকল্পনা বাতিল কর।' এর উত্তরে মদীনার শিষ্যরা বলে: 'আপনি যা বললেন আমরা শুনেছি। আপনি বলুন, হে নবী এবং আপনি নিজেই ঠিক করুন আপনার প্রভুর জন্য আপনি কী চান।' এরপর মুহাম্মদ মুখ খুলেন ও এই বলে শেষ করেন যে: 'আমি তোমাদের আনুগত্য কামনা করি এ ভিত্তিতে যে, যেভাবে তোমরা তোমাদের (নিজস্ব) নারী ও শিশুদের রক্ষা করো, আমাকেও ঠিক সেভাবে রক্ষা করবে।' এ কথায় আল বারা নামক মদীনাবাসী শিষ্য নবীর হাত টেনে নিয়ে বলেন: 'তাঁর শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, আমরা আপনাকে রক্ষা করবো যেভাবে আমাদের নারীদেরকে রক্ষা করি। আমরা আমাদের আনুগত্য প্রকাশ করছি। আমরা যোদ্ধার জাতি। আমাদের হাতে রয়েছে অস্ত্র, যা পিতা থেকে পুত্রের হাতে সমর্পিত হয়েছে।' ইসলামে 'আনসার' বা 'সাহায্যকারী' হিসেবে পরিচিত মদীনার ধর্মান্তরিতদের এ শপথকে 'আকাবার দ্বিতীয় শপথ' বলা হয়।[26]

এ ঘটনাটি সুস্পষ্ট করে যে, ৬২২ সালের সে সময়ও মুহাম্মদ মক্কায় কোনো আসন্ন বিপদের সম্মুখীন ছিলেন না। অথচ এর দু'বছর আগেই, অর্থাৎ ৬২০ সালের প্রথম দিকে, তিনি মদীনায় অবস্থান নেয়ার জন্য আগ্রহী ছিলেন। ৬২২ সালে মদীনায় স্থানান্তরের কয়েক মাস পূর্বেই তিনি মদীনার শিষ্যদের কাছ থেকে সেখানে নিজস্ব নিরাপত্তার ব্যাপারে শপথ আদায় করেন। সুতরাং প্রশ্ন জাগে: যখন তিনি কোন রকম বিপদের সম্মুখীন না হয়েও অতিশয় আগ্রহী ছিলেন মদীনায় অবস্থান নেওয়ার জন্যে, যেখানে তাঁর ধর্মপ্রচারের অগ্রগতিও হয়ে উঠেছিল উজ্জ্বল - এমতাবস্থায় মদীনায় গমনের জন্য কি তাঁকে কুরাইশদের দ্বারা মক্কা থেকে বিতাড়িত হওয়ার দরকার পড়ে? তদুপরি ৬২২ সালের মে মাসের শেষ দিকে তাঁর মক্কা ত্যাগের আগে এপ্রিলের শুরুতে তিনি

---

[26]. Ibn Ishaq, p. 204, Muir, p. 129-130.

শিষ্যদেরকে মদীনায় গমনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এবং তারা ছোট ছোট দলে দুই মাসেরও বেশী সময় ধরে মদীনায় স্থানান্তরিত হয়। মুহাম্মদ ও তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত বন্ধু আবু বকর এবং তাদের পরিবার সর্বশেষে মক্কা ত্যাগ করেন। এ পটভূমিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনাযোগ্য:

১. মদীনায় স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য মুহাম্মদের প্রবল আগ্রহ ও সেখানে অবস্থানকালীন তাঁকে রক্ষার জন্য মদীনার শিষ্যদের কাছ থেকে শপথ আদায়ের উদ্দেশ্য কী ছিল?

২. নিজের মক্কা ত্যাগের পূর্বে দু'মাস ধরে তিনি শিষ্যদেরকে মদীনায় পাঠালেন কেন?

৩. মক্কায় একাকী তিনি কী করতে যাচ্ছিলেন, যখন সেখানে তাঁর ধর্মপ্রচার স্থবির হয়ে গিয়েছিল?

নির্ভুল ও কর্তৃত্বপূর্ণ ইসলামী সূত্র থেকে পাওয়া সাক্ষ্য-প্রমাণের এ প্রেক্ষাপটে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মুহাম্মদ আপন আগ্রহেই মদীনায় স্থানান্তরিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অতএব মক্কা থেকে তাঁকে বহিষ্কার বা হত্যা চেষ্টার প্রয়োজন পড়েনি। এ পর্যন্ত কুরাইশরা দীর্ঘ তের বছর তাঁর দ্বারা তিরস্কার, বিরক্তি, সামাজিক ও পারিবারিক বিবাদ সহ্য করেছে। এরপর যখন তিনি নিজের ইচ্ছাতেই মক্কা ত্যাগ করতে যাচ্ছিলেন, সেটি ছিল কুরাইশদের জন্য বড় একটা স্বস্তির খবর। তদুপরি মুহাম্মদ মদীনার উদ্দেশে মক্কা ত্যাগের পরেও তাঁর শিষ্য (পরবর্তীতে জামাই) আলী, আবু বকরের স্ত্রী ও কন্যা আয়েশা (তখন মুহাম্মদের সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ) আরো কয়েকদিনের জন্য মক্কায় থেকে যায়। কিন্তু এদের কাউকেই কুরাইশরা বিশেষ কোন রকম ক্ষতি বা নির্যাতন করে নি।

ইসলামী ইতিহাসবিদ ইবনে ইসহাক জানান: 'কুরাইশরা দেখলো যে মুহাম্মদ তাঁর বংশের বাইরে (মদীনায়) অনুসারী পেয়েছে; সুতরাং তারা এখন আকস্মিক আক্রমণের হাত থেকে মুক্ত নয়।' অতঃপর তারা তাঁকে লৌহ-শিকলে বন্দী করার, বা মক্কা থেকে বিতাড়িত করার, কিংবা হত্যা করার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে এবং শেষ উপায়টি

অবলম্বন করে।[27] কিন্তু এটা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নয় যে, যদি নিষ্ঠুর কুরাইশরা তাঁকে হত্যার জন্য এতটাই নাছোর হতেন, তাহলে তারা অন্তত পেছনে থেকে যাওয়া আলী এবং মুহাম্মদ ও আবু বকর-এর পরিবারকে বিভিন্নভাবে হয়রানি-নির্যাতন করতো। মুহাম্মদের মক্কা থেকে সফলভাবে পলায়নের পর তাঁর শিষ্য তালহা মদীনা থেকে মক্কায় ফিরে আসেন এমনভাবে যেন কিছুই ঘটে নি। ফিরে এসে তিনি মুহাম্মদ ও আবু বকরের পরিবারকে মক্কা থেকে নিয়ে যান।[28]
কুরাইশরা যে মুহাম্মদকে হত্যা করতে কিংবা বিতাড়িত করতে চেয়েছিল - উপরোক্ত বিষয়-বিবেচনাগুলো তা অবিশ্বাস্য করে তোলে। পরন্তু অন্যত্র মুহাম্মদের এক ভাষ্য আমাদেরকে জানায় যে, আল্লাহ স্বয়ং মদীনায় মুহাম্মদের মিশনের সফলতার দৃশ্য দেখেছিলেন ও তাঁকে সেখানে গমনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুহাম্মদ বলেন: 'আমি (আল্লাহ-কর্তৃক) আদিষ্ট হয়েছিলাম এমন একটি শহরে অভিবাসিত হতে, যে শহর অন্যান্য শহরকে গ্রাস (জয়) করবে, এবং যাকে বলা হয় ইয়াথ্রিব, এবং যা হলো মদীনা ('মদীনাত-উল-নবী' অর্থাৎ নবীর আবাস)' (বোখারী ৩:৯৫১)।
পরবর্তীতে আল্লাহ এক আয়াতে (কুরআন ২:২১৭) মুহাম্মদ ও তাঁর সমপ্রদায়ের প্রতি কুরাইশদের ব্যবহার সম্পর্কে বলেন: 'আল্লাহর পথে আসতে বাধা প্রদান করা, তাঁকে অস্বীকার করা, পবিত্র মসজিদে প্রবেশে বাধা প্রদান ও তাঁর সদস্যদেরকে বিতাড়িত করা আল্লাহর দৃষ্টিতে গুরুতর অপরাধ।' এখানে আল্লাহ স্পষ্টতঃই জানাচ্ছেন যে, মক্কাবাসীরা কেবলমাত্র মুহাম্মদের ধর্ম বিশ্বাস অগ্রাহ্য, ইসলাম গ্রহণে অন্যদেরকে (সাধারণত নিজ পরিবারের সদস্যদেরকে) বাধা প্রদান ও মুহাম্মদের সমপ্রদায়কে কা'বা ঘরে ঢুকা নিষেধ করেছিল। কুরাইশরা মুহাম্মদকে বা অন্য কোন মুসলিমকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে, এ কথা আল্লাহ কোথাও উল্লেখ করেন নি। এ বাণীতে 'সদস্যদের বিতাড়িত করা' বলতে আল্লাহ সম্ভবত এটা বুঝাতে চেয়েছেন যে,

[27]. Ibn Ishaq, p. 121-122
[28]. Muir, p. 165

কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণ না করায় মুহাম্মদ তাঁর ধর্মপ্রচারে সফলতা পাওয়ার জন্য অন্যত্র (মদীনায়) গমনে বাধ্য হয়।
বদর'এর যুদ্ধে মুহাম্মদ নিজেও একই ব্যাখ্যার স্বীকৃতি দেন। এ যুদ্ধে কুরাইশরা পরাজিত হওয়ার পর মুসলিমরা যখন তাদের মৃতদেহ আচারহীনভাবে গণকবরে নিক্ষেপ করছিল, তখন মুহাম্মদ মৃতদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলেন: হে নরকের বাসিন্দারা, তোমরা তোমাদের নবীর দুর্বিনীত স্বজন। যখন অন্যেরা (মদীনাবাসীরা) বিশ্বাস করেছে, তখন তোমরা আমাকে মিথ্যুক বলেছো; তোমরা যখন আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছো, অন্যেরা বুকে তুলে নিয়েছে। তোমরা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছো, আর অন্যেরা আমার পক্ষে যুদ্ধ করেছে।"[29] এখানেও নবী কুরাইশ কর্তৃক তাঁকে হত্যার কথা উল্লেখ করেন নি। এখানে যে লড়াই বা যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, তা তাঁর মদীনায় অভিবাসিত হওয়ার পরের যুদ্ধ, যা তিনি নিজেই শুরু করেন। কেননা এর আগে কুরাইশ ও মুসলিমদের মাঝে কোন যুদ্ধ হয়নি এবং সে যুদ্ধে মুহাম্মদের পক্ষ মদীনাবাসীদের যোগ দেওয়ার কোনই সুযোগ ছিল না।

মুহাম্মদকে হত্যা করার জন্য কুরাইশ-উদ্যোগের কাহিনীটি ছিল খুব সম্ভবত নবীর এক মিথ্যে প্রচারণা - এ আশায় যে, এটা মদীনায় পৌঁছানোর পর সেখানকার জনগণের তাঁর প্রতি সহানুভূতি আকর্ষণে, অথবা মদীনাবাসীদেরকে (বিশেষ করে তাঁর অনুসারীদেরকে) কুরাইশদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন করে ও ক্ষেপিয়ে তুলতে সহায়ক হবে। মদীনায় অবস্থান নেওয়ার পরপরই কুরাইশদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের আক্রমণাত্মক ও হিংসাত্মক জিহাদ শুরু সে সম্ভাবনাকে সমর্থন করে। এখানে উল্লেখ্য যে, তিন বছর আগে ঠিক একইভাবে তিনি কুরাইশদের বিরুদ্ধে তা'য়েফীদের মাঝে শত্রুভাব গড়ে তোলার ব্যর্থ প্রয়াস করেন।

মক্কাবাসীরা কি নিষ্ঠুর ছিলেন?

মুসলিম সমাজের কথোপকথনে মক্কার কুরাইশদের সম্পর্কে যে ধারণা দেওয়া হয়, তাতে মনে হয় কুরাইশরা ছিল অতিশয় বর্বর। বলা হয়

---

[29]. Ibn Ishaq, p. 306

তারা নবীর উপর প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতা আরোপ করেছিল। এক মুসলিম আমাকে লিখেছে যে, মক্কায় কুরাইশরা 'দীর্ঘ ১৩ বছরে অনেক মুসলিমকে মেরে ফেলে। লোমহর্ষক উপায়ে নির্যাতন করে কুরাইশরা তাদেরকে হত্যা করে।'[30] মুসলিমরা কুরাইশদের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ ব্যবহার করে মুহাম্মদের সহিংস অভিযান ও মক্কা দখল এবং তাদের ধর্ম বিনষ্ট করার অজুহাত হিসেবে। কুরআন ও সুন্নত-এ কুরাইশদেরকে অসভ্য, নিষ্ঠুর নির্যাতনকারী ও আল্লাহর শত্রুরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে বারবার। এমন কি মক্কায় অবস্থানকালে মুহাম্মদ নিজেও তাদেরকে শয়তান ও পাপী বলে আখ্যায়িত করেন, 'যারা সর্বোচ্চ পাপের অনুরক্ত' (কুরআন ৫৬:৪৬) এবং 'হতভাগ্য', যাদেরকে ঘনঘন 'অগ্নিকুণ্ডে ও ফুটন্ত পানিতে নিক্ষেপ করা হবে' (কুরআন ৫৬:৪১-৪২)। মুহাম্মদ মক্কার পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে শুধু দোষারোপই করেন নি, তাদের বিরুদ্ধে ইহলৌকিক শাস্তিরও হুমকি দেন এভাবে: 'দোষীদের সাথে আমরাও তদ্রূপ আচরণ করবো। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের উপর অভিশাপ নেমে আসবে' (কুরআন ৭৭:১৮-১৯)। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে সঠিক বা সত্যভাষী এবং ইসলাম প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে মিথ্যুক, পাপী ও মিথ্যা-সৃজনকারী বলে আখ্যায়িত করেন এবং মক্কার পৌত্তলিকদেরকে নরকের অনন্ত অগ্নিকুণ্ডে ন্যস্ত করেন। নিচে আল্লাহর প্রথম দিককার আয়াতগুলোর মধ্যে থেকে এধরনের কয়েকটি বাণী উল্লেখ করা হলো:

'যাঁরা বিশ্বাস করে এবং ধৈর্যশীলতা (দৃঢ়তা ও আত্মসংযম), করুণা ও দয়া পোষণ করে, তাঁরা তাদের মধ্যে গণ্য হবে যাঁরা (ঈশ্বরের) দক্ষিণ হস্তের সঙ্গী। কিন্তু যারা আমাদের ইশারাকে (ঐশীবাণী) অস্বীকার করে... তারা চির অগ্নিকুণ্ডে নিপতিত হবে' (কুরআন ৯০:১৭-২০)।

'যারা আল্লাহর বাণী বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তাদেরকে পথ নির্দেশনা দিবে না; তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। ...তারা মিথ্যা রচনাকারী; তারা মিথ্যাবাদী' (কুরআন ১৬:১০৪-১০৫)।

---

[30]. Islamic literature records no incidence of death; no Muslim died in anti-Islam violence during Muhammad's stay in Mecca.

যাহোক, মুসলিমরা দাবী করে যে, কুরাইশরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি অমানবিক নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেছিল। মুসলিম সমাজে এ ধারণা গভীরভাবে বদ্ধমূল হলেও, তা প্রমাণ করা খুবই কঠিন। অসহায় উষর মরু পরিবেশে ও সে সময়ের কঠোর অভাব-অনটনের মুখে মক্কাবাসীরা ছিল খুবই ধর্মপ্রাণ মানুষ। ঐশ্বরিক অনুগ্রহ লাভের আশায় তারা ঈশ্বরের পবিত্রঘর কা'বায় ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করেছিল। তারা কা'বাকে আরব ও আশপাশের দেশগুলোর পৌত্তলিকদের জন্য সর্বোচ্চ ধর্মীয় শ্রদ্ধার বস্তু ও তীর্থকেন্দ্রে পরিণত করেছিল। আজকের মুসলিমরা কা'বাকে যতটা শ্রদ্ধা করে, তৎকালে পৌত্তলিকরাও তাই করতো। মুহাম্মদ শুধু কা'বাকে ভিত্তিহীনভাবে তাঁর নিজের ঈশ্বরের পবিত্রঘর বলেই দাবী করেন নি, তাঁর বাণী পৌত্তলিক ধর্মকে মিথ্যা বলেও অভিহিত করেছিল।

এ ধরনের অপমানকর মন্তব্য ও স্পর্ধিত দাবী সত্ত্বেও কুরাইশরা মুহাম্মদ ও তাঁর সমপ্রদায়কে ১৩ বছর মক্কায় বসবাস করতে দেয়। মুহাম্মদ মক্কায় প্রথম সাত বছর - অর্থাৎ যতদিন না তাঁর ঐশীবাণী কুরাইশদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ও অপমানকর হয়ে উঠে - ততদিন প্রায় স্বাধীনভাবে তাঁর ধর্ম প্রচার করতে পেরেছিলেন। মক্কাবাসীরা কা'বার প্রতি মুহাম্মদের দাবীর বিরোধী ছিল এবং পরবর্তিতে তাঁর কথাবার্তা ও ঐশীবাণীগুলো ক্রমান্বয়ে অপমানকর হয়ে উঠায় তাঁর প্রচারকার্য অনেকটা অসম্ভব করে তুলেছিল, কিন্তু তারা তাঁর বা তাঁর শিষ্যদের উপর চড়াও হয়ে কাউকে হত্যা বা আহত করেছে, এমন কোন নজীর নেই।

মুসলিম দাসদের উপর কুরাইশদের নির্যাতনের কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা রয়েছে; এর কারণ তারা মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করে কুরাইশদের ধর্মবিশ্বাসকে অপমানিত করেছিল। কিন্তু তা কখনোই মারাত্মক বা জীবনের প্রতি হুমকীদায়ক ছিল না। এমন কিছু উদাহরণও রয়েছে যে, কুরাইশরা তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে মুহাম্মদের দলে যোগ দিতে বাধা সৃষ্টি করেছিল (কখনো কখনো ঘরে তালাবদ্ধ রেখে)।

নিম্নে বর্ণিত মুসলিম উপাখ্যানবিদদের কিছু সাক্ষ্য বা বিবৃতিও প্রমাণ করে যে, কুরাইশদের প্রতি মুহাম্মদের প্রকাশ্য শত্রুভাবাপন্নতা

দেখানো ও অপমানকর গালিবাজী সত্ত্বেও, কুরাইশরা তাঁর প্রতি উল্লেখযোগ্য সহনশীলতা দেখিয়েছিল। আল- জুহরী লিপিবদ্ধ করেন:
(শুরুতে) তিনি (মুহাম্মদ) যা বলেছেন অবিশ্বাসী কুরাইশরা তাঁর বিরোধিতা করেনি। একত্রে বসে থাকা তাদের পাশ দিয়ে (মুহাম্মদের) যাবার সময় তাঁকে লক্ষ্য করে তারা বলত: আব্দুল মুত্তালিবের গোত্রের এ যুবকটি স্বর্গীয় বাণী পেয়েছে বলে দাবী করে! যতদিন আল্লাহ তাদের ঈশ্বরকে আক্রমণ করেনি, ততদিন তারা এ রকমই বলতো..., এবং পরে তিনি (আল্লাহ) যখন ঘোষণা করেন যে, তাদের পিতাগণ যারা অবিশ্বাসী হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে তারা সবাই নরকে পতিত হয়েছে, তারপরে তারা নবীকে ঘৃণা ও তাঁর প্রতি শত্রুতা শুরু করে।[31]

মুহাম্মদের স্বর্গীয় বার্তা কুরাইশদের ধর্ম, দেবতা এবং রীতি ও প্রথার বিরোধী ও অবমাননাকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ইসলাম গ্রহণের আহ্বানকে তারা খুবই ভদ্রোচিতভাবে প্রত্যাখান করত। তাঁর একটা উদাহরণ হলো: একদিন মুহাম্মদের চাচা আবু তালিব একটা স্থান অতিক্রম করার সময় দেখলেন যে, তাঁর পুত্র আলি মুহাম্মদের সঙ্গে নামাজ পড়ছে। তিনি আলীর কাছে জানতে চান সে মুহাম্মদের সঙ্গে কী করছে। এ সময় নবী উত্তর দিলেন: 'সে (আলী) তাঁকে প্রদত্ত ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের শিক্ষার অনুকরণ করছে' এবং তিনি আবু তালিবকেও তা অনুসরণের আহ্বান জানান। এ আহ্বান পেয়ে বৃদ্ধ আবু তালিব উত্তর দিলেন যে, তিনি পূর্ব- পুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করতে পারবেন না কিংবা তিনি এমন প্রার্থনায় যোগ দিতে পারেন না, যে ক্ষেত্রে 'তাঁর পশ্চাৎদেশকে মাথার উপর স্থাপন করতে হয়' (নামাজের সেজদার সময়)।[32]

তাদের দেবতা ও পূর্ব- পুরুষদের প্রতি মুহাম্মদের নিন্দাপূর্ণ ভাষা ও অপবাদ সম্পর্কে কুরাইশদের যে প্রতিক্রিয়া ছিল, তা তাঁর শিষ্য আমর

---

31. Sharma SS (2004) *Califs and Sultans: Religions Idology and Political Praxis*, Rupa & Co, New Delhi, p. 63; Muir, p. 63

32. Glubb JB (Glubb Pasha, 1979) *The Life and Times of Mohammad*, Hodder & Stoughton, London, p. 98

ইবনে আল আ'স- এর ভাষ্যস্বরূপ বাইহাকী তার 'প্রুফ অব প্রফেসি' ('নবুয়তীর প্রমাণ') বইটিতে লিপিবদ্ধ করেন। আ'স বলেন:
একদিন কা'বায় সমবেত পৌত্তলিকদের মাঝে আমি উপস্থিত ছিলাম। তারা আল্লাহর নবী সম্বন্ধে আলোচনা করছিল। তারা বলে: 'আমরা এর পূর্বে কখনোই কারো কাছ থেকে এরকম কিছু সহ্য করিনি, যা এ লোকটির কাছ থেকে সহ্য করছি। সে আমাদের পিতৃগণকে অপবাদ দিচ্ছে, আমাদের ধর্মের সমালোচনা করছে এবং আমাদের জনগণকে বিভক্ত করছে, আর আমাদের দেবতাদের অপমান করছে। এ লোকটার কাছ থেকে আমাদেরকে এরূপ যন্ত্রণাদায়ক বিষয় সহ্য করতে হচ্ছে।' নবী তখন কাছেই ছিলেন এবং তাদের কথাবার্তা শুনছিলেন। তিনি উত্তরে বলেন: 'হে কুরাইশগণ! আমি অবশ্যই সুদসহ এর পরিশোধ নেবো।' [33]

এ কথা সত্য যে, কুরাইশরা তাদের পৈতৃক ধর্মকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে ও মুহাম্মদের ধর্মের বিরোধিতা করে। অথচ তারা তাঁর ধর্ম প্রচারের ৬ষ্ঠ বছরের শেষ দিকেও মুহাম্মদকে কা'বা- গৃহে প্রবেশে বাধা দেয় নি। সালমান রুশদীর উপন্যাসের প্লট 'স্যাটানিক ভার্সেস' (কুরআন ৫৩:১৯- ২০)- এর নাটকীয় ঘটনায় এর সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলে। আল- তাবারী'র ইতিহাস অনুসারে দু'টি তথাকথিত 'শয়তানের ঐশীবাণী' ('স্যাটানিক ভার্স') - তে মুহাম্মদ পৌত্তলিকদের আল- লাত, আল- উজ্জা ও আল- মানাত দেবীদেরকে পূঁজারযোগ্য বলে স্বীকার করে নেন। পরবর্তিতে মুহাম্মদ যখন তাঁর এ ভুল বুঝতে পারেন, তখন শয়তান মুহাম্মদের মুখে সে ঐশীবাণী দু'টো তুলে দিয়েছিল - এ ছুতায় আল্লাহ তা পরিত্যাগ করেন (কুরআন ৫৩:২১- ২২)।[34] এ ঘটনাটি ঘটে ৬১৬ সালে যখন কা'বাঘরের মধ্যে মুহাম্মদ কুরাইশ নেতাদের সঙ্গে এক সমন্বয় বৈঠক করছিলেন।[35] ৬২৮ সালে হুদাইবিয়ার সন্ধিতে কুরাইশরা আবারও মুহাম্মদ ও তাঁর অনুগামীদেরকে তীর্থ (ওম্‌রা) পালনের জন্য

[33]. Sharma, p. 63-64
[34]. Al-Tabari, Vol. VI, p. 107
[35]. Ibid, p. 165-67; Muir, p. 80

প্রতিবছর তিন দিন কা'বা ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেয় (নীচে দেখুন)। এখন চলুন আমরা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে একই রকম একটা কল্পিত পরিস্থিতি বিবেচনা করি:

মনে করুন, মক্কার যে কোন সমপ্রদায়ের অথবা সৌদী আরবের বাইরের অথবা বিশ্বের যেকোন স্থানের এক লোক মক্কায় গিয়ে সমবেত একদল মুসলিমের সামনে ঘোষণা দিলেন যে, তিনি সত্যিকারের ঈশ্বরের নিকট থেকে প্রত্যাদেশ পেয়েছেন যে, তিনিই সত্যিকারের প্রেরিত বার্তাবাহক; ইসলাম মিথ্যা; কা'বা তারই ঈশ্বরের পবিত্র ঘর; মুসলিমদের উচিত তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে তার নতুন ধর্ম গ্রহণ করা।

এ তথাকথিত নতুন নবীর ভাগ্যে কী ঘটবে, তা অনুধাবণ করা কারোর পক্ষেই কঠিন হবে না। স্পষ্টতঃই সে লোকটিকে মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হতে পারে। বাস্তবত যদি কেউ যে কোনো মুসলিম দেশের একটি প্রধান মসজিদে গিয়ে প্রকাশ্যে এরূপ দাবী করে, আজকের জাতিসংঘ সনদে মানবাধিকার ও বাকস্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও তাকে ইসলামের ঈর্ষাপরায়ণ অনুসারীদের হাতে একই ভাগ্য বরণ করতে হতে পারে। এ উদাহরণ থেকে আজকের মুসলিম এবং সেই তথাকথিত 'বর্বর' যুগের মক্কার কথিত হতভাগ্য ও দুর্বৃত্ত পৌত্তলিকদের মধ্যে সহিংস প্রবণতার তুলনা করা খুবই সহজ। মক্কাবাসী পৌত্তলিকদের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি অবিরাম অপমানকর উক্তি ও তাদের পবিত্র মন্দিরের উপর অধিকার দাবী সত্ত্বেও তারা দীর্ঘ তের বছর মুহাম্মদকে তাদের মধ্যে বাস করতে দেয়; তারা তাঁর উপর কোনরূপ শারিরীক নির্যাতন করে নি। মুহাম্মদের নবুয়তী কার্যকলাপ কুরাইশদের জীবন ও ধর্মের উপর কিরূপ প্রভাব ফেলেছিল স্যার উইলিয়ম মুইর তা ব্যক্ত করেন এভাবে: তাদের তীর্থ মন্দির, মক্কার গৌরব ও আরবের সমগ্র অঞ্চলের তীর্থকেন্দ্র অবজ্ঞাত বা অর্থহীন হয়ে পড়ার সমূহ আশঙ্কায় বিপন্ন হয়ে পড়ে।[36]

---

[36]. Muir, p. 62

তবুও কুরাইশরা মুহাম্মদকে কা'বায় প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে। অথচ আজকের দিনেও অমুসলিমদের জন্য মুসলিম- প্রধান দেশের যে কোন মসজিদে (কা'বা দূরে থাক) পরিদর্শনের জন্যও প্রবেশ নিষেধ।

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত অমুসলিমদের জন্য মুসলিমদের দুটি পবিত্র স্থান মক্কা এবং মদীনা নগরীতে প্রবেশ নিষিদ্ধ রয়েছে। ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কয়েকজন অমুসলিম ফরাসী নাগরিক মদীনার নিকটবর্তী একটি নিষিদ্ধ সীমার মধ্যে ঢুকে পড়ার কারণে খুন হয়।[37] এটা সুস্পষ্ট যে, ইসলামের অসহিষ্ণু শিক্ষা সপ্তম শতাব্দীর আরব দেশের অত্যন্ত সহিষ্ণু ও সভ্য জনগণকে অতিশয় গোঁড়া ও খুনী জাতিতে পরিণত করেছে। এ রকম অসহিষ্ণুতা ও ধর্মান্ধতা আজ শুধু আরব দেশেই নয়, গোটা বিশ্বের সকল স্থানের মুসলিমরা তার উত্তরাধিকার বহন করে চলছে। আর মুহাম্মদ সপ্তম শতকের মক্কার সেই সহিষ্ণু ও সুসভ্য জনগণকে নিষ্ঠুর, দুর্বৃত্ত ও দুর্ভাগা বলে আখ্যায়িত করেন, যে ধারণা আজকের মুসলিমরাও পোষণ করে।

আজও বহু দেশের মুসলিমরা প্রকাশ্যে ইসলামত্যাগীদের হত্যা করে, যদিও সমস্ত মুসলিম দেশ জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করেছে, যা সবাইকে পছন্দমত ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তনের নিশ্চয়তা প্রদান করে। কিন্তু সপ্তম শতকের মক্কার পৌত্তলিকরা কখনোই মুহাম্মদ কিংবা মক্কার অনেক মুক্ত নাগরিক - যারা পৈতৃক ধর্ম ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল - তাদের কোনই ক্ষতি করে নি। স্পষ্টতই, আজকের মুসলিমরা মক্কার সেসব কুরাইশদের চেয়ে অনেক বেশী অসহিষ্ণু, নিষ্ঠুর ও অসভ্য।

মক্কাবাসীদের অনুকরণযোগ্য সহনশীলতা

মুহাম্মদের সময়ে মক্কার সমাজ অবশ্যই পারস্য, সিরিয়া, মিসর ও ভারতের মত অধিক অগ্রসর ও সভ্য সমাজের তুলনায় পশ্চাৎপদ ও আভিজাত্যহীন ছিল। মক্কাবাসীরা ছিল একটা গভীর ধর্মপ্রাণ সমপ্রদায়। মক্কার সে সমাজের লক্ষণ ছিল অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা, সঙ্গতিপূর্ণতা ও সহবাস - বিদ্বেষপরায়ণতা বা অসহিষ্ণুতা নয় - যদিও ইসলামে তাদেরকে অযৌক্তিকভাবে বর্বর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

---

[37]. Globe and Mail (Canada), *Gunmen slay 3 frenchmen in Saudi Arabia*, 26 Feb. 2007.

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কা'বা যদিও মক্কার পৌত্তলিকদের শ্রদ্ধেয় 'ঈশ্বরের ঘর' ও ভক্তির কেন্দ্রস্থল ছিল, তথাপি তারা সে ঘরকে একান্তই তাদের নিজস্ব বলে মনে করতো না। বরং তারা ঐ অঞ্চল ও প্রতিবেশী দেশসমূহের, যেমন দক্ষিণ আরব, মেসোপটেমিয়া, ফিলিস্তিন, সিরিয়া এবং দূরবর্তী অন্যান্য অঞ্চলের সকল ধর্মসমপ্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতীক ও প্রতিমা স্থাপনের অনুমতি দিয়েছিল তাদের সে পবিত্র ধর্মমন্দিরে।[38] মক্কা যেহেতু ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র এবং বহু দূরবর্তী অঞ্চলের বণিকদের কিছু সময়ের জন্য অবস্থান বা বিশ্রামের স্থান, মক্কার লোকেরা ঐসব বণিকদের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তার প্রতি ছিল খুব অমায়িক। তারা বিদেশীদেরকে নিজ নিজ ধর্মীয় দেবদেবীর মূর্তি কা'বাঘরে স্থাপনের অনুমতি দিত, যাতে করে বিদেশীরা সেখানে অবস্থানকালে স্ব-স্ব ধর্মাচার ভক্তির সাথে পালন করতে পারে। বিভিন্ন দেশ ও ধর্মবিশ্বাস থেকে আনিত ঐসব মূর্তিগুলো পবিত্র কা'বাঘরে মোট ৩৬০টি প্রস্তর-মূর্তি হিসেবে বৃত্তাকারে সজ্জিত ছিল। এমন কি ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতীক হিসেবে ইব্রাহীম ও ইসমাইলের ছবি এবং মেরীর কোলে শিশু যীশুর প্রতিচ্ছবিও কা'বাঘরে স্থান পেয়েছিল।

মুহাম্মদ মক্কা দখলের দিন পবিত্র কা'বায় স্থাপিত সকল মূর্তি ধ্বংসের নির্দেশ দেন। তুর্কীর মুসলিম ইতিহাসবিদ ইমেল এসিন জানান, তিনি ইব্রাহীম ও ইসমাইলের প্রতিচ্ছবি ধ্বংসেরও অনুমোদন দেন, কিন্তু নিজ হস্ত দিয়ে যীশু ও মেরীর প্রতিচ্ছবিটি আড়াল করে রক্ষা করেন।[39] পৌত্তলিকতা চর্চার কারণে যদিও ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা পৌত্তলিক কুরাইশদের সতত নিন্দা করতো, তবুও কুরাইশরা কা'বা গৃহে খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের প্রতীককে স্থান দিয়েছিল।

মুহাম্মদের সময়ে সিরিয়ার কিছু বণিক মক্কায় খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার করত, যাদেরকে কুরাইশদের পক্ষ থেকে কোন রকম বাধার সম্মুখীন হতে

---

38. Walker, p. 44

39. Esin E (1963) *Mecca the Blessed, Medina the Radiant*, Elek, London, p. 109

হয়নি।[40] সে সময় কিছু সংখ্যক মক্কাবাসী খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণও করেছিলেন। তাদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন ওয়ারাকা ইবনে নওফেল এবং ওসমান ইবনে হুবেরিথ। মক্কায় এদের অবস্থান ছিল যথেষ্ট মর্যাদাপূর্ণ (নীচে দেখুন)। কুরাইশরা তাদের ধর্মের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের দ্বারা নানা রকম অপমান সত্ত্বেও মুসলিমদেরকে কা'বায় প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিল, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এমন কি ভারতীয় হিন্দু, যারা ভিন্ন রকমের প্রতিমা-পূজা করতো, তারাও কা'বাঘরে ঢুকতে পারতো। বলা হয় যে, ভারতীয় বণিকরা পাথরের দেবী-মূর্তি আল-মানাত'কে কা'বাঘর থেকে অলক্ষ্যে নিয়ে এসে ভারতের সোমনাথ মন্দিরে স্থাপন করেছিল। কা'বা থেকে এক সময় মূর্তিটি হারিয়ে যায় বলে জানা যায়। সোমনাথ মন্দিরে পরবর্তীকালে আল-মানাত খুবই জনপ্রিয় দেবী রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। ধার্মিক মুসলিম বিজয়ী বীর গজনীর সুলতান মাহমুদ কা'বার পৌত্তলিকতার এ সর্বশেষ সাক্ষীটি নিশ্চিহ্ন করতে ১০২৪ সালে সোমনাথ আক্রমণ করেন। হিন্দুদের অতীব শ্রদ্ধাস্পদ এ মূর্তিটি রক্ষার চেষ্টায় প্রায় ৫০, ০০০ হিন্দু সুলতান মাহমুদের তরবারীর নীচে প্রাণ দেয়।[41]

এসব ঘটনা বিচার করলে দেখা যায়, সেকালের পৌত্তলিক মক্কাবাসীরা স্পষ্টতঃই আজকের মুসলিমদের তুলনায় অনেক বেশী সহনশীল, অমায়িক ও সভ্য ছিল। মুহাম্মদ কুরাইশদের ধর্ম, দেবদেবী ও রীতিনীতির ব্যাপক অবমাননা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেও, তারা তাঁকে তেরটি বছর ধৈর্য্যের সাথে সহ্য করে। কুরাইশরা তাঁর প্রতি একটিমাত্র নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছিল; সেটি হলো দু'বছরের জন্য (৬১৭-৬১৯ সাল) মুহাম্মদের সমপ্রদায়ের উপর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ, যা এ ধরনের অবস্থা মুকাবিলায় আজকের যুগেও সভ্য আচরণ হিসেবে গণ্য।

সুতরাং সে সময়ে মক্কার সমাজ সহজ-সরল, আভিজাত্যহীন ও পশ্চাৎপদ হওয়া সত্ত্বেও, করুণা, সহনশীলতা, অমায়িকতা ও

---

[40]. Tagher J (1998) Christians in Muslim Egypt: A Historical study of the Relation Between Copts and Muslims from 610 to 1922, Trs. Makar RN, Oros Verlag, Altenberge, p. 16

[41]. Sharma, p. 144-45.

অহিংসার বিচারে সপ্তম শতাব্দীর মক্কার পৌত্তলিকরা আজকের মাপকাঠিতেও ছিল খুবই সভ্য মানুষ। মোট কথা, চৌদ্দ শত বছর ধরে মুসলিমদের দ্বারা অত্যন্ত ঘৃণ্য হিসেবে চিহ্নিত হলেও, মক্কার পৌত্তলিকরা প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত সহিষ্ণু ও সভ্য মানুষ ছিল।

মুহাম্মদের মক্কা- বিরোধী কর্মকাণ্ড ও যুদ্ধাভিযান (৬২৩- ৬৩০)

নবী মুহাম্মদের মদীনায় অবস্থান গ্রহণ তাঁর নবুয়তী কর্মে সফলতার আশীর্বাদ বয়ে আনে। এ সফলতা ছিল খুবই প্রত্যাশিত; কেননা ইতিমধ্যে মূসাব বিন ওমায়ার নবীর অনুপস্থিতিতেও অনেক মদীনাবাসীকে ইসলামের পতাকাতলে আনতে পেরেছিল। মুহাম্মদ মদীনায় পৌঁছাতেই তাঁর প্রতীক্ষারত শিষ্যদের দ্বারা বীরোচিত সংবর্ধনা লাভ করেন। মদীনার জনগণ ছিল পৌত্তলিক ও ইহুদী। তাদের মধ্যে ইহুদীরা ছিল অধিকতর ধনী ও প্রভাবশালী। অল্পদিনের মধ্যেই মদীনার পৌত্তলিক গোত্রের অধিকাংশ নাগরিক ইসলামে যোগ দেয়।

জিহাদের বীজ বপন

ইবনে ইসহাক জানান, মদীনায় অবস্থান গ্রহণের প্রথম বর্ষের মধ্যে মুহাম্মদ সেখানকার গোত্রগুলোর সাথে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন, যা পরবর্তীতে সুবিখ্যাত 'মদীনা সনদ' নামে পরিচিতি লাভ করে। এ চুক্তিপত্রে কিছু শর্তবিশেষ নবীর সহিংস আশাবাদ ব্যক্ত করে, বিশেষ করে মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে। এমন দু'টি শর্ত হলো:[42]

১. কোন অবিশ্বাসীর মৃত্যুর (মুসলিমের দ্বারা) জন্য কোন বিশ্বাসীকে (মুসলিমকে) মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না, কিংবা কেউ

---

[42]. Ibn Ishaq, p. 231-33; Watt WM, *Muhammad in Medina*, OXford University press, Karachi, 2004 imprint, p. 221-25

(মদীনাবাসীদের মধ্যে) মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোন অবিশ্বাসীকে সমর্থন দিতে পারবে না।

২. বহু-ঈশ্বরবাদীরা (মদীনার) কোন কুরাইশ বা তার সম্পদ নিজেদের হেফাজতে নিতে পারবে না, কিংবা মুসলিমদের কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করতে পারবে না।

সনদটির এ শর্তদুটি পরিষ্কার করে তুলে যে, মুহাম্মদ তাঁর পৈতৃক শহর মক্কার কুরাইশদের বিরুদ্ধে সহিংস অভিযান চালানোর জন্যই মদীনায় পৌঁছেছিলেন, যা তিনি অচিরেই শুরু করে দেন। মুহাম্মদ প্রথমে প্রায় ছয় মাস ধরে তাঁর সমপ্রদায়ের জন্য একটা বাসস্থান গড়ে তুলেন। এভাবে মদীনায় স্থায়ী হওয়ার পরপরই তিনি কুরাইশদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের কাজে নেমে পড়েন।

এটা অনুমান করা যায় যে, মুহাম্মদের শিষ্যরা শুরুতে তাঁর সহিংসকার্যে জড়িত হওয়ার বিরোধী ছিল। তখন তাঁর সাহায্যে আল্লাহ এগিয়ে আসেন সহিংসতা উদ্দীপ্তকারী ঐশীবাণী নিয়ে মুসলিমদেরকে জিহাদ বা পবিত্রযুদ্ধে প্ররোচিত করতে - প্রথমত কুরাইশদের বিরুদ্ধে, পরবর্তীতে সমস্ত অমুসলিমদের বিরুদ্ধে। মুহাম্মদের অনিচ্ছুক শিষ্যদেরকে বুঝানোর জন্য আল্লাহ যুদ্ধকে ধর্মীয় কাজ বলে অনুমোদন করে ঐশীবাণী পাঠান: 'আল্লাহর জন্য যুদ্ধ কর তাদের বিরুদ্ধে, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করো না; কারণ আল্লাহ সীমা লঙ্ঘণকারীদের পছন্দ করেন না' (কুরআন ২:১৯০)। এ ঘটনার আগে মুসলিম ও কুরাইশদের মধ্যে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়নি। তবে মক্কায় কুরাইশরা মুহাম্মদের ধর্মপ্রচারের বিরোধিতা করেছিল, যাকে আল্লাহ বা মুহাম্মদ 'যুদ্ধ' হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন। উপরোক্ত আয়াতে সম্ভবত একেই কুরাইশ-কর্তৃক নবীর বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ' বলা হয়েছে। সুতরাং এ আয়াতের মাধ্যমে কুরাইশদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের সহিংস যুদ্ধ স্বর্গীয় অনুমোদন পায়।

এরপরও যেসব শিষ্য বিনা উস্কানিতে কুরাইশদের বিরুদ্ধে সহিংসতায় জড়িত হওয়ার বৈধতা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন, আল্লাহ তাদের জন্যও বিষয়টি সহজ করে দেন। তিনি প্রত্যাদেশ পাঠান: 'তোমরা তাদেরকে যেখানে পার হত্যা কর, এবং তাদেরকে বিতাড়িত কর সেখান থেকে যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বিতাড়িত করেছে। কারণ দাঙ্গা ও

নিপীড়ন হত্যার চেয়েও নিকৃষ্ট' (কুরআন ২:১৯১)। উপরোক্ত বর্ণনায়, কুরাইশরা যেহেতু মুহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে ও তাঁকে বহিস্কার করে 'হত্যার চেয়েও নিকৃষ্ট' অপরাধ করেছে, সুতরাং ন্যায়বিচারের খাতিরে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধতারও ঊর্ধ্বে। কাজেই কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিষয়ে নৈতিকতা নিয়ে বিশ্বাসীদের মধ্যে কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়, কারণ সে যুদ্ধ কেবলমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে। যতক্ষণ-না ন্যায়বিচার ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস (অর্থাৎ ইসলাম) কর্তৃত্বকর হচ্ছে, আল্লাহ তাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত দৃঢ়চিত্তে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এভাবে: 'তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও যতক্ষণ না দাঙ্গা বা নিপীড়ন নিশ্চিহ্ন হয়, এবং ন্যায়বিচার ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস জয় লাভ করে' (কুরআন ২:১৯৩)। অন্য আলোচনায় যাওয়ার আগে এ ঐশীবাণীগুলোতে উল্লেখিত 'দাঙ্গা বা নিপীড়ন' বলতে কী বুঝায় তা খতিয়ে দেখা যাক।

দাঙ্গা ও অত্যাচার-নিপীড়ন । কুরআনের ২:১৯৩ নং আয়াতে সন্নিবেশিত 'দাঙ্গা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও অত্যাচার-নিপীড়ন' শব্দ সমষ্টিকে (অন্য আয়াতে 'পীড়ন বা নিষ্ঠুরতা'র কথাও রয়েছে) আরবীতে বলা হয় 'ফিৎনা'। এখানে 'ফিৎনা' প্রতিমা-উপাসনা বা মূর্তি-পূঁজা অর্থে - অর্থাৎ ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে কুরাইশদের প্রতিমা উপাসনায় লেগে থাকাকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু অমুসলিম ও পশ্চিমা পাঠকদের ব্যাপারে সজাগ আধুনিক মুসলিম পণ্ডিতরা 'ফিৎনা'র ইংরেজী তরজমায় এক ধরণের অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন। এসব অস্পষ্ট অনুবাদে প্রভাবিত হয়ে ইসলামের বহু অনারব পণ্ডিত মনে করেন: কেবলমাত্র কতকগুলো কঠোর শর্ত-যেমন দাঙ্গা-বিশৃঙ্খলা, নিপীড়ন অথবা নিষ্ঠুরতা - ইত্যাদির ভিত্তিতে ইসলামে সহিংস জিহাদ বা হত্যা সমর্থিত; নিপীড়ন্তনিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো মহৎ কাজ কে অপছন্দ করে? কিন্তু কুরআনের ভাষায় দাঙ্গা, নিপীড়ন বা নিষ্ঠুরতার সঠিক অর্থ কী তা অনুধাবনের জন্য এ

পরিভাষাগুলোর একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। আরবীতে 'ফিৎনার' ('আল- ফাসাদ'ও) অর্থ হলো মতবিরোধ অথবা একটা দল বা গোত্রের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি, আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গ করা বা অবাধ্যতা দেখানো, অথবা সরকার বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিপ্লব বা যুদ্ধ করা কিংবা ঐরূপ বিষয়। এক্ষেত্রে কুরাইশরা ছিল মক্কার প্রশাসনের কর্তৃত্বকারী আর মুহাম্মদের সমপ্রদায় ভিন্ন মতাবলম্বী বা দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকারী। এ অবস্থায় কেবলমাত্র মুহাম্মদই মক্কায় 'ফিৎনা' সৃষ্টি করতে পারেন, কুরাইশরা নয়। তাহলে এক্ষেত্রে নবী ও আল্লাহ্ কীভাবে কুরাইশদেরকে 'ফিৎনা' সৃষ্টির দোষে দোষী করতে পারেন? এর কারণ হয়তো এই যে: কুরআন সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র আইন ও ন্যায়বিচারের শ্রেষ্ঠ সনদরূপে প্রেরিত, যা তিনি অন্যান্য ধর্মের তথা সমগ্র মানবজাতির উপর কর্তৃত্ব করার জন্য প্রেরণ করেছেন (কুরআন ২:১৯৩, ৮:৩৯)। সুতরাং একে প্রত্যাখ্যান বা ইসলামের বিরোধিতা করা - যেমনটি কুরাইশরা করেছিল মুহাম্মদের ধর্ম প্রত্যাখ্যান ও তাঁর বিরোধিতা করে - তা মুহাম্মদ ও আল্লাহ্‌র বিচারে 'ফিৎনা' সৃষ্টি হিসেবে বিবেচিত হয়। কুরআনের ২:২১৭ নং আয়াতেও আল্লাহ্ 'ফিৎনা'র ঠিক অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে: 'আল্লাহ্‌র পথে আসতে বাধা দেওয়া, তাঁকে অস্বীকার করা, পবিত্র মসজিদে প্রবেশে বাঁধা দেওয়া এবং এর সদস্যদেরকে বিতাড়িত করা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে গুরুতর অপরাধ। ...দাঙ্গা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং নিপীড়ন হত্যার চেয়েও নির্মম।' সুতরাং ইসলাম ধর্মকে কেবলমাত্র প্রত্যাখ্যান করলেই তা আল্লাহ্ ও তাঁর নবীর দৃষ্টিতে 'দাঙ্গা, নিপীড়ন ও নিষ্ঠুরতা ইত্যাদির সমতুল্য এবং 'হত্যার চেয়ে নির্মম' বলে বিবেচিত। পাঠকগণ অবশ্যই মনে রাখবেন যে, পৌত্তলিক কুরাইশদের শুধু এটুকু অপরাধের কারণে নবী মুহাম্মদ চড়াও হয়ে তাদের বিরুদ্ধে সহিংস অভিযান চালিয়েছিলেন, যা নীচে বর্ণিত হয়েছে। তদুপরি কুরাইশ ও অন্যান্য আরব পৌত্তলিকদের সঙ্গে নবী তাঁর আচরণের যে আদর্শ দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, মুসলিমরা আদর্শগতভাবে সর্বকালে বিশ্বের সকল পৌত্তলিক বা প্রতিমা- উপাসকদের প্রতি ঠিক সেরূপ আচরণ প্রয়োগ করবে।

আল্লাহ্ পুনরায় আরেকটি আয়াতে মুসলিমদের সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন সকল অমুসলিমদেরকে ধ্বংস করার জন্য: 'যুদ্ধ অব্যাহত রাখ যতক্ষণ না হৈচৈ- বিশৃঙ্খলা অথবা নিপীড়ন বিলুপ্ত হয় এবং ন্যায়বিচার ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তারা যদি ক্ষান্ত হয়, তারা যা করে আল্লাহ্ সবই দেখেন' (কুরআন ৮:৩৯)। মনে হয় এ আয়াতগুলো মুহাম্মদের অন্ততঃ কিছুসংখ্যক শিষ্যকে সহিংস জিহাদে উদ্বুদ্ধ করতে যথেষ্ট ছিল না। অহিংস ব্যক্তি- চেতনার কারণে তারা কুরাইশ কিংবা অন্য কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে অস্বীকৃতি জানায়। অতঃপর আল্লাহ্ নতুন এক আয়াত পাঠান যা যুদ্ধ বা জিহাদে অংশগ্রহণকে সকল মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক ধর্মীয় বা পবিত্র কর্তব্য হিসেবে ঘোষণা দেয়, সেটা তারা পছন্দ করুক বা না করুক: 'যুদ্ধ তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, অথচ তোমরা তা অপছন্দ কর। কিন্তু এটাও হতে পারে যে, তোমরা এমন কিছু অপছন্দ করছো, যা তোমাদের জন্য মঙ্গলকর। আর তোমরা এমন কিছুকে ভালবাসছো, যা তোমাদের জন্য অমঙ্গলকর। কিন্তু আল্লাহ্ যা জানেন, তোমরা তা জান না' (কুরআন ২:২১৬)।

মনে হয় যে, শুরুতে মুহাম্মদের শিষ্যরা যুদ্ধে লিপ্ত হতে অস্বীকার করেছিল এ যুক্তিতে যে, আল্লাহ্ যুদ্ধের অনুমোদন দেন নি। এরপর যখন স্বর্র্গ থেকে কাঙ্ক্ষিত অনুমোদনটি এল, তখনও কিছু অহিংস ও দুর্বল চিত্তের শান্তিবাদী শিষ্য সহিংস জিহাদে জড়ানোর ব্যাপারে দ্বিধা পোষণ করে। তারা ব্যাপক রক্তপাত ও মৃত্যুর ভয়ে ভীত ছিল। আল্লাহ্ মুহাম্মদের সেসব ভীরু শিষ্যদেরকে উদ্দেশ্য করে আরেকটি নতুন প্রত্যাদেশ পাঠান:'. . . (হে মুহাম্মদ) কিছু বিশ্বাসী বলেছিল: কেন (কুরআনে) একটা অধ্যায় প্রকাশ হয়নি (যুদ্ধের জন্যে)? তারপর যখন একটি চূড়ান্ত অধ্যায় প্রকাশিত হলো যাতে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, তারপরও দেখ যাদের অন্তর রোগাক্রান্ত; তারা তোমার দিকে এমনভাবে তাকায় যেন মৃত্যুর ভয়ে মূর্ছা যাবে; তাদের প্রতি আল্লাহর ধিক্কার!' (কুরআন ৪৭:২০)।

শুরুতে মুহাম্মদের অধিকাংশ শিষ্যই ছিল সমাজের নীচুস্তর থেকে আসা উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির মানুষ। যেহেতু তারা মূলতঃ একটা অহিংস ও শান্তিপূর্ণ সমাজ থেকে আসা, সুতরাং তারা তখনও পর্যন্ত সহিংস জিহাদে অংশগ্রহণের ব্যাপারে ছিল নৈতিকভাবে দ্বিধান্বিত, কেননা তাতে নির্দোষ মানুষ মারা যেতে পারে। এবং বদর যুদ্ধে যখন সত্যি সত্যি অনেক মক্কাবাসী মারা যায় (নীচে দেখুন), তখন তাদের সে দ্বিধা প্রকট হয়ে উঠে। এমতাবস্থায় আল্লাহ মুহাম্মদের অনুসারীদের মনের এ নৈতিক দ্বিধা দূর করতে জিহাদী কর্মকাণ্ডে ঘটিত হত্যাকাণ্ডের দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন একটি নতুন আয়াত পাঠানোর মাধ্যমে: 'অতএব তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহ স্বয়ং তাদেরকে হত্যা করেছেন। এবং তোমরা যখন (শত্রুকে) আঘাত করেছো, তোমরা তা করনি, স্বয়ং আল্লাহ তা করেছেন। এবং আল্লাহ বিশ্বাসীগণকে তাঁর উৎকৃষ্ট পুরস্কার দেবেন। আল্লাহ অবশ্যই সব শোনেন ও জানেন।' (কুরআন ৮:১৭)।

আরও দেখা যায় যে, মুহাম্মদের মক্কাবাসী কিছু শিষ্য কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বা শত্রুতা দেখাতে বিশেষ অনীহা প্রকাশ করেছিল, কারণ কুরাইশরা ছিল মোটের উপর তাদেরই পারিবারিক সদস্য, আত্মীয় ও গোত্রের লোক। তাদেরকে বুঝানোর জন্য আল্লাহ নতুন আয়াত নাজীল করেন, যাতে তিনি মুসলিমদের অবিশ্বাসী আত্মীয়-স্বজনকে শত্রু আখ্যা দিয়ে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে উৎসাহিত করেন। যেমন আল্লাহ বলেন: 'হে বিশ্বাসীগণ! নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাদের প্রতি সাবধান হও...' (কুরআন ৬৪:১৪)।

অনুমান করা যায় যে, এরপর জিহাদী যুদ্ধের আয়োজন করতে যখন অর্থ-সামগ্রীর প্রয়োজন হলো, আল্লাহ তখন সুদে-আসলে পুষিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুসলিমদেরকে তাদের সমস্ত শক্তি ও সম্পদ জিহাদে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করেন। আল্লাহ বলেন: 'তোমাদের সামর্থ্যে যতটা পার যুদ্ধাস্ত্র ও ঘোড়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখ, যাতে তোমরা আতঙ্কিত করতে পার আল্লাহ ও তোমাদের শত্রু এবং অচেনা পিছুকারীদেরকে। তোমরা আল্লাহর পথে যা ব্যয় করবে, তা সম্পূর্ণ

পরিশোধ করে দেওয়া হবে, এবং তোমরা কোনক্রমেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না' (কুরআন ৮:৬০)।
বুঝা যায় যে, কেবলমাত্র পুরোপুরি ফেরৎ পাওয়ার আশায় মুহাম্মদের শিষ্যরা তাদের ধনসম্পদ ও সঙ্গতি জিহাদে বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক ছিল না। আল্লাহ অতঃপর অন্যান্য পুরস্কারের সাথে তাদের সম্পদ বহুগুণে বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেন এভাবে:'. . . কী কারণে তোমরা আল্লাহর জন্য ব্যয় করছো না? . . . যে আল্লাহকে ঋণ দেবে, তা হবে চমৎকার ঋণ। কেননা আল্লাহ উদারহস্তে অন্যান্য পুরস্কারসহ তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেবেন' (কুরআন ৫৭:১০- ১১)।
এরপরও নবীর কিছু অনুসারী তাদের সঙ্গতি বা সম্বল আল্লাহর জন্য জিহাদে ব্যয় করার ঝুঁকি নিতে অনিচ্ছুক ছিল বলে মনে হয়। তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ সতর্কবাণী পাঠান এভাবে: 'ভেবে দেখ, তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হয়েছে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কৃপণ স্বভাবের। কিন্তু যারা কৃপণতা করছে, তারা কেবল তাদের আত্মাকে বিসর্জন দিচ্ছে' (কুরআন ৪৭:৩৮)।
এ আয়াতগুলো ছিল মুসলিমদেরকে মক্কার কুরাইশদের বিরুদ্ধে জিহাদ বা সহিংস ধর্মযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে আল্লাহর মিনতি বা অনুমতি। এ স্বর্গীয় অনুমোদন বা স্বীকৃতি পেয়ে মুহাম্মদ মদীনায় স্থানান্তরের মাত্র আট মাস পর ৬২৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মদীনার কাছাকাছি পথ দিয়ে গমনরত একটি কুরাইশ বাণিজ্য- কাফেলার উপর প্রথম জিহাদী আক্রমণের হুকুম দেন। এ আক্রমণের কারণ ছিল দুটো: কুরাইশদের মালামাল লুণ্ঠন ও হয়রানি করা। কিন্তু আক্রমণটি ব্যর্থ হয়। এর পরবর্তী মাসগুলোতে আরও দুটো আক্রমণের আদেশ দেন তিনি। সে হামলা দুটোর প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। তারপর মদীনায় গমনের প্রায় বার মাস পর মুহাম্মদ নিজে হামলার নেতৃত্ব নেন। পরবর্তী কয়েকমাস তিনি স্বয়ং তিন্তিনটি হামলা পরিচালনা করলেও তা ব্যর্থ হয়।[43]

নাখলায় হামলা

[43]. Muir, p. 225-228

৬২৪ সালের জানুয়ারী মাসে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাস- এর নেতৃত্বে নবী আট সদস্যের এক হামলাকারী দলকে মক্কার এক কাফেলায় হামলা করার জন্য নাখলা নামক একটি স্থানে পাঠান। নাখলার অবস্থান ছিল মদীনা থেকে নয় দিনের এবং মক্কা থেকে মাত্র দুই দিনের পথ। তাদেরকে পাঠানোর সময় নবী আব্দুল্লাহর হাতে একটি চিঠি ধরিয়ে দিয়ে দুই দিনের পথ পাড়ি দেওয়ার আগে না খুলতে নির্দেশ দেন। যথাসময়ে আব্দুল্লাহ চিঠিটি খুলে দেখে যে তাতে লেখা রয়েছে: 'তোমরা যখন আমার এ চিঠি পড়বে, এগিয়ে যেতে থাকবে যতক্ষণ মক্কা ও আল- তা'য়েফের মাঝামাঝি নাখলায় না পৌঁছুবে। সেখানে কুরাইশদের (কাফেলার) জন্য অপেক্ষা করবে।'[44]

আব্দুল্লাহ ও তার দল সে নির্দেশ মান্য করে নাখলায় পৌঁছায়। এটা ছিল ওমরাহ'র (অর্থাৎ কা'বায় গৌণ তীর্থ পালনের) সময়। আগন্তুক কাফেলা যাতে সন্ত্রস- না হয় তার জন্য এক মুসলিম হামলকারী তার মাথা কামিয়ে নেড়া করে নেয়, যাতে কাফেলার কুরাইশরা ধারণা করবে যে এরা ওমরাহ্‌করে ফিরছে। কাফেলাটি নাগালের মধ্যে আসার সাথে সাথে হামলাকারী মুসলিমরা তাদের উপর চড়াও হয়। এ আক্রমণে কাফেলার একজন নিহত হয়, দু'জন হামলাকারীদের হাতে ধৃত হয় এবং আরেকজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তারা কাফেলার প্রচুর মালামাল ও দুই বন্দীকে মদীনায় নিয়ে আসে।

এটা ছিল পবিত্র রজব মাস, বছরের চারটি পবিত্র মাসের মধ্যে একটি এবং প্রচলিত আরব প্রথা অনুযায়ী এ মাসে যুদ্ধ ও রক্তপাত ছিল নিষিদ্ধ। এ সহিংস ঘটনা যুগ যুগ ধরে চলে আসা তাদের এ প্রথাকে ভঙ্গ করায় মদীনার লোকদের মধ্যে, এমন কি মুহাম্মদের কিছু শিষ্যের মাঝেও হতাশা ও হৈচৈ সৃষ্টি করে, যা নবীকে এক অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলে দেয়। প্রথমে তিনি এ অপকর্মের দায়দায়িত্ব সংঘটনকারীদের কাঁধে চাপিয়ে নিজেকে আড়াল করতে চেষ্টা করেন। আবদুল্লাহ ও তার সহযোগী হামলাকারীরা এতে হৃদয়- ভগ্ন হয়ে পড়ে, যা দেখে (পাছে তা ভবিষ্যতে এরূপ হামলার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে অনীহা সৃষ্টি করে) নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে এ নিষিদ্ধ রক্তপাত সমর্থন করে আল্লাহ

[44]. Ibn Ishaq, p. 287; Muir, p. 208-209

এগিয়ে আসেন নবীকে উদ্ধারের জন্যে: 'তারা তোমাকে নিষিদ্ধ মাসে লড়াই সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বলো: এক্ষেত্রে লড়াই করা গুরুতর অপরাধ, কিন্তু আল্লাহর চোখে তার চেয়েও গুরুতর হলো আল্লাহর পথে আসতে বাঁধা দেওয়া, তাঁকে অস্বীকার করা, পবিত্র মসজিদে প্রবেশে বাঁধা দেওয়া এবং তাঁর সদস্যদের বিতাড়িত করা। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও নিপীড়ন হত্যার চেয়েও নিকৃষ্ট। পারলে তারা তোমাকে তোমার বিশ্বাস থেকে না ফেরানো পর্যন্ত যুদ্ধ থামাবে না' (কুরআন ২:২১৭)। আল্লাহ এ আয়াতটির সমাপ্তি টানেন মুসলিমদের মাঝে যারা এ ঘটনায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল এবং মুহাম্মদের ধর্ম ত্যাগ করতে পারত, তাদের প্রতি এ সতর্কবাণী উচ্চারণ করে: '. . . এবং যদি তোমাদের মধ্যে কেউ তাদের বিশ্বাস থেকে ঘুরে দাঁড়ায় ও অবিশ্বাসীরূপে মারা যায়, তাহলে তাদের এ জীবন ও পরকাল নিষ্ফল হয়ে যাবে। তারা আগুনের সঙ্গী হয়ে সেখানে বাস করবে' (কুরআন ২:২১৭)। এ নির্দেশের মাধ্যমে ইসলামে কুরাইশ ও যে কোন প্রত্যক্ষ শত্রুর বিরুদ্ধে যে কোন সময়, যে কোন স্থানে, যে কোন কারণে যুদ্ধ বা হত্যাকাণ্ড স্বর্গীয়ভাবে ন্যায়সঙ্গত হয়। নবী আবদুল্লাহকে 'আমীর-উল-মুমেনিন' বা 'বিশ্বাসীদের সেনাপতি' উপাধিতে সম্মানিত করেন।

এটা বিবেচনায় আনা দরকার যে, এ সার্থক হামলা ও লুণ্ঠনের আগে মুহাম্মদের সমপ্রদায় প্রচণ্ড অর্থ-কষ্টে ভুগছিল। সুতরাং রক্তঝরা এ সফল হামলা মুহাম্মদের সমপ্রদায় ও তাঁর ধর্ম প্রচারে একটা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে; কেননা এ হামলা তাদেরকে প্রচুর লুটের মালামাল এনে দেয় তাদের অভাব ও দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য। আল্লাহ মুসলিমদের লুণ্ঠনের মালামাল স্বর্গীয়ভাবে আইনসঙ্গত বা বৈধ করে দেন এক আয়াত নাজীল করে: 'এখন তোমরা যা জয় করেছো তা বৈধ ও যথার্থ হিসেবে ভোগ কর এবং আল্লাহর প্রতি কর্তব্য অব্যাহত রাখ' (কুরআন ৮:৬৯)। যুদ্ধে লুণ্ঠিত ও আটক মালামাল বণ্টনের ব্যাপারেও আল্লাহ আয়াত পাঠান (কুরআন ৮:৪১)। সে মোতাবেক নবী তাঁর নিজের হিস্যা হিসেবে পাঁচ ভাগের এক ভাগ রাখেন; অবশিষ্ট শিষ্যদের মাঝে বণ্টন করে দেন। দু'বন্দীর মুক্তিপণ হিসেবে আরও অর্থ

আসে।[45] এ ঘটনা থেকে শুরু হয় অমুসলিম কাফেলা বা সমপ্রদায়ের ধনসম্পদ লুণ্ঠন মুহাম্মদের সমপ্রদায়ের জীবনযাপনের উৎসরূপে গ্রহণ।

সুবিখ্যাত বদরের যুদ্ধ

পরবর্তীতে মুহাম্মদের নবুয়তী মিশনের সবচেয়ে বিখ্যাত ও গুরুত্বপূর্ণ জিহাদী হামলার সুযোগ আসে এর দুই মাস পর ৬২৪ সালের মার্চ মাসে। মক্কার নেতা আবু সূফীয়ানের তত্ত্বাবধানে সিরিয়া থেকে ফিরছিল বিপুল মালামালসহ কুরাইশদের এক বিশাল কাফেলা। নবী এ কাফেলাটি লুণ্ঠনের সিদ্ধান্ত নেন। ইবনে ইসহাক উল্লেখ করেন যে, নবী যখন শুনতে পেলেন আবু সূফীয়ান সিরিয়া থেকে ফিরছেন, তখন তিনি মুসলিমদের ডেকে বললেন: 'একটি কুরাইশ কাফেলা মালামাল নিয়ে ফিরছে। তাদের আক্রমণ করতে চলো। সম্ভবত ঈশ্বর এগুলো শিকার হিসেবে তোমাদেরকে দিবেন।' তাঁর ডাকে জনগণের কেউ উৎসাহে আবার কেউ উদাসীনভাবে সাড়া দেয়, [46] কারণ তারা ভাবতে পারেনি যে নবী (আবারও) যুদ্ধে যাবেন।' [47] আবু সূফীয়ানের কাছে মুহাম্মদের আক্রমণের পরিকল্পনার খবর পৌঁছে যায়। তিনি এক বার্তাবাহককে মক্কায় পাঠিয়ে দেন কাফেলাটি রক্ষার্থে উদ্ধার বাহিনী পাঠানোর জন্য। ইতিমধ্যে আবু সূফীয়ান মুহাম্মদের বাহিনীকে এড়ানোর জন্য গমনপথ পরিবর্তন করে লোহিত সাগরের তীর বরাবর দ্রুত অগ্রসর হয়ে নিরাপদে মক্কায় পৌঁছে যায়। কিন্তু কাফেলাটিকে রক্ষা ও মুহাম্মদের লুণ্ঠনকারী দলকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে একটা উদ্ধার দল মক্কা ত্যাগ করেছিল। মুহাম্মদ কাফেলাটিকে হঠাৎ আক্রমণ করার জন্য বদর নামক একটি জলপূর্ণ মরুদ্যানের নিকট ওঁৎ পেতে থাকেন। সেখানে অবস্থান নিয়ে নিজস্ব লোকদের জন্য তাঁবুর কাছাকাছি ব্যবহার উপযোগী একটি পানির কূপ রেখে বাকী কূপগুলো বালি-ভর্তি করে নষ্ট করে ফেলেন। তিনি জানতেন না যে আবু সূফীয়ান ইতিমধ্যে কাফেলা নিয়ে পালিয়ে গেছে।

---

[45]. Ibn Ishaq, p. 286-88

[46]. It becomes obvious that even at this time, more than a year after Jihad or holy war was sanctioneed by Allah, many followers of muhammad were still reluctant to engage in violence.

[47]. Ibn Ishaq, p.289

তিনি মক্কার উদ্ধার বাহিনীর আগমনের ধ্বনি শুনে মনে করেন যে আবু সূফীয়ানের কাফেলাই আসছে।

রমজান মাসের ১৭ তারিখে মক্কার বাহিনী যখন বদরে পৌঁছে, উত্তপ্ত মরুভূমিতে বেশ কয়েকদিনের কষ্টকর ভ্রমণে তারা ছিল ভীষণ ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত। কিন্তু মুহাম্মদ সব কূপ ধ্বংস করায় তাদের তৃষ্ণা মেটাবার কোন পথ ছিল না। মক্কার পক্ষে যোদ্ধা ছিল মোট ৭শ' (কারো কারো মতে এক হাজার); মুহাম্মদের সাথে ছিল মাত্র ৩৫০ জন আক্রমণকারী। পরদিন খুব ভোরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হয়। সংখ্যাগত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তৃষ্ণাকাতর মক্কার সেনারা দ্রুত নিহত হতে থাকে ও একপর্যায়ে তারা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পিছুপদ হতে বাধ্য হয়। তাদের ৫০ জন প্রাণ হারায় ও সমসংখ্যক বন্দী হয়। নবীর দল মাত্র ১৫ জন যোদ্ধা হারায়। কয়েকজন বন্দীকে নবীর নির্দেশে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।[48]

বদর যুদ্ধের অসাধারণ সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে নবী অবিলম্বে মদীনার বানু কায়নুকা নামক ইহুদী গোত্রকে আক্রমণ ও নির্বাসিত করেন (নিম্নে বর্ণিত)।

সর্বনাশা ওহুদের যুদ্ধ

বদর যুদ্ধের অবিশ্বাস্য বিজয় মুহাম্মদ ও তাঁর সমপ্রদায়ের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস চাঙ্গা করে তোলে। তাদের মনে বিশ্বাস জন্মে যে, ঈশ্বর তাদের পক্ষে শামিল হয়ে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদেরকে জয়ী হতে সাহায্য করছেন। আল্লাহ নিজেও এক আয়াত নাজীলের মাধ্যমে নিশ্চয়তা দেন যে, বাস্তবিকই তিনি ফেরেশতা বা স্বর্গীয় দূত পাঠিয়ে মুসলিমদেরকে যুদ্ধে সাহায্য করছেন যাতে করে ২০ জন শক্তিশালী মুসলিম যোদ্ধা ২০০ প্রতিপক্ষ যোদ্ধাকে বিনাশ করতে পারে (কুরআন ৮:৬৬)। মুহাম্মদ শীঘ্রই মক্কার আরও তিনটি কাফেলার উপর হামলা চালিয়ে বহু ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন।

এ অবস্থায় মুহাম্মদের প্রতি মক্কার কুরাইশরা স্বভাবতই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। তাদের জীবনধারণের প্রধান উপায় বাণিজ্য-কর্ম অনেকটা অসম্ভব করে তোলায় শেষ পর্যন্ত তারা মুহাম্মদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক প্রতিকার গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। ৬২৫ সালের ২৩'শে মার্চ আবু

---

[48]. Ibd, p. 289-314; Walker, p. 119-20

সূফীয়ানের সেনাধ্যক্ষে মক্কার ৩,০০০ লোকের এক যোদ্ধাবাহিনী মদীনার নিকটবর্তী ওহুদ নামক স্থানে মুহাম্মদের নেতৃত্বাধীন ৭০০ মুসলিম যোদ্ধার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সংখ্যার দিক দিয়ে দুর্বল মুসলিম বাহিনী অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ভেঙ্গে পড়ে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ যুদ্ধে মুহাম্মদ পাথরের আঘাতে একটা দাঁত হারান ও অজ্ঞান হয়ে পড়েন। মুসলিমরা ৭৪ জন যোদ্ধাকে হারায়; মক্কার পক্ষে নিহত হয় মাত্র ১৯ জন।

আগে আল্লাহ ও মুহাম্মদ যেহেতু নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন ফেরেশতাদের সহায়তায় ২০ জন মুসলিম যোদ্ধা প্রতিপক্ষের ২০০ যোদ্ধাকে বিনাশ করবে, এ সর্বনাশা যুদ্ধে ব্যাপক জীবনহানি তাঁর শিষ্যদের মাঝেও তাঁর নবুয়তীর দাবীর সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহের জন্ম দেয়। এমন কি তাঁর বিরুদ্ধে একটা বিদ্বেষ বা শত্রুভাবও সৃষ্টি হয়। বিরোধীরাও, বিশেষ করে ইহুদীরা ও ইসলামের সুবিখ্যাত মোনাফেক আব্দুল্লাহ ইবনে ওবাই (নিম্নে দেখুন, কেন সে মোনাফেক ছিল), মুহাম্মদকে অপদস্ত করতে এ ঘটনাকে ব্যবহার করে তাঁর নবুয়তীর ব্যাপারে সন্দেহ ছড়ায়। স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ তাঁকে উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসেন আবারো। আল্লাহ ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলো আয়াত নাজীল করেন তাঁর নবুয়তীর ব্যাপারে সন্দেহ ও বিদ্বেষ দূর করতে (কুরআন ৩:১২০-২০০)। আল্লাহ ফেরেশ্তা পাঠিয়ে প্রতিপক্ষকে বিনাশে মুসলিমদের সহায়তার যে অঙ্গীকার করেছিলেন, সে বিষয়ে অভিযোগের ব্যাপারে তাদের দৃঢ়তা ও ধৈর্যের অভাবের কারণে এ ভরাডুবি হয়েছে বলে সমস্ত দোষ আল্লাহ মুহাম্মদের শিষ্যদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। আল্লাহ প্রত্যাদেশ পাঠান: (হে মুহাম্মদ) তুমি বিশ্বাসীদের বলেছিলে: এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে আল্লাহ তিন হাজার ফেরেশতা (বিশেষভাবে) পাঠিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন? হ্যাঁ, যদি তোমরা দৃঢ় থাকতে ও সঠিক কাজটি করতে (অর্থাৎ পিছুপদ না হতে), তখন শত্রুরা দ্রুতবেগে তোমাদের উপর চড়াও হলেও, তোমাদের প্রভু তোমাদের সাহায্যার্থে পাঁচ হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে ভয়ঙ্কর হত্যাযজ্ঞ ঘটাত' (কুরআন ৩:২২৪-২৫)।

আল্লাহ দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, তিনি সত্যি সত্যিই এর আগে বদরের যুদ্ধে মুসলিমদেরকে সাহায্য করেছিলেন, যখন তারা পরাজয়ের

আশঙ্কা করছিল; আর সেজন্যে তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আল্লাহ বলেন: 'মনে রেখো, তোমাদের মধ্যে দুটো দল বদরের যুদ্ধে কাপুরুষতা পোষণ করছিল। কিন্তু আল্লাহ সেখানে তাদের রক্ষক হিসেবে কাজ করেন; কাজেই বিশ্বাসীদের (সর্বদা) আল্লাহর উপর আস্থা রাখা উচিত। আল্লাহ তোমাদেরকে বদরের যুদ্ধে সাহায্য করেছেন, যেখানে তোমরা ছিলে (তুলনামূলকভাবে) হতভাগা নগণ্য শক্তি। অতএব আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে পারো' (কুরআন ৩:১২২-২৩)। মুহাম্মদের নির্দেশ না মানায় ওহুদের যুদ্ধে পরাজয় হয়, এ দোষে মুসলিম যোদ্ধাদেরকে দোষী করে আল্লাহ বলেন: 'তোমরা পাহাড়ে উঠছিলে সবকিছু উপেক্ষা করে, যদিও তোমাদের পিছন থেকে নবী তোমাদেরকে ডাকছিলেন (যুদ্ধ চালিয়ে যেতে)। সুতরাং তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে শোক দেন তাঁর (নবীর) শোকের জন্যে। (হয়তোবা তোমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য) যাতে করে তোমরা যা থেকে বঞ্চিত হয়েছো অথবা যা (নির্মমতা) তোমাদের উপর পতিত হলো, তার জন্য বিমর্ষ না হও' (কুরআন ৩:১৫৩)।

আল্লাহ পূর্ববর্তী নবী ও তাদের শিষ্যদের উদাহরণ উপস্থাপন করেন, যারা আল্লাহর পথে কখনও দুর্বলতা প্রদর্শন না করে দৃঢ়চিত্তে যুদ্ধ করে গেছেন। তিনি মুহাম্মদের অনুসারীদেরকেও সেরূপ করার জন্য আহ্বান জানান এভাবে: 'কত নবী ও তাদের অসংখ্য ঈশ্বরভক্ত শিষ্য আল্লাহর পথে লড়াই করে গেছেন। কিন্তু তারা আল্লাহর পথে লড়াইয়ে ভীষণ সর্বনাশের মুখে পড়লেও কখনোই সাহস হারাননি, না দেখিয়েছেন দুর্বলতা কিংবা মেনেছেন হার। আল্লাহ দৃঢ়চিত্ত ও সাহসীদের ভালোবাসেন' (কুরআন ৩:১৪৬)।

ওহুদের যুদ্ধে যারা প্রাণ হারিয়েছিল আল্লাহ তাদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের উদ্দেশ্য করে একটা প্রত্যাদেশ পাঠান সান্ত্বনা দিতে যে, বাস্তবে তারা মরেনি, মৃত্যুর ভাবাবেশে আছে মাত্র এবং তারা স্বর্গে গমন করে সেখানে আনন্দ করছে। আল্লাহ বলেন: 'যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত বলো না। না, তারা তাদের প্রভুর পাশে চিরস্থায়ী হয়ে বেঁচে আছে। তারা আল্লাহর অসীম কৃপার মধ্যে আনন্দ

করছে। যারা পিছনে পড়ে আছে ও যারা এখনও তাদের সাথে (স্বর্গসুখে) যোগ দেয়নি, তাদের জন্যও রয়েছে (শহীদের) গৌরব; তাদের কোন ভয় নেই বা আফসোস করারও কিছু নেই' (কুরআন ৩:১৬৯- ৭০)।

যাহোক, ওহুদের যুদ্ধের পাঁচ মাস পর ৬২৫ সালের আগষ্ট মাসে মুহাম্মদ মদীনার বানু নাদের নামক ইহুদী গোত্রের উপর আক্রমণ করে তাদেরকে নির্বাসনে পাঠান (নিম্নে বর্ণিত)।

কিন্তু সর্বনাশা ওহুদের যুদ্ধে কুরাইশদের দ্বারা মুহাম্মদ বড় রকমের একটা শিক্ষা পেয়ে মক্কার কাফেলার উপর হামলা কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখেন। কুরাইশরা ওহুদের যুদ্ধে এ বড় বিজয়ের পর মুহাম্মদকে পুনরায় আক্রমণ করতে আসে নি। মুহাম্মদ যেহেতু তাদের বাণিজ্য-কাফেলার উপর হামলা বন্ধ করে রাখে, সে কারণে তারা সম্ভবত ভেবেছিল যে সে বড় শিক্ষা পেয়েছে এবং তাদের জন্য আর হুমকি হয়ে দাঁড়াবে না। ইতিমধ্যে মুহাম্মদ তাঁর ধর্মান্তরিত শিষ্য সংখ্যা ও বস' গত সামর্থ্য বৃদ্ধি করে (বানু কায়নুকা ও বানু নাদের ইহুদী গোত্রের কাছ থেকে হস্তগত ধনসম্পদ দ্বারা) তাঁর ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সময় নেন। প্রায় এক বছর বিরতির পর ৬২৬ সালের এপ্রিল মাসে তিনি আবার মক্কার কাফেলার উপর আক্রমণ শুরু করেন। মালামালপূর্ণ কাফেলার উপর ক্রমবর্ধমান হারে সফল হামলায় লুণ্ঠিত ধনসম্পদ, উট ও দাস ইত্যাদির মালিক হয়ে মুসলিমরা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠে। এ সময় মুহাম্মদ তাঁর লুণ্ঠনকারী দলকে আরো শক্তিশালী করার জন্য নিকটবর্তী অমুসলিম গোত্রগুলোকে তাঁর হামলায় যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। কিছু অমুসলিম গোত্র তাঁর লুণ্ঠন দলে যোগ দেয়, সম্ভবত দুটো কারণে: ১) লুণ্ঠনের মালামালের প্রতি লোভ, ২) মুহাম্মদের হামলা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা। ইতিমধ্যে নবী মদীনার দুটো শক্তিশালী ইহুদী গোত্রকে আক্রমণ করে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন, যা স্পষ্ট করে তুলে যে তাঁর ডাকে সাড়া না দিলে সেসব অমুসলিম গোত্রগুলো মুহাম্মদের তরফ থেকে সত্যি সত্যি বিপদের মুখে পড়তে পারত।

খন্দক- এর যুদ্ধ

মক্কার কাফেলার উপর পুনরায় আক্রমণ শুরু করার অর্থ দাঁড়ায় যে, কুরাইশদের উপর মুহাম্মদের হুমকী তখনও শেষ হয় নি। অতএব আবু

সূফীয়ান মুহাম্মদের হুমকী চিরতরে শেষ করার জন্য ৬২৭ সালের এপ্রিল মাসে আরো একটা পাল্টা আক্রমণের প্রস' তি নেন। তিনি প্রতিবেশী গোষ্ঠীগুলোকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানালে বানু ঘাতাফান, বানু সুলেম ও বানু আসাদসহ অনেকগুলো গোত্র - যারা মুহাম্মদের আক্রমণে ইতিমধ্যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল - আবু সূফীয়ানের ডাকে সাড়া দেয়। আবু সূফীয়ানের পিছনে প্রায় ১০, ০০০ যোদ্ধার (কারো কারো মতে ৭, ০০০) এক বিশাল বাহিনী সমবেত হয়। সে সময় মুহাম্মদ বড়জোর ৩, ০০০ যোদ্ধা সমেবেত করতে পারতেন। সুতরাং তাঁর সমপ্রদায়ের পরিসি' তি খুবই সঙ্গীণ হয়ে উঠে।

ভাগ্যক্রমে নবী ইতিমধ্যে সালমান নামে খ্যাত পারস্যের এক শিষ্য পেয়েছিলেন, যিনি তাঁকে মদীনায় মুসলিম সম্প্রদায়ের বাসস্থানের চতুর্দিকে খন্দক বা পরিখা খননের পরামর্শ দেন। শত্রুর আক্রমণ থেকে প্রতিরক্ষার জন্যে পরিখা খনন ছিল পারস্যে একটা প্রচলিত রণ-কৌশল, যা আরবরা জানতো না। মুহাম্মদ ধারণাটা লুফে নিয়ে তাঁর সমপ্রদায়ের বাসস্থানের চতুর্দিকে একটি গভীর খন্দক খননের নির্দেশ দেন। সব মুসলিমকে খন্দকের ভিতরে একত্রিত করে বাড়ীঘরের বাইরের দেয়াল পাথর দ্বারা শক্ত করা হয়। আক্রমণকারী কুরাইশরা মুসলিমদের বাসস্থানের চারিদিকে অবরোধ আরোপ করে। কিন্তু মুহাম্মদের এ কৌশল তাদের কাছে অপরিচিত হওয়ায় তারা খন্দকটি পার হতে ব্যর্থ হয়। প্রায় ২০ দিনব্যাপী অবরোধের (কেউ কেউ বলেন প্রায় এক মাস) পর মক্কা বাহিনী অবরোধ তুলে নেয়। অবরোধকালে তেমন কোন যুদ্ধ হয়নি; এতে মুহাম্মদের পক্ষের মাত্র পাঁচজন ও মক্কার পক্ষের তিনজনের প্রাণহানি ঘটে।

সালমান ছিলেন জরথুষ্ট্রবাদ (অগ্নি- উপাসনা) থেকে ধর্মান্তরিত একজন খ্রীষ্টান যিনি পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। সালমানের পরামর্শে এ যাত্রা রক্ষা পাওয়ায় তার সমপ্রদায় বা দেশবাসীর প্রতি মুহাম্মদ পরম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতঃ তাদের জ্ঞানের গভীরতারও প্রশংসা করেন।[49]

কুরাইশরা অবরোধ তুলে নেয়ার পরপরই মুহাম্মদ মদীনার সর্বশেষ ইহুদী গোত্র বানু কুরাইজা'কে আক্রমণ করেন কুরাইশদেরকে সহযোগিতা করার অভিযোগে। বানু কুরাইশরা আত্মসমর্পণ করলে নবী

---

[49]. Ibid, p. 121-22; Ibn Ishaq, p. 456-61; Muir, p. 306-14.

তাদের পুরুষদের সবাইকে হত্যা করেন, এবং নারী ও শিশুদেরকে দাস হিসেবে কব্জা করেন (নিম্নে বর্ণিত হয়েছে)।

মক্কা বিজয় ও কা'বা দখল

৬২৮ সালের মধ্যে মুহাম্মদ মদীনার সব শক্তিশালী ইহুদী গোত্রকে উচ্ছেদ বা নিশ্চিহ্ন করেন। আশপাশের অনেক গোত্রকেও হুমকী অথবা আক্রমণের দ্বারা আনুগত্য প্রকাশে বাধ্য করেন। তিনি তখন পৈতৃক শহর মক্কা ও সেখানে অবসি' ত কা'বা দখলের জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। নবুয়তী মিশনের শুরু থেকেই তিনি কা'বার উপর দাবী পেশ করে এসেছেন। তদুপরি বছরের পর বছর মদীনায় মুসলিমরা প্রতিবার নামাজের সময় কা'বার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছে। কাজেই কা'বা তাঁর ধর্র্মীয় মিশনের পবিত্রতম প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং এর দখল ছিল তাঁর জন্য বৃহত্তম পুরস্কার। কা'বার একটা বড় অর্থনৈতিক গুরুত্বও ছিল (যেমনটা আজকে সৌদীদের জন্য), কারণ ওমরাহ্‌ও হজ্জ্ব- এর তীর্থকেন্দ্র হিসেবে আরবদের কাছে এটা ছিল রাজস্ব আয়ের এক লোভনীয় উৎস। অধিকন্তু আল্লাহ ইতিমধ্যে কুরআনে কুরাইশদের বিরুদ্ধে জিহাদী সংগ্রাম ও তাদেরকে পরাজিত করার জন্য যথেষ্ট প্ররোচনা দিয়েছেন। কাজেই মক্কাকে বশীভূত করা মুহাম্মদের নবুয়তী কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

হুদাইবিয়ার সন্ধি: ৬২৮ সালের মার্চ মাসে (অর্র্থাৎ খন্দক যুদ্ধের এক বছর ও মদীনায় স্থানান্তরের ছয় বছর পর) মুহাম্মদ তাঁর পৈতৃক শহর মক্কার দিকে অগ্রসরে সাহসী ও উৎসাহী হয়ে উঠেন। তাঁর অভিযানে যোগ দেওয়ার জন্য আশপাশের গোত্রগুলোকে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু এ ভয়ঙ্কর ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানে তাঁর এ আহ্বানে তেমন সাড়া মেলে নি। ১, ৩০০ থেকে ১, ৫২৫ জন মুসলিম যোদ্ধার এক সশস্ত্র বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে ওমরাহ্'র সময় মুহাম্মদ মক্কার দিকে অগ্রসর হন। কুরাইশরা মুহাম্মদের আগমনের খবর জানতে পেয়ে তাঁর মক্কায় প্রবেশ রুখতে শপথ গ্রহণ করে। কেননা মুহাম্মদ ইতিমধ্যে বহুবার তাদের জন্য ভয়াবহ রক্তপাত, অবমাননা ও অভাব- অনটন বয়ে এনেছিল। কুরাইশদের এ প্রতিজ্ঞার খবর পেলে নবী সামনে অগ্রসর না হয়ে হুদাইবিয়া নামক স্থানে তাঁবু গাড়েন। তিনি মক্কায় বার্তা পাঠান যে, তিনি কেবল শান্তিপূর্ণভাবে ওম্‌রাহ করতে এসেছেন এবং তা করার পর

মদীনায় ফিরে যাবেন। মুহাম্মদ ওম্‌রাহ্‌ করার ব্যাপারে সংকল্পবদ্ধ ছিলেন আর কুরাইশরাও তাঁর মক্কায় প্রবেশ রুখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। কিন্তু নবীর সাথে সামরিক সংঘর্ষের ফলাফল বিবেচনা করে কুরাইশরা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এড়াতে তাঁর সঙ্গে আপোষের সিদ্ধান্ত নেয়। এ ব্যাপারে আলাপ- আলোচনা ও দরকষাকষির একটা পর্যায়ে মুহাম্মদের জামাতা ও ইসলামের তৃতীয় খলীফা ওসমান মক্কা শিবিরে যান আলোচনার জন্য। ওসমানের সেখান থেকে ফিরতে কিছুটা দেরী হচ্ছিল। ইতিমধ্যে মুহাম্মদের শিবিরে গুজব রটে যে ওসমানকে হত্যা করা হয়েছে। এ রটনায় মুহাম্মদ অনতিবিলম্বে তাঁর বাহিনীকে একটা বাবলা গাছের নীচে সমবেত করে একে একে সবাইকে 'জীবন দিয়ে ওসমানের পাশে দাঁড়ানো'র শপথ করান। এ শপথটি ইসলামের পঞ্জিকায় 'বৃক্ষের শপথ' নামে পরিচিত। মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদেরকে এমন মাত্রায় ধর্মীয় আবেগে উত্তেজিত করেছিলেন যে, তারা তাৎক্ষণিক মক্কার শিবির আক্রমণের জন্য আত্মঘাতী হয়ে উঠেছিল। ঠিক এ মুহূর্তে ওসমান মক্কার শিবির থেকে ফিরে আসে, যা একটা ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয় এড়াতে সহায়ক হয়। ওসমান চুক্তি বা সন্ধির শর্তগুলো চূড়ান্ত করে ফিরেছিলেন, যার ভিত্তিতে দু'পক্ষের মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তিটি ইসলামের ইতিহাসে সুবিখ্যাত 'হুদাইবিয়ার সন্ধি' নামে পরিচিত। এতে উল্লেখ থাকে যে, উভয় পক্ষ দশ বছরের জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে হানাহানি বন্ধ করবে। সন্ধির শর্তমতে মুহাম্মদের দল এবারের জন্য কা'বা দর্শন না করেই মদীনায় ফিরে যাবে, কিন্তু পরবর্তী বছর থেকে তারা প্রতিবছর তিন দিন কা'বায় তীর্থ করতে পারবে।[50]

এখানে উল্লেখ্য যে, মুহাম্মদের এ মক্কা অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল মক্কা দখল, কিন্তু কুরাইশদের মাঝে আপোষহীন প্রতিরোধের দৃঢ়তা দেখে তিনি সুর বদলিয়ে 'শান্তিপূর্ণ ওমরাহ্‌ করতে আসার ধুঁয়া তুলেন। এ বিষয়ে ইবনে ইসহাক লিখেছেন: 'নবীর সঙ্গীরা নিঃসন্দেহে মক্কা দখলের জন্য মদীনা থেকে বের হয়েছিল; কারণ মুহাম্মদ স্বপ্নে দেখেছিলেন সেটাই। কিন্তু যখন তারা দেখলো যে আপোষ- মীমাংসা

[50]. Muir, p. 353-59; Ibn Ishaq, p. 500-05

হচ্ছে ও মুহাম্মদ তা মেনে নিচ্ছেন, তখন তারা এমন হতাশ হয়ে পড়ে যে, যেন মৃত্যুও তার চেয়ে শ্রেয় ছিল।’ [51]

কুরাইশদের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানার প্রত্যাশায় এসে নবী বিনীতভাবে সন্ধি করায় কিছু মুসলিম ক্রোধান্বিত হয়ে উঠে। এর মধ্যে রক্ত- পিপাসু ওমর ছিলেন একজন। যাহোক, মুহাম্মদ তাদের আশ্বস- করতে চান এ মর্মে যে, আল্লাহর নির্দেশে তিনি চুক্তিটি করেছেন, যা তাঁর দলের জন্য শুভ পরিণাম বয়ে আনবে। নবীর শিষ্যদেরকে বুঝানোর জন্য আল্লাহও দায়িত্বপূর্ণ হয়ে গোটা একটা সূরা নাজীল করেন, যা হলো কুরআনের অধ্যায় ৪৮ বা ‘সূরা আল- ফাত’ (‘বিজয়’) । আল্লাহ এতে বলেন যে, পরিসি' তির বিচারে সন্ধিটি ছিল খুবই সঠিক ও বিজয়ের সমতুল্য, এবং চূড়ান্ত বিজয় আসছে অচিরেই।

মুহাম্মদের হুদাইবিয়া চুক্তিভঙ্গ

সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করতে নবীর দল খুব বেশী সময় নেয় নি। আবু বাশির নামক মুহাম্মদের শিষ্য শীঘ্রই জনৈক কুরাইশকে হত্যা করে। এরপর সে প্রায় সত্তর জন মুসলিমকে নিয়ে একটা লুণ্ঠনকারী রাহাজান দল গঠন করে, যা নবী জেনেও না জানার ভান করেন। তারা মক্কার কাফেলাগুলো আক্রমণ করত এবং কাফেলার কাউকে জীবিত রাখতো না। আবু বাশিরের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ইবনে ইসহাক লিখেছেন: ‘অতঃপর আবু বশির বহুদূর চলে যায় সাগর তীরবর্তী ধূল- মারওয়া অঞ্চলের আল ইস নামক স্থানের রাস্তায় না থামা পর্যন্ত। কুরাইশরা সাধারণত এ পথ দিয়েই সিরিয়ায় যাতায়াত করতো। প্রায় সত্তর জন ঐক্যবদ্ধ রাহাজান কাফেলাগুলোর ওপর হানা দিয়ে প্রত্যেককে হত্যা করতো ও তাদের সামনে যারাই পড়তো সবগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতো।’

এ বর্বরতায় অসহায় কুরাইশরা মুহাম্মদ- কর্তৃক হুদাইবিয়া চুক্তির শর্ত মেনে চলার আশাবাদ ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং তাঁর কাছে মিনতি করে যে, তিনি যেন অন্তত ‘আত্মীয়তার সম্পর্কের খাতিরে’ মক্কার কাফেলার উপর হামলা বন্ধ করেন। এ অনুরোধের পর নবী তাঁর হামলাকারী শিষ্যদেরকে মদীনায় ফিরিয়ে নেন। মুহাম্মদের কয়েকজন মহিলা শিষ্য, যাদেরকে স্ব- স্ব পরিবারের লোকেরা আটকে রেখেছিল,

---

[51]. Ibn Ishaq, p. 505

মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় চলে আসে এ সময়। সন্ধির শর্ত মোতাবেক তাদেরকে মক্কায় ফেরৎ পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু কুরাইশরা যখন তাদেরকে ফিরিয়ে নিতে লোক পাঠায়, মুহাম্মদ তাদেরকে ফেরৎ দিতে অস্বীকার করেন।[52]

সন্ধি ছুঁড়ে ফেলে মুহাম্মদের মক্কা আক্রমণ

হুদাইবিয়া সন্ধি স্বাক্ষরের দুই বছর পর মুসলিম বাহিনী কুরাইশদের পরাজিত করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠলে মুহাম্মদ দশ- বছর- মেয়াদী সন্ধিটি ছুঁড়ে ফেলে মক্কা আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করেন। তিনি কুরাইশদের উপর আকস্মিক আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন। যুদ্ধের প্রস্তুতিকালে নবী আল্লাহর কাছে মুনাজাত করতে থাকেন: 'হে আল্লাহ, কুরাইশদের চোখ- কান নষ্ট করে দাও, যাতে করে আমরা আকস্মিকভাবে তাদেরকে তাদের দেশে আক্রমণ করতে পারি।'[53] ৬৩০ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি ১০, ০০০ সৈনিকের একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

অজেয় মুসলিম বাহিনী রাত্রিকালে মক্কার নিকটবর্তী 'মার আল- জাহরান' নামক স্থানে পৌঁছে শিবির স্থাপন করে। রাতের অন্ধকারে প্রত্যেক মুসলিম সেনা মশাল জ্বালিয়ে কুরাইশদের ভীতিগ্রস্ত করতে চায় যে, কী এক বিশাল মুসলিম বাহিনী তাদের দ্বারপ্রান্তে অবস্থান নিয়েছে। কিছুক্ষণ আগে মুসলিম শিবিরে যোগ দেওয়া মুহাম্মদের চাচা আল- আব্বাস এ দৃশ্য দেখে নিজে থেকে বলে উঠেন: 'হায় দুর্ভাগা কুরাইশ! তারা যদি এসে রক্ষা করতে অনুরোধ করার আগেই আল্লাহর নবী তাঁর বাহিনী নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন, তা হবে কুরাইশদের চিরসমাপ্তি।'[54] সামনে অগ্রসর হওয়ার আগে এবার আমরা অনুসন্ধান করে দেখি সত্যিকারভাবে কারা সন্ধিটি ভঙ্গ করেছিল।

সত্যি সত্যি কারা হুদাইবিয়া সন্ধি ভঙ্গ করেছিল? ইসলামী পণ্ডিত ড্যানিয়েল পাইপ্‌স - যিনি ইসলাম সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা দেওয়ার কারণে মুসলিমদের দ্বারা অতিশয় ঘৃণিত - দাবী করেন যে, মুহাম্মদ হুদাইবিয়া চুক্তিটি ভঙ্গ করেন নি, কুরাইশরা করেছিল। তিনি লিখেন: 'মুহাম্মদের জন্য চুক্তিটি ছুঁড়ে ফেলা কৌশলগতভাবে সঠিক ছিল,

---

52. Ibn Ishaq, p. 507-09; Muir, p. 364-65
53. Ibn Ishaq, p. 544
54. Ibid, p. 547

কেননা কুরাইশরা, কিংবা অন্তত তাদের মিত্ররা, প্রকৃতপক্ষে চুক্তিটি ভঙ্গ করেছিল।'[55] চুক্তিটি ভাঙ্গনের ব্যাপারে তিনি মুসলিমদের ধারণার সাথে একমত যে, মক্কাবাসীরাই চুক্তিটি ভঙ্গ করেছিল।[56] কুরাইশ-কর্তৃক হুদাইবিয়া চুক্তিভঙ্গের এ অভিযোগ বা দাবী তৃতীয় পক্ষের দুই গোত্রের মধ্যে চলমান বিবাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। গোত্র দু'টি হলো বানু বকর ও বানু খুজা'য়া। বানু বকর কুরাইশদের ও বানু খুজা'য়া মুহাম্মদের মিত্র ছিল। আল তাবারী জানায়, মুহাম্মদ দৃশ্যপটে আসার আগেই মালিক বিন আব্বাস নামক বানু বকর গোত্রের এক বণিক ব্যবসার উদ্দেশ্যে মরুপথে গমনকালে বানু খুজা'য়াদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। তারা তাকে হত্যা করে মালামাল নিয়ে নেয়। এর প্রতিশোধ নিতে বানু বকর বানু খুজা'য়ার একজনকে হত্যা করে। এরপর মুহাম্মদ দৃশ্যপটে আসেন এবং বানু খুজা'য়া তাঁর মাওলা বা মিত্রতে পরিণত হয়। বিরোধটির দ্বিতীয় পর্যায়ের আক্রমণে বানু খুজা'য়া বানু বকরের নেতৃসস্থানীয় তিন ভাই সালমা, কুলথুম ও ধুয়াইবকে হত্যা করে। এর প্রতিশোধে বানু বকর মুনাবী্ব নামক বানু খুজা'য়ার একজনকে হত্যা করে। রাতের অন্ধকারে কয়েকজন কুরাইশও নাকি এ হত্যাকাণ্ডে বানু বকরকে সহযোগিতা করেছিল।[57] এ ঘটনার প্রেক্ষাপটে, পাইপ্সের মতো পণ্ডিতদের মতে, কুরাইশরা হুদাইবিয়া সন্ধি ভঙ্গ করেছিল; সুতরাং চুক্তিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই মুহাম্মদের মক্কা আক্রমণ বৈধ ছিল। এখানে যে বিষয়টি অবজ্ঞা করা হয়েছে তা হলো, বকর-খুজা'য়া গোত্রদ্বয়ের মধ্যে বিবাদটি বাঁধিয়েছিল খুজা'য়া গোত্র। খুজা'য়ারা বানু বকরকে দুইবার আক্রমণ করে চারজনকে হত্যা করে। বানু বকরও বানু খুজা'য়াকে দুইবার আক্রমণ করে, কিন্তু প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মাত্র, উস্কানিমূলকভাবে নয়। এবং বানু বকর তাদের দ্বিতীয় আক্রমণের পরও তারা বানু খুজা'য়ার মাত্র দুইজনকে হত্যা করে। অর্থাৎ মুহাম্মদের মিত্ররা অতিরিক্ত দুজনকে হত্যা করেছিল। আরেকটি বিষয় অবজ্ঞা করা হয়েছে যে, দুবছর আগে নবীর মক্কা দখলের বা কা'বায় প্রবেশের প্রচেষ্টা - যার ফলে হুদাইবিয়া চুক্তিটি

---

55. Pipes (2003), p. 185
56. The Taking of Makkah, Ministry of Hajj (Saudi Arabia), http:// www.hajinformation. com/main/b2109.htm
57. Al-Tabari, Vol. VI, p. 160-62

স্বাক্ষরিত হয় - তার কোনই অধিকার ছিল না। আর এক্ষেত্রে পাইপ্‌স সম্পূর্ণরূপে আরও বিস্মৃত হয়েছেন যে, মুহাম্মদ প্রথম সুযোগেই ও অনেক আগেই সন্ধির শর্ত ভেঙ্গে ছিলেন, যেমন বারংবার কুরাইশদের বাণিজ্য- কাফেলা আক্রমণ, লুণ্ঠন ও বেশ কিছু কুরাইশকে হত্যা করে। আর এটা কিছুতেই বোধগম্য নয় যে, তাঁর মিত্র বানু খুজা'য়ার পক্ষে প্রতিশোধ নিতে বানু বকরকে আক্রমণ না করে মুহাম্মদ কুরাইশদেরকে আক্রমণ করলেন কেন? মুহাম্মদ বড়- জোর বানু বকরের বিরুদ্ধে বানু খুজা'য়ার আক্রমণে সাহায্যার্থে আসতে পারতেন, কিন্তু কোনো যুক্তিতেই নিজে মক্কা দখলের চেষ্টা করতে পারতেন না।

এবার মুহাম্মদের মক্কা আক্রমণের ঘটনায় ফিরে আসা যাক। কুরাইশ নেতা আবু সূফীয়ান ছিলেন নবীর শ্বশুরদের মধ্যে একজন। তিনি মুসলিমদের আগমনের খবর শুনে রাতের অন্ধকারে মুহাম্মদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন তাঁকে বুঝিয়ে- সুঝিয়ে মক্কা আক্রমণ থেকে বিরত করার আশায়। পথিমধ্যে ভাই আল আব্বাসের সঙ্গে আবু সূফীয়ানের দেখা হয়ে যায়। আল আব্বাস তাকে রক্ষার নিশ্চয়তা দিয়ে মুহাম্মদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য নিয়ে যান। সামনে ওমর আল খাত্তাব (পরে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা) তাদের রাস্তায় এসে পড়ে। আবু সূফীয়ানকে সে দেখে হুঙ্কার দিয়ে উঠে: আবু সূফীয়ান, ঈশ্বরের শত্রু! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যিনি কোন চুক্তি ছাড়াই তোমাকে এখানে এনেছেন।" অতঃপর 'আমি তার মাথা বিচ্ছিন্ন করবো' - এই বলে ওমর তলোয়ার আনতে দৌঁড় মারে।[58]

আল আব্বাস আবু সূফীয়ানকে দেওয়া রক্ষার প্রতিশ্রুতির কথা বলে ওমরকে মারাত্মক কিছু করা থেকে নিবৃত্ত করেন এবং মুহাম্মদের সমীপে তাকে হাজির করেন। নবী আবু সূফীয়ানকে পরদিন সকালে তাঁর সামনে হাজির করার নির্দেশ দেন। পরদিন সকালে আবু সূফীয়ানকে নবীর কাছে আনলে তিনি বলেন: 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ বা ঈশ্বর নাই, তা স্বীকার করার এটাই কি মোক্ষম সময় নয়?' মুহাম্মদ যে স্রষ্টার একজন নবী, এ কথা আবু সূফীয়ান কখনোই বিশ্বাস করেন নি। যখন তিনি ইতস্ততঃ করছিলেন, ক্রোধান্বিত মুহাম্মদ

---

[58]. Ibn Ishaq, p. 547

চিৎকার করে বলেন: ‘অভিশাপ তোমাকে আবু সূফীয়ান! আমিই ঈশ্বরের প্রেরিত নবী; তা স্বীকার করার এটাই কি মোক্ষম সময় নয়?’ এ কথায় আবু সূফীয়ান উত্তর দেন: ‘এ ব্যাপারে এখনও আমার কিছু সন্দেহ রয়েছে।’ আবু সূফীয়ানের জীবন সমূহ বিপন্ন দেখে আল আব্বাস এগিয়ে এসে জোরের সঙ্গে আবু সূফীয়ানকে বলেন: ‘শির হারাবার আগে শীঘ্রই আনুগত্য স্বীকার করো এবং বলো যে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই ও মুহাম্মদ আল্লাহর নবী।’ আবু সূফীয়ানের তা মেনে নেয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। এরপর আল আব্বাস আবু সূফীয়ানের লোকদের জন্য কিছু করার নিমিত্তে মুহাম্মদকে অনুরোধ করেন। নবী তখন বলেন: আবু সূফীয়ানের বাড়ীতে যে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ এবং যে নিজের ঘরে তালা দিয়ে থাকবে সে নিরাপদ, এবং যে মসজিদে (কা’বা) প্রবেশ করবে সে নিরাপদ।[59]

মক্কায় ফিরে আবু সূফীয়ান তার জনগণের কাছে মুহাম্মদের মক্কায় প্রবেশে বাধা দানের অসারতা - যা নিশ্চিত পরাজয় ও ভরাডুবি আনবে - তা ব্যাখ্যা করে যুদ্ধ না করার উপদেশ দেন। তিনি আরও বলেন: ‘অস্‌লিম তস্‌লিম’ - অর্থাৎ ‘যদি রক্ষা পেতে চাও, তাহলে মুসলিম হয়ে যাও।‘ যারা পৌত্তলিক ধর্ম ধরে রাখতে চায় তাদেরকে তিনি নিজ নিজ ঘরে দরজা বন্ধ করে থাকতে অথবা তার (আবু সূফীয়ানের) বাড়ীতে আশ্রয় নিতে বলেন।

পরদিন সকালে মুহাম্মদের বাহিনী মক্কায় প্রবেশ করে। মক্কার একটি অবাধ্য দল, যারা খালেদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর সম্মুখে পড়ে, তারা সামান্য প্রতিরোধ দেখানোর চেষ্টা করে। এদের যারা খালেদের নাগালের মধ্যে আসে, তারা সবাই জীবন হারায়। যারা জীবন বাঁচাতে পাহাড়ে পালাচ্ছিল, খালেদ তাদের পিছু ধাওয়া করেন।

মক্কা করায়ত্ত করার পর নবী কা’বাঘরে রক্ষিত সমস্ত মূর্তি ধ্বংস করার আদেশ দিয়ে চিৎকার করে বলতে থাকেন - ‘(এখন) সত্য এসেছে, মিথ্যা দূরীভূত হয়েছে: কারণ মিথ্যা (স্বভাবতঃই) নির্মূল হতে বাধ্য’[60] - যা আল্লাহ পরবর্তীতে একটা আয়াত হিসেবে কুরআনে সন্নিবেশিত

---

[59]. Ibid, p. 547-48
[60]. Ibid, p. 552

করেছেন (কুরআন ১৭:৮১)। মুহাম্মদ কা'বার মাঝখানে দাঁড়িয়ে শত শত বছর ধরে গভীর ভক্তি ভরে কুরাইশরা যে মূর্তিগুলোকে পূঁজা করে এসেছে, সেগুলোকে ছড়ি উঁচিয়ে এক এক করে ধ্বংসের ইঙ্গিত দেন, আর সেগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। কুরাইশদের দেবতা 'কাঠের ঘুঘু'টিকে নবী নিজে ধ্বংস করেন।

মক্কা দখল ও কা'বা লুণ্ঠনের পর মুহাম্মদ মক্কা থেকে দুই দিনের পথ নখলার আল-উজ্জা মন্দিরের মূর্তিগুলো ধ্বংসের জন্য খালেদ বিন ওয়ালিদকে পাঠান।[61] আম'র নামে নবীর এক শিষ্য হুদেইল গোত্রের পূজিত 'সুওয়ার' মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলে। মদীনার একদল মুসলিম কোদেইদ-দের পূজিত বিখ্যাত দেবী আল-মানাতের মন্দিরটি ধ্বংস করে। এ মুসলিমরা দেবী আল-মানাতের ভক্ত ছিল ইসলাম গ্রহণের আগে।[62] **মুহাম্মদের মক্কা দখলের দিন অনেক পৌত্তলিক ইসলাম ধর্ম** গ্রহণ করে।

এবার মক্কা বিজয়ের ঘটনায় কুরাইশদের সাথে মুহাম্মদের আচরণ সম্পর্কে মুসলিমদের কিছু জনপ্রিয় দাবীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা যাক।

মক্কাবাসীর প্রতি মুহাম্মদের অভাবনীয় ক্ষমা প্রদর্শন

মক্কা বিজয়ের ব্যাপারে মুসলিমরা মুহাম্মদের তথা ইসলামের অমায়িকতা, শান্তিপ্রিয়তা ও ক্ষমাশীলতা সম্পর্কে বেশ কয়েকটি দাবী করে থাকেন:

১. মুসলিমবাহিনী বিনা বাধায় শান্তিপূর্ণভাবে মক্কায় প্রবেশ করেছিল, যা কুরাইশরা স্বাগত জানিয়েছিল।

২. কোন রকম বল প্রয়োগ ছাড়াই কুরাইশরা স্বেচ্ছায় বিপুল সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

৩. কুরাইশদেরকে হত্যা না করে মুহাম্মদ তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের এক অনন্য নজীর স্থাপন করেন।

শান্তিপূর্ণভাবে মুহাম্মদের মক্কায় প্রবেশ

দশ-বছর-মেয়াদী হুদাইবিয়া সন্ধিটি দুই বছর পরই ছুঁড়ে ফেলে মুহাম্মদের মক্কা আক্রমণ সত্ত্বেও মুসলিমদের কাছে তাঁর মক্কা বিজয়

---

61. Ibid, p. 565
62. Muir, p. 412

একটা শান্তিপূর্ণ ঘটনা। ঐ দুই বছর সময়কালেও মুহাম্মদ ও তাঁর শিষ্যরা বারংবার চুক্তিটির শর্ত সাংঘাতিকভাবে লঙ্ঘন করেছিল।
মুহাম্মদের বিনা বাধায় মক্কায় প্রবেশের দাবীর ব্যাপারে এটা বুঝতে কষ্ট হবে না যে, তাঁকে প্রবেশে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে কী ভয়াবহ ঘটনা ঘটত। মক্কা আক্রমণের আগে আবু সূফীয়ানের কাছে মুহাম্মদের দাবী কী ছিল? দাবীটি ছিল: ইসলাম গ্রহণ কর, নইলে তোমার শির মাটিতে গড়াগড়ি যাবে - এটা নয় কি? মক্কার একটা দল বোকামি করে যখন খালেদ বিন ওয়ালিদের বাহিনীকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে, তখন তাদের পরিণতি কী হয়েছিল: খালেদের বাহিনীর তরবারীর খাদ্য নয় কি?
সুতরাং মুসলিমরা শান্তিকামী ও ভালোবাসার যোগ্য হওয়ার কারণে কুরাইশরা তাদেরকে মক্কায় ঢুকতে দেয় নি; বরং মুসলিমরা কুরাইশদের তুলনায় অনেক শক্তিশালী ও মরিয়া হওয়ার কারণে মক্কাবাসীরা তাদেরকে বাধা দিতে সাহস পায় নি। মদীনার দুর্ভাগা ইহুদী গোত্রগুলোর পরিণতির কথা মক্কাবাসীর মাথায় তখনও জাগ্রত ছিল। মদীনার বানু কুরাইজা ইহুদী গোত্রকে মুহাম্মদ কী ভয়াবহ ও নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস করেছিলেন্তসে কথা তাঁর মক্কায় প্রবেশের সময় নিশ্চয়ই মক্কাবাসীর স্মরণে ছিল।

মক্কাবাসীর স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ

বলা হয়ে থাকে যে, মুহাম্মদের মক্কা দখলের দিন বিপুল সংখ্যক মক্কাবাসী ইসলাম গ্রহণ করেছিল - জুলুম বা মৃত্যুর ভয়ে নয়, ইসলামের শান্তির বাণীতে মুগ্ধ হয়ে। যদি তাই হয়, তাহলে প্রশ্ন উঠে: দু'বছর আগে নবী যখন মক্কায় অভিযান চালায়, তখন কেন তারা ইসলাম গ্রহণ করল না? কেন তারা মুহাম্মদকে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য মরণপণ প্রতিরোধের শপথ করেছিল, যা তাঁকে হুদাইবিয়ার চুক্তিটি স্বাক্ষরে বাধ্য করেছিল?
তদুপরি, ঐ দুই বছরে মুহাম্মদ কুরাইশদের সাথে এমন কোনো সহৃদয়পূর্ণতা আচরণ করেন নি, যার কারণে কুরাইশরা তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হতে ও বিপুল সংখ্যায় ইসলামে যোগ দিতে পারেন। বরঞ্চ সুযোগ আসতেই সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে মুহাম্মদের শিষ্যরা একের পর এক কুরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলা আক্রমণ করে সেগুলো লুণ্ঠন ও কাফেলার লোকদের হত্যার মাধ্যমে কুরাইশদের উপর চরম

ভোগান্তি আনয়ন করে। পরন্তু তিনি দশ বছর মেয়াদী সন্ধিটি আট বছর আগেই ছুঁড়ে ফেলে মক্কা আক্রমণ করেন। কোনো উস্কানি ছাড়াই মুহাম্মদ ঐ দু'বছর কালে বিভিন্ন অমুসলিম গোত্র- যেমন খাইবার, বানু সোলেইম, বানু লেইথ, বানু মুরা, ধাত আত্‌লাহ্‌, মুতাহ ও বানু নাদজ- সহ আরও কিছু গোত্রের উপর সহিংস হামলা চালিয়েছিলেন।[63] আবু সূফীয়ানকে সেদিন ইসলাম গ্রহণ করতে হয়েছিল মুহাম্মদের তলোয়ারের ডগা থেকে তার মস্তক বাঁচাতে নয় কি? পরিশেষে, মক্কাবাসীর কাছে আবু সূফীয়ানের বার্তা ছিল: 'অসলিম তসলিম' - অর্থাৎ যদি রক্ষা পেতে চাও তবে মুসলিম হও। নিজেদের রক্ষার জন্য তাদের সামনে মাত্র দু'টো পথ খোলা ছিল: প্রথমত, ইসলাম গ্রহণ করা; দ্বিতীয়ত, মসজিদ (কা'বা) অথবা আবু সূফীয়ানের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করা। এ উদাহরণগুলো স্পষ্ট করে তুলে যে, ইসলামের শান্তিপূর্ণতা বা মুহাম্মদের শান্তিকামী ও সহৃদয় মনোভাব ও আচরণ সেদিন কুরাইশদেরকে বিপুল সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে নি।

মুহাম্মদের অতুলনীয় ক্ষমা প্রদর্শন

মক্কা জয়ের দিন আত্মসমর্পণকারী মক্কাবাসীকে গণহারে মেরে না ফেলে ক্ষমা করে দেওয়াকে মুসলিমরা মুহাম্মদের অসাধারণ বদান্যতা ও ক্ষমাশীলতা রূপে চিত্রিত করে। মুসলিমরা এটাকে নবীর শত্রুর প্রতি নজীরহীন দয়ার নমুনা হিসেবে তুলে ধরে। মুসলিমরা বলতে চায় যে, ইতিহাসে কোনো নেতা তাঁর প্রবল শত্রুর প্রতি এমন ক্ষমা ও ধৈর্য কখনোই প্রদর্শন করেনি। কিন্তু মুহাম্মদ বা যে কোন ন্যূনতম বিবেকবান ব্যক্তি কি মক্কাবাসীদের গণহারে খুন করতে পারে, যখন তারা মক্কা দখলে বাঁধা না দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে এবং তাদের নেতা (আবু সূফীয়ান) ইতিমধ্যে মুহাম্মদের ধর্ম ও নবীত্ব মেনে নিয়েছিল? তদুপরি মুসলিমদের মক্কায় অগ্রসরে বাধা না দিলে তাদেরকে আঘাত করবে না বলে নবী আবু সূফীয়ানকে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন।

এটা সুস্পষ্ট যে, প্রাথমিকভাবে যখন মুহাম্মদ দীর্ঘ তের বছর মক্কায় তাঁর ধর্ম প্রচার করেন, তখন কুরাইশরা কখনোই তাঁর প্রতি নিষ্ঠুরতা দেখায় নি। মুহাম্মদ কর্তৃক মক্কাবাসীদের শত শত বছরের আচরিত ধর্ম

---

63. Ibid, p. 392-93

ও প্রথার বিরোধিতা ও অবমাননা সত্ত্বেও তারা তাঁর সঙ্গে আচরণে সভ্যতার সীমা অতিক্রম করেনি। বরং মুহাম্মদই মক্কার কুরাইশদের বহু বাণিজ্য-কাফেলা আক্রমণের সূত্রে তাদের সাথে অনেক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হন। মুহাম্মদ একের পর এক মক্কার বাণিজ্য কাফেলা হামলা ও লুণ্ঠন করে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যকে বিধ্বস্ত করায় কুরাইশরা ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির ও অভাব-অনটনের সম্মুখীন হয়। সর্বোপরি কুরাইশরা ছিল মুহাম্মদসহ মক্কা থেকে মদীনায় গমনকারী মুসলিমদের পিতামাতা, ভাইবোন ও আত্মীয়-স্বজন। পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম মানুষটিও কি তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের - যারা ইতিমধ্যেই অনাকাঙ্ক্ষিত ও অন্যায়ভাবে চরম ভোগান্তির শিকার হয়েছে - তাদের উপর তরবারী চালাতে পারবে?

মুসলিমদের চিন্তা-চেতনায়, এমন কি আজকের মুসলিমদেরও ধারণা যে, মুহাম্মদ কুরাইশদের প্রতি কখনোই নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেন নি। সব মুসলিমের কাছে মুহাম্মদের প্রতি কুরাইশদের স্পষ্ট প্রতীয়মান সভ্য ও ধৈর্যশীল আচরণ এমন ক্ষমাহীন অপরাধ ছিল যে, মক্কা দখলের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সবাইকে হত্যা করে নির্মূল করা উচিত ছিল।

পরন্তু সেদিন মুহাম্মদের মক্কা দখল আদৌ রক্তপাতহীন ছিল না। খালেদ বিন ওয়ালিদ তাদেরকে কচুকাটা করেছিল, যারা তাকে প্রতিরোধ করার সাহস দেখিয়েছিল। তদুপরি মুহাম্মদ মক্কার দশ বা বার জন নাগরিককে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন, কারণ তারা এর আগে ইসলাম ত্যাগ করেছিল অথবা তাঁর ধর্মের সমালোচনা বা উপহাস করেছিল। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতদের কয়েকজন মক্কার প্রভাবশালী পরিবারের লোক হওয়ায়, তাদের পরিবার-পরিজনের অনুরোধে ক্ষমা পেয়ে যায়। পরিশেষে মাত্র চারজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। এদের মধ্যে দুইজন ছিল গায়িকা, যারা নবীকে উপহাস করে গান রচনা করেছিল।[64] মুহাম্মদের কারণে অবর্ণনীয় যাতনা, অপমান, দুর্ভোগ, রক্তক্ষয় ও অভাব-অনটন ভোগ সত্ত্বেও কুরাইশরা তাঁর প্রতি যথেষ্ট মানবিক আচরণ প্রদর্শন করেছিল। কাজেই, কোন বিবেকবান বিচারেই মক্কার কোন ব্যক্তিই মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি পাওয়ার মত অপরাধ

---

[64]. Ibid, p. 410-11; Walker, p. 319

করে নি, বিশেষতঃ যখন তারা তাদের মাতৃভূমিকে বিনাশর্তে মুহাম্মদের হাতে তুলে দিয়েছিল।
তদুপরি সেদিন মক্কা করায়ত্ত করার পরও মুহাম্মদ বর্বর নিষ্ঠুরতা অব্যাহত রাখে। কা'বা ধ্বংস করার পর নবী খালেদ বিন ওয়ালিদকে প্রতিবেশী গোত্রগুলোর আনুগত্য আদায়ের জন্য পাঠান। খালেদ জাজিমা (জাধিমা) গোত্রের কাছে পৌঁছে তাদেরকে অস্ত্র ত্যাগ করতে বলে। ইবনে ইসহাক লিখেছেন: তারা অস্ত্র সমর্পণ করার সাথেসাথেই খালিদ তাদের হাত পিছনে বেঁধে তাদেরকে হত্যা করা শুরু করে।[65] গোত্রটি ইতিমধ্যেই মুহাম্মদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিল। সে ভিত্তিতে খালেদের সহগামী মদীনার ও মক্কার কিছু শিষ্য গোত্রটির বাকী লোকদের জীবন বাঁচাতে এগিয়ে আসে। উল্লেখ্য যে, জাজিমা গোত্র কখনোই নবী বা তাঁর সমপ্রদায়ের জন্য কোন সমস্যা ঘটায় নি। তথাপি তাদের উপর এরূপ নিষ্ঠুরতাকে 'চরম বর্বরতা' ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে?
মক্কা দখল করার পর যেরূপ নির্দয়ভাবে তিনি কুরাইশদের দেবমূর্তিগুলোকে ধ্বংস করেন ও সমালোচকদের মৃত্যুদণ্ড দেন, খালিদ যেভাবে মক্কার লোকগুলোকে হত্যা করে নিজস্ব মাতৃভূমি রক্ষার্থে সামান্য বাধা দেওয়ায় এবং জাজিমা গোত্রের লোকদেরকে খালিদ যেরূপ নির্মমভাবে হত্যা করে - এ ঘটনাগুলো মুহাম্মদের মক্কা দখলের দিনটিকে চরম নির্যাতনের দিন হিসেবে চিহ্নিত করে; কোনক্রমেই দয়া, ক্ষমা ও বদান্যতার দিন হিসেবে নয়।
ইসলামের নবী ভয় দেখিয়ে বা সহিংসতা ও আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে আরব অঞ্চলের অন্যান্য পৌত্তলিক গোত্রের উপর বিজয় বা আনুগত্য অর্জন করেন। আলোচনা সংক্ষেপ রাখার জন্য সে ঘটনাগুলো এ বইয়ে সংযোজিত করা হবে না। তবে ইসলাম ধর্মমতে, কুরাইশদের সাথে মুখোমুখিতায় নবীর যে প্রতিক্রিয়া ও আচরণ ছিল, তা পৌত্তলিকদের প্রতি মুসলিমদের আচরণের একটা আদর্শ নকশা হিসেবে বিবেচিত, এবং আদর্শগতভাবে মুসলিমদের পক্ষ থেকে সেটি সর্বকালে বিশ্বের সকল প্রতিমা- পূজকদের উপর প্রয়োগযোগ্য।

ইহুদীদের সঙ্গে মুহাম্মদের আচরণ

---

[65]. Ibn Ishaq, p. 561

মুহাম্মদের মিশনের উপর ইহুদী প্রভাব

ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের একেশ্বরবাদী বিশ্বাসের দ্বারা যুবক মুহাম্মদ যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। সম্ভবত এ দু'টো ধর্মের প্রভাব মক্কার বহুঈশ্বরবাদী জনগণের মধ্যে ঈশ্বরের একত্ববাদ প্রচারের লক্ষ্যে তাঁকে নিজস্ব নবুয়তীর মিশন গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। মুহাম্মদ যখন মাত্র ১২ বছরের তরুণ, তখন চাচা আবু তালিবের সঙ্গে ব্যবসায়ী উদ্যোগে সিরিয়া যেতেন (প্যালেস্টাইনের পাশ দিয়ে), যা তাঁকে ইহুদীদের ধর্ম বিশ্বাস এবং প্রথা ও রীতিনীতি সম্বন্ধে ধারণা অর্জনে সহায়তা করে।[66] মক্কাতেও আবদাইস বিন সালোম নামের জনৈক জ্ঞানী ইহুদী রাব্বী'র সাথে তাঁর বন্ধুসুলভ সম্পর্ক ছিল। কথিত আছে যে, উক্ত ইহুদী রাব্বি মুহাম্মদকে ইহুদী ধর্মগ্রন্থ পড়ে শোনাতেন ও ইহুদী রীতিনীতি ব্যাখ্যা করতেন। ইবনে ইসহাক লিখিত মুহাম্মদের জীবনীতে দেখা যায় যে, তিনি মাঝে মাঝেই বেথ হা-মিদ্রাস এ যেতেন। বেথ হা মিদ্রাস ছিল মক্কায় বাইবেল শিক্ষার একটি প্রতিষ্ঠান। মুসলিম আলোচক আল বাদাউল বর্ণনা করেছেন যে, এক ইহুদী তাওরাতে বর্ণিত প্রাচীন ইতিহাস মুহাম্মদের কাছে বর্ণনা করতেন। এমনকি মুহাম্মদ ইহুদী ধর্ম- মন্দির 'সিনাগগ'- এও যেতেন বলে জানা যায়। এ রাব্বি পরে ইসলাম গ্রহণ ও আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম নাম নেয় বলে জানা যায়। ধারণা করা হয় যে, তিনিই কুরআনের ৪৬:১ নং আয়াতে বর্ণিত সাক্ষী, যাতে তিনি কুরআন ও ইহুদী ধর্মগ্রন্থের মধ্যে সঙ্গতির সত্যতা জ্ঞাপন করেন। এ আয়াতটিতে ইহুদীদেরকে মুহাম্মদের নতুন ধর্ম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে চাওয়া হয়েছে।[67]
৬২২ সালে মুহাম্মদ যখন মদীনায় গমন করেন তখন সেখানে কয়েকটি ইহুদী ও বহুঈশ্বরবাদী গোত্র বসবাস করতো। বহুঈশ্বরবাদীদের তুলনায় ইহুদীরা ছিল অধিকতর ধনী ও প্রভাবশালী। এ সত্যতা প্রকাশ করে বিশিষ্ট ইসলামী পণ্ডিত আবুল আলা মওদুদী (মৃত্যু ১৯৭৯) লিখেছেন: 'অর্থনৈতিকভাবে ইহুদীরা আরবদের চেয়ে অনেক প্রভাবশালী ছিল। সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের মতো অধিকতর সভ্য ও সাংস্কৃতিকভাবে অনেকটা অগ্রসর দেশ থেকে স্থানান্তরিত হওয়ায় অনেক কলাকৌশল

---

[66]. Ibn Ishaq, p. 79-81; Muir, p. 21
[67]. Walker, p. 180-81

তাদের আয়ত্তে ছিল, যা আরবদের ছিল না। তারা বহির্বিশ্বের সাথে বাণিজ্য সম্পর্কও গড়ে তুলেছিল।'[68] ইহুদীরা নবীর মদীনায় স্থানান্তরে বিরোধিতা করে নি সম্ভবত দু'টো কারণে: প্রথমত, মুহাম্মদ পৌত্তলিকতা উৎপাটনের নিমিত্তে বহুঈশ্বরবাদীদের মধ্যে একেশ্বরবাদী ধর্মবিশ্বাস প্রচার করছিলেন, যা ইহুদীরাও কামনা করত; দ্বিতীয়ত, এ সময়ে ইহুদী ধর্মের প্রতি মুহাম্মদ বা তাঁর ধর্ম বন্ধুভাবাপন্ন বা অনুকূল ছিল। এ পর্যন্ত কুরআনে রচিত আয়াতে ইহুদী ও তাদের ধর্মগ্রন্থকে যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। মদীনায় অবস্থানের শুরুর দিকে মুহাম্মদ ইহুদী ও তাদের ধর্মগ্রন্থের প্রচুর প্রশংসা করতে থাকেন। এ পর্যায়ে তিনি তাদের সাথে ভাল সম্পর্ক রাখেন ও অনেক ইহুদী প্রথা - যেমন রোজা রাখা, ছুন্নত দেওয়া (মুসলমানি), নামাজ বা মুনাজাত করার সময় ইহুদীদের পবিত্র শহর জেরুজালেমের দিকে মুখ রাখা ইত্যাদি - গ্রহণ করেন (নীচে দেখুন)।

ইহুদীদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য নবীর আহ্বান

মদীনায় মুহাম্মদের ধর্ম প্রচারে বহুঈশ্বরবাদীরা অধিক সংখ্যায় ইসলামে যোগ দেয়। কিন্তু সম্পদশালী ইহুদীদেরকে তিনি ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ-করণে তেমন সুবিধা করে উঠতে ব্যর্থ হন। ফলে ইসলামের প্রতি নিরাবেগ ইহুদীদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ ঐশীবাণী প্রেরণ শুরু করেন। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ এ সময় ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ তাউরাতে বর্ণিত 'জেনেসিস' বা 'সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে অনেকগুলো আয়াত নাজীল করেন (কুরআন ২:৩০- ৩৮)। এছাড়াও আল্লাহ তাউরাতে উক্ত মূসা ও 'বনি ইসরাইলের সন্তানাদীদের (অর্থাৎ ইহুদীদের) নিয়েও আয়াত নাজীল করেন (কুরআন ২:২৪০- ৬১)। অতঃপর আল্লাহ ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের (একেশ্বরবাদী সাবিয়ানদেরকেও) তাঁর (আল্লাহর) কৃপা লাভের জন্য নিজেদের ধর্মগ্রন্থ অনুসরণের পাশাপাশি কুরআনকে বিশ্বাস করায় উদ্বুদ্ধ করতে আয়াত পাঠান। আল্লাহ বলেন: 'যারা কুরআন বিশ্বাস করবে, এবং যারা ইহুদী ধর্মগ্রন্থ, খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থ ও সাবিয়ান ধর্মগ্রন্থ অনুসরণ করবে, আল্লাহ ও রোজ কেয়ামতে বিশ্বাস করবে এবং যা সঠিক তা করবে, প্রভুর কাছ থেকে তারা পুরস্কার পাবে। তাদের কোন

---

[68]. Maududi AA (1993) *Historical Background to Surah Al-Hashr*, In *Towards Understanding the Quran*, (Trs. Ansari ZI), Markazi Maktaba Islamic Publishers, New Delhi.

ভয় নেই বা তাদেরকে দুঃখিত হতে হবে না' (কুরআন ২:৬২, আরও দেখুন ২২:১৭)।

মুহাম্মদকেও তাদের নবী হিসেবে গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ ইহুদীদেরকে (খ্রীষ্টানদেরকেও) অনেকবার সরাসরি অনুরোধ করেছেন। যেমন আলস্নাহ বলেন: 'হে ধর্মগ্রন্থের অনুসারীরা (ইহুদী ও খ্রীষ্টান)! এতদুদ্দেশ্যে বার্তাবাহক আসা বিরতির পর নিশ্চয়ই আমাদের (আল্লাহর) বার্তাবাহক (মুহাম্মদ) তোমাদের কাছে এসে (ধর্মের) ব্যাখ্যা প্রদান করছে, যাতে তোমরা বলতে না পারো সুসংবাদদাতা বা সতর্ককারী আমাদের কাছে আসেনি কেন। সুতরাং সত্যি সত্যি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী তোমাদের কাছে এসেছে। এবং আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান' (কুরআন ৫:১৯)। কিন্তু ইহুদীদেরকে মুহাম্মদের ধর্মে আনয়নে আল্লাহর সকল প্রয়াসও ব্যর্থ হয়।

ইসলামে ইহুদী মতবাদের উপর শুভ আলোকপাত

মুহাম্মদের উপর ইহুদী মতবাদের প্রভাব বাস্তবে কুরআনের উপরও প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি কুরআনে ইহুদী ধর্মকে কুরাইশদের পৌত্তলিকতার তুলনায় অনেক উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছেন। আদিপিতা আব্রাহাম, তার পুত্র ইসমাইল, মূসা নবী, রাজা ডেভিড (দাউদ) এবং সলোমন (সোলাইমান) - ইহুদী ধর্মের এসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রত্যেকেই ইসলামের নবীদের মাঝে মর্যাদাশীল অবস্থান পেয়েছেন। এমনকি মুহাম্মদ মূসা নবীকে নিজের চেয়েও উচ্চতর মর্যাদা দিয়েছেন (বুখারী ৪:৬২০: 'মূসার উপরে আমাকে মর্যাদা দিওনা')।

মুহাম্মদের নবুয়তী কার্যক্রমের প্রথম দিকে রচিত কুরআনের ঐশীবাণী ও তাঁর ব্যক্তিগত চালচলন ইহুদী ধর্মের প্রতি বেশ শুভপরায়ণ ছিল। জানা যায় যে তিনি নাকি বলেছিলেন: 'একজন ইহুদী বা খ্রীষ্টানের প্রতি যে অন্যায় করে, শেষ বিচারের দিন সে আমাকে ফরিয়াদী রূপে দেখতে পাবে।' তাঁর প্রাথমিক চালচলন দেখে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি শুধুমাত্র পৌত্তলিক আরবদের মাঝে একেশ্বরবাদী ধর্ম প্রচার করতে চেয়েছিলেন, যা হবে বিদ্যমান একেশ্বরবাদী ইহুদী ও খ্রীষ্ট ধর্মের একটা অংশবিশেষ। কাজেই কুরআনের প্রথম দিককার আয়াতগুলো ইহুদীদের মর্যাদা ও শ্রদ্ধাশীল রূপে চিহ্নিত করেছে: 'এবং নিশ্চয়ই আমরা বনি ইসরাইলের সন্তানদেরকে (ইহুদীদেরকে) ধর্মগ্রন্থ (তাউরাত) এবং জ্ঞান ও দৈববাণী প্রদান করেছি, তাদেরকে যা কিছু

ভাল তা দিয়েছি এবং তাদেরকে সকল জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি’ (কুরআন ৪৫:১৬)। ইহুদী ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে কুরআন বলে: এতে ‘ঈশ্বরের পথ-নির্দেশ ও (জ্ঞানের) আলো রয়েছে’ (কুরআন ৫:৪৪) এবং ‘এটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও সঠিকপন্থীদের পথ নির্দেশক’ (কুরআন ৬:১৫৩-৫৪)। কুরআন ফিলিস্তিন (জেরুজালেম)-কে বহুস্থানে ‘পবিত্র ভূমি’ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। শুরুতে মুহাম্মদ জেরুজালেমকে তাঁর নতুন ধর্মের কেন্দ্ররূপে দেখেন। জেরুজালেম থেকেই তিনি বেহেশ্তে উত্থিত (মিরাজ) হয়েছিলেন। মদীনায় স্থানান্তরের পর মুহাম্মদ জেরুজালেমকেই মুসলিমদের নামাজ বা প্রার্থনার কিবলা বানিয়েছিলেন।

মুহাম্মদ ইহুদীদের দাতব্য প্রথা ‘যাকাত’ নকল করেন এবং একে একটা আরামাইক বা সিরীয় (ইহুদীদের পবিত্র ভাষা) নাম দেন; যাকাতকে তিনি ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটির মর্যাদাও দেন। ইহুদীদের প্রথার অনুসরণে তিনি শুকরের মাংস খাওয়া হারাম করেন, প্রবর্তন করেন আনুষ্ঠানিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (ওজু) এবং তাদের ‘সাবাথ’ পালনের অনুকরণে শনিবারকে (পরে শুক্রবার-এ পরিবর্তিত) বানান ‘সাপ্তাহিক নামাজ’-এর দিন। ইহুদী প্রথা ও চর্চার অনুসরণে মুহাম্মদ ‘আশুরা’-র উপবাস বা রোজা চালু করেন, যাকে পরে তিনি রমজান মাসের রোজার প্রথা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। রোজাও ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি। ইহুদী প্রথার অনুসরণে তিনি মুসলিমদের জন্যও চালু করেন লিঙ্গ মুন্ডন বা লিঙ্গের মাথার চামড়া কাটার নিয়ম, যাকে ‘সুন্নত দেওয়া’ বা ‘মুসলমানী’ বলা হয় (আবু দাউদ ৪১:৫২৫)।[69] শুরুতে তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধির জন্য ইহুদীদের ব্যবহৃত ‘নবী’ শব্দটি ব্যবহার করে নিজেকে নবী বলে আখ্যায়িত করেন।

ইহুদীদের প্রতি মুহাম্মদের তিক্ততা

ইহুদীরা ইসলাম গ্রহণের জন্য আল্লাহ ও মুহাম্মদ উভয়ের অনুরোধই প্রত্যাখ্যান করে। কুরআনে ইহুদী ধর্মগ্রন্থ ও রীতিনীতি সম্পর্কে যা বলা

---

69. References of hadiths (or Sunnah) from the authentic sources, namely Sahih Bukhari, Sahih Muslim and Sunan Abu Dawud, have been included in the parentheses within the text.

হয়েছিল তা বহুক্ষেত্রে বেঠিক ও বিকৃত ছিল। যেমন কুরআন ৭:১৫৭ নং আয়াতে দাবী করে যে, মুহাম্মদ ছিলেন ইব্রাহীমের পুত্র ইসমাইলের বংশধর, এবং তিনিই সে মেসিয়াহ্, যার আগমন পূর্বঘোষিত হয়েছে তাউরাতে। এ নতুন দাবীটি কুরআনের পূর্বরচিত আয়াতে ঘোষিত দাবীর বিরোধী, কেননা পূর্ববর্তী আয়াত সুস্পষ্টরূপে বলেছে যে, কেবলমাত্র বনি ইসরাইলের সন্তানদের উপর (কুরআন ৪৫:১৬), এবং বিশেষভাবে ইসহাক ও ইয়াকুব-এর বংশধরদের উপর, নবুয়তী প্রদান করা হবে (কুরআন ২৯:২৭)। মুহাম্মদ ছিলেন একজন আরব, ইসরাইলী নয়; নবী ইসমাইলের সাথে যুক্ত তাঁর পারিবারিক বংশধারা নবী ইসহাক ও ইয়াকুব-এর বংশধারা থেকে ভিন্ন। কুরআনের এ ভাষ্য ও সুস্পষ্ট স্ববিরোধিতার কথা উল্লেখ করে ইহুদী রাব্বিরা খুব সহজেই তাঁর নবুয়তীর দাবী খণ্ডন করেন।

ইব্রাহীম ----> ইসহাক ----> ইয়াকুব ----> (নবীত্ব অর্পনের বংশধারা) ইব্রাহীম ----> ইসমাইল ----> মুহাম্মদ (নবীত্ব বহির্ভূত বংশধারা)

অধিকন্তু, ইসমাইল ছিলেন ইব্রাহীমের এক অবৈধ সন্তান। ইসমাইলের জন্ম হয়েছিল হাজেরা নাম্নী এক উপপত্নী বা দাসীর গর্ভে; আর হাজেরা ছিল একজন মিসরীয়, ইহুদীদের মত 'সেমিটিক' জাতির নয়। সুতরাং ইসমাইল ছিলেন ঈশ্বর ও আব্রাহামের মধ্যেকার চুক্তিবহির্ভূত। বাইবেলও তাঁকে 'অমার্জিত ও হিংস্র' হিসেবে বর্ণনা করেছে (দেখুন জেনেসিস ১৬:১২)।

সুতরাং পূর্বে রচিত কুরআনের আয়াত ও ইহুদীবাদ উভয়ই ইসমাইলের বংশধরদের তথা মুহাম্মদের উপর ইহুদীদের ঈশ্বরের নবীত্ব অর্পনের দাবী প্রত্যাখ্যান করে। পরন্তু কুরআন হিব্রু বা সিরীয় ভাষার মতো পবিত্র ভাষায় নাজীল হয়নি। কুরআন নাজীল হয় আরবীতে, যা ইহুদীদের দৃষ্টিতে ছিল কবি ও মদখোরদের ভাষা। তদুপরি ইহুদীরা কুরআনে বর্ণিত তাওরাতের ঘটনাবলি সম্পর্কে অনেক ভুল বের করে নবীকে ইহুদী ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে অজ্ঞ বলে অভিহিত করে, যদিও তাঁর প্রত্যাদেশ দাবী করেছিল যে মুহাম্মদের নবীরূপে আগমন ঘটেছিল তাউরাতের সত্যতা প্রমাণ করতে এবং কুরআন ছিল তাওরাতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। যেমন মুহাম্মদ ও কুরআন দোষারোপ করে যে, ইহুদীরা 'এজরা' বা 'ওজায়ের'-কে ঈশ্বরের পুত্র বলে (কুরআন ৯:৩০); কিন্তু

ইহুদীরা কখনোই এমন দাবী করেনি, যা তারা সহজেই খণ্ডন করে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ইহুদীরা মুহাম্মদের তথাকথিত দৈববাণীকে বিকৃত, ভ্রমাত্মক ও কোন কোন ক্ষেত্রে অবুদ্ধিমত্তাসুলভ আখ্যায়িত করে তাঁর নবুয়তীর দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে।

ইহুদীদের সঙ্গে মুহাম্মদের এ তিক্ততাপূর্ণ যুক্তিতর্ক ও মতবিরোধ বিরূপ আকার ধারণ করে ৬২৩ সালের অক্টোবর মাসের দিকে - অর্থাৎ মুহাম্মদের মদীনা আগমনের এক বছর পর ও বদর যুদ্ধের কিছুদিন আগে। ইহুদীদের (এবং খ্রীষ্টানদেরও) ইসলামে প্রলুব্ধ করতে ব্যর্থ হয়ে ক্রুদ্ধ আল্লাহ তাদেরকে ইসলামে আনয়নের প্রচেষ্টার সমাপ্তি টানেন এ প্রত্যাদেশ পাঠিয়ে: 'তাদের ধর্ম অনুসরণ না করা পর্যন্ত ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হবে না। বলুন: আল্লাহর পথ নির্দেশই সত্য। এ সত্যজ্ঞান তোমাদের কাছে আসার পর যদি তোমরা তাদের ইচ্ছাকে অনুসরণ করো, তাহলে তোমরা আল্লাহর কাছ থেকে কোন অভিভাবকত্ব বা সহায়তা পাবে না' (কুরআন ২:১২০)।

এরপর থেকে ইহুদীদের প্রতি আল্লাহর সুর ও মুহাম্মদের মনোভাব বদলাতে শুরু করে। ইহুদীদের ধর্মগুরু বা আদিপিতা ইব্রাহীম (আব্রাহাম) এখন হয়ে গেলেন 'মুসলিম' ও মুহাম্মদের নবীত্বের অগ্রদূত: 'আব্রাহাম না ছিলেন ইহুদী, না খ্রীষ্টান; কিন্তু তিনি ধর্মবিশ্বাসে ছিলেন সঠিক ও তাঁর ইচ্ছা সমর্পিত ছিল আল্লাহর সমীপে (অর্থাৎ ইসলামে)' (কুরআন ৩:৬৭)। নবুয়তীর বংশলতিকা সম্বন্ধে বিভ্রান্তি দূর করতে ও মুহাম্মদের নবীত্বের দাবীকে বৈধতা দিতে আল্লাহ অনেকগুলো আয়াত নাজীল করে ইব্রাহীম- ইসমাইলের বংশ পরম্পরার সম্পূর্ণ নতুন বংশলতিকা তৈরি করেন। বনি ইসরাইলের সন্তানদের উপর থেকে ধর্মীয় ও নবীত্বের চুক্তি সরিয়ে এনে তা আরব- বংশীয় মুহাম্মদের উপর ন্যস্ত করার জন্য আল্লাহ এখন নতুন একটি চুক্তি সৃষ্টি করলেন আব্রাহাম ও ইসমাইলের সঙ্গে - যাঁরা মক্কায় আল্লাহর পবিত্র ঘর কা'বা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে দাবী করে। মুহাম্মদের নবুয়তীর কার্যক্রম যেহেতু আরব- কেন্দ্রিক ছিল, ইসরাইল- কেন্দ্রিক নয় - এ বাস্তবতার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য আল্লাহ এখন দাবী করেন যে, তিনি আসলে কা'বাকে কেন্দ্র করে তাঁর ধর্মের জন্য আশীর্বাদ প্রদান করেছিলেন (কুরআন ২:১২৬- ৩০)। একগুচ্ছ নতুন আয়াতের মাধ্যমে (৩:৬৭, ২:১২৬- ৩০) আল্লাহ ইব্রাহীমপন্থী ধর্মের একটা সম্পূর্ণ নতুন

ধারা সৃষ্টি করেন, যা হবে মক্কা-কেন্দ্রিক, ইসরাইল-কেন্দ্রিক নয়; এবং নবীত্বের সন্ধি ইব্রাহীম-ইসমাইল বংশলতিকা অনুসরণ করবে, ইসহাক বা ইয়াকুবের বংশলতিকা নয়। অর্থাৎ ইসলাম হলো সেই আদি ধর্ম, যা আল্লাহ আব্রাহাম-ইসমাইল'এর বংশধারা কর্তৃক প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছিলেন, এবং আরব নবী মুহাম্মদ আসেন আল্লাহর ইচ্ছাকৃত সে প্রকৃত ধর্মকে সঠিকরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে।

ইহুদী ধর্মগ্রন্থ তাউরাতকে পূর্বে আল্লাহ তাঁর 'স্বর্গীয় পুস্তক' বা 'আসমানী কিতাব' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, যাতে ছিল তাঁর 'পথনির্দেশনা ও জ্ঞানালোক' (কুরআন ৫:৪৪) এবং সত্যানুসারীদের জন্য আল্লাহর আশীর্বাদ ও পথনির্দেশনা (কুরআন ৬:১৫৩-৫৪)। সে তাউরাত এখন হয়ে গেল ইহুদীদের দ্বারা বিকৃত (কুরআন ২:৭০)। এর আগে ইহুদীরা ছিল আল্লাহর সবচেয়ে 'অধিকার বা সুবিধাপ্রাপ্ত' মানুষ (কুরআন ৪৫:১৫); এখন তারা হয়ে গেল 'বিশ্বাসীদের (মুসলিম) প্রতি সর্বাধিক শত্রুতা প্রদর্শনকারীতে' (কুরআন ৫:৮২)। মুহাম্মদ নিজেকে এখন 'নবী'র পরিবর্তে 'রসুল' (বার্তাবাহক) আখ্যায়িত করতে শুরু করেন। তাঁর ধর্মের একটা নতুন কেন্দ্র উদ্ভাবনের পর আল্লাহ এখন প্রত্যাদেশ পাঠালেন নামাজের দিক জেরুজালেম থেকে মক্কার দিকে পরিবর্তন করতে (কুরআন ২:১৪৪)। মুহাম্মদ 'সাবাথ' বা 'সাপ্তাহিক নামাজের দিন' শনিবার থেকে শুক্রবার (জুম্মা)-এ পরিবর্তিত করেন, এবং ইহুদীদের আশুরা'র উপবাস পরিবর্তন করে মক্কার 'হানিফ' সমপ্রদায়ের' প্রথা অনুযায়ী মাসব্যাপী রমজানের রোজার রীতি চালু করেন। এ ছাড়াও নবী অন্যান্য ইহুদী প্রথা ও চর্চা, যা তিনি মদীনায় পৌঁছানোর পর গ্রহণ করেছিলেন, তা পরিবর্তন বা পরিমার্জিত করেন। এবার ইহুদীরা তাঁকে বাঁচাল বা অদৃঢ় মনের মানুষ হিসেবে অভিযুক্ত করে; নামাজের সময় পৌত্তলিকদের অন্ধভক্তির কেন্দ্রবিন্দু কা'বা মন্দিরে রক্ষিত 'কালোপাথর'-এর দিকে মুখ ফেরানোর উপহাসে মুহাম্মদকে উপহাসিত করে।

ইহুদীদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের সহিংসতা

মদীনায় মুহাম্মদের প্রত্যাদেশ সম্পর্কে ইহুদীদের ক্ষুরধার সমালোচনা - যার কোনো জবাব ছিল না তাঁর কাছে - তা তাঁর ধর্মপ্রচারকে উত্তরোত্তর অস্বস্তিকর করে তোলে, সম্ভবত হুমকী হয়েও দাঁড়ায়। ৬২৪ সালের গোড়ার দিকে কুরাইশদের বিরুদ্ধে বদর যুদ্ধে বিজিত

এবং বাণিজ্য- কাফেলার উপর ধারাবাহিক হামলা ও লুণ্ঠনের বিপুল মালামালে বলীয়ান নবী এখন অবাধ্য ও সমস্যা সৃষ্টিকারী ইহুদীদের উপর তলোয়ার উঠান। বদরের বিজয়ে স্পর্ধিত মুহাম্মদ মদীনার সবচেয়ে সম্পদশীল ইহুদী গোত্র ‘বানু কাইনুকা’র লোকদেরকে তাদের বাজারে জড়ো করে এ অশুভ হুঁশিয়ারী দেন: হে ইহুদীরা, সাবধান হয়ে যাও, অন্যথায় ঈশ্বর তোমাদের উপর সমুচিত প্রতিশোধ নিবে, যা কুরাইশদের উপর (বদরে) পতিত হয়েছিল। মুসলিম হয়ে যাও। তোমরা জান যে আমি ঈশ্বর- প্রেরিত একজন নবী।[70] মুহাম্মদের এ অশুভ ইঙ্গিতপূর্ণ হুমকিকে অবজ্ঞা করলে ইহুদীদেরকে অচিরেই চড়া মূল্য দিতে হয়।

বানু কাইনুকার উপর হামলা

মুসলিমরা দাবী করে যে, এ হুমকীর পর ৬২৪ সালের এপ্রিলে বানু কাইনুকার এক তরুণ একদিন এক মুসলিম মহিলাকে উত্ত্যক্ত করে। সেখানে উপস্থিত এক মুসলিম ঐ উত্ত্যক্তকারীকে হত্যা করে। তার প্রতিশোধে সে মুসলিমও জনৈক ইহুদী দ্বারা খুন হয়।[71] দু’পক্ষের এ ঝগড়ার ছুতা ধরে মুহাম্মদ সমগ্র বানু কাইনুকা সমপ্রদায়কে ঘেরাও করেন। পনের দিন ঘেরাও বা অবরোধের পর ইহুদীরা আত্মসমর্পণ করলে মুহাম্মদ তাদেরকে হত্যার জন্য বেঁধে ফেলার আদেশ দেন। এ পর্যায়ে খাজরাজ গোত্রের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে ওবাই হস্তক্ষেপ করেন। ওবাই ইসলাম গ্রহণ করলেও মুহাম্মদের কর্মকাণ্ডের প্রতি তার আনুগত্য ছিল সন্দেহজনক। ওবাই নবীকে অনুনয় করেন: ঈশ্বরের দোহাই, এ ৭০০ জন মানুষের মস্তক কি এক সকালেই তুমি ছিন্ন করতে চাও? আবদুল্লাহ মিনতি করেন: হে মুহাম্মদ, আমার মক্কেলদের উপর দয়া করো। উল্লেখ্য যে, বানু কাইনুকা আব্দুল্লাহর গোত্রের মিত্র ছিল। নবী তাঁর মিনতি উপেক্ষা করার চেষ্টা করলে, আব্দুল্লাহ তাঁর আলখিল্লার কলার ধরে জিদের সঙ্গে বলেন: ঈশ্বরের দোহাই, আমার মক্কেলদের প্রতি সদয় আচরণ না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে ছাড়বো না। তিনি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে আরও বলেন: আমিও একজন মানুষ, পরিস্থিতি পাল্টে যেতে পারে।[72]

---

70. Ibn Ishaq, p. 363
71. Muir, p. 241
72. Ibn Ishaq, p. 363-64; Walker, p. 184

আব্দুল্লাহ একজন প্রভাবশালী নেতা ছিলেন, আর তার এ হুঁশিয়ারীতে মুহাম্মদ বুদ্ধিমানের মতো বন্দীদেরকে হত্যা না করে সিরিয়ায় নির্বাসিত করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের উপকরণাদি সঙ্গে নেয়া নিষিদ্ধ করে নবী তাদেরকে মদীনা ত্যাগের জন্য তিন দিন সময় দেন। ইহুদীরা চলে যাওয়ার পর মুহাম্মদ তৎক্ষণাৎ তাদের ঘরবাড়ী ও ধনসম্পদ দখল করেন, এবং তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে জিহাদের মাধ্যমে অর্জিত 'পবিত্র লুণ্ঠন সামগ্রী' ('গণিমা' বা 'গণিমতের মাল') হিসেবে শিষ্যদের মধ্যে বণ্টন করেন।

প্রায় এ সময়েই তিনি তাঁর ধর্মবিশ্বাস ও কার্যকলাপের সমালোচনাকারীদেরকে হত্যার নির্দেশ দেন। হতভাগ্যদের মধ্যে ছিলেন ১২০ বছর বয়সী কবি আবু আফাক, যিনি মুহাম্মদের সহিংস কার্যকলাপের নিন্দা করে কবিতা লিখেছিলেন। আরেকজন হতভাগী ছিলেন পাঁচ সন্তানের জননী মহিলা-কবি আসমা বিন্‌তে মারওয়ান, যিনি নবীর আবু আফাককে হত্যাসহ অন্যান্য সহিংস কার্যকলাপের নিন্দা করে কবিতা লিখেছিলেন। তৃতীয় হতভাগা ছিলেন ইহুদী কবি কা'ব ইবনে আশরাফ, যিনি মুহাম্মদের বদর যুদ্ধের নৃশংসতার নিন্দা করে ও কুরাইশদেরকে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণে অনুপ্রাণিত করতে কবিতা লিখেছিলেন।[73]

ইবনে ইসহাকের মতে, এ সময় নবী ইহুদীদেরকে হত্যার জন্য এক সাধারণ বা খোলা অনুমোদন দেন এই বলে: ইহুদীদের হত্যা করো, যারা তোমাদের ক্ষমতার মধ্যে পড়বে। এরপর ইহুদী থেকে ইসলাম গ্রহণকারী মুহাঈসা নামক এক মুসলিমের সামনে দিয়ে সুনাইনা নামক জনৈক ইহুদী যাবার সময় মুহাঈসা হতভাগ্য সুনাইনাকে হামলা করে মেরে ফেলে। মুহাঈসার পরিবারের সাথে সুনাইনার সামাজিক ও ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল, এবং তার দ্বারা তাদের পরিবার উপকৃত ছিল। এ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিটিকে হত্যার ক্ষোভে রাগান্বিত মুহাঈসার বড় ভাই হুয়াঈসা তার মুখোমুখি হলে বলে: "তুই ঈশ্বরের শত্রু! তুই তাকে হত্যা করেছিস, অথচ তোর পেটের খাদ্য আসে তার সম্পদ থেকে।" ছোট ভাই এ কথায় হুঁশিয়ারী ইঙ্গিত করে উত্তর দেয়: ঐ ব্যক্তিকে হত্যার জন্য যিনি আমাকে আদেশ করেছেন, তিনি তোমাকে হত্যার

---

[73]. Ibn Ishaq, p. 675-76, 367

আদেশ দিলে আমি তোমার মাথাও ছিন্ন করতাম।" ইবনে ইসহাক লিখেছেন যে, এরূপ বর্বরোচিত মানসিকতা ও অঙ্গীকার, যা মুহাম্মদের ধর্ম ছোট ভাইয়ের মনে সঞ্চারিত করেছিল, তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে বিস্মিত হুয়াঈসা চিৎকার করে বলে উঠে: ঈশ্বরের দোহাই! যে ধর্ম তোকে এ শিক্ষা দিতে পারে, তা বিস্ময়কর! এবং এরপর সেও মুসলিম হয়ে যায়।[74]

বানু নাদির- এর উপর হামলা: মদীনার ইহুদীদের উপর মুহাম্মদের পরবর্তী নিষ্ঠুরতা ঘটে ৬২৫ সালের আগস্ট মাসে। সর্বনাশা ওহুদের যুদ্ধের পর একদিন নবী তাঁর ঘনিষ্ঠ শিষ্য আবু বকর, ওমর ও আলীকে নিয়ে বানু নাদির নেতার বাড়ীতে যান। বানু নাদিরের একটি মিত্র গোত্রের একজনকে মুহাম্মদের জনৈক শিষ্য হত্যা করেছিল, এবং সে ঘটনার মধ্যস' তার নিমিত্তে তিনি নাদির গোত্রপতির কাছে এসেছিলেন। আলোচনার একপর্যায়ে নবী তাঁর শিষ্যদেরকে 'তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত তথায় অপেক্ষা করতে বলে হঠাৎ উঠে পড়েন ও মদীনায় ফিরে আসেন' লিখেছেন ইবনে ইসহাক।[75] দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পরও মুহাম্মদ ফিরে না আসায় তাঁর সঙ্গীরা চলে যান। ইবনে ইসহাক জানান, মুহাম্মদ পরে বানু নাদিরের উপর অভিযোগ তোলেন যে, ছাদের উপর থেকে পাথর ছুঁড়ে তারা মুহাম্মদকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল (কৌতুহলের বিষয় হলো সেখানে অপেক্ষমান তাঁর শিষ্যদের কেউই ছাদের উপর কাউকে দেখতে পাননি)। তিনি অতঃপর নাদির গোত্রের উপর বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ তুলে তাদেরকে নির্বাসিত হয়ে ইহুদীপল্লী খালি করার নির্দেশ দেন। কোনো কোনো সমালোচক নাদির গোত্রের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের শত্রুতা বা রাগের কারণ হিসেবে ওহুদ যুদ্ধের আগে মক্কার আবু সূফীয়ানের সঙ্গে তাদের ব্যবসায়িক সুসম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। যাহোক, কুরআনে এর যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তা হলো: আল্লাহ তাদের বিতাড়নের রায় দিয়েছেন... কারণ তারা আল্লাহ ও তার প্রেরিত নবীর কাজে বাধা সৃষ্টি করেছে - এবং আল্লাহকে বাধা দিলে, আল্লাহ তাকে কঠোর শাস্তি দেন'

---

[74]. Ibn Ishaq, p. 369
[75]. Ibid, p. 437

(কুরআন ৫৯:৩- ৪)। অর্থাৎ নাদির গোত্রের ইসলাম প্রত্যাখ্যান বা এর সমালোচনা ছিল তাদের উপর মুহাম্মদের আক্রমণের কারণ।
কুরআনে আব্দুল্লাহ বিন ওবাইকে একাধিকবার ভণ্ড (হিপোক্রিট) আখ্যা দিয়ে নিন্দা করা হয়েছে। ওবাই বানু নাদিরের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগের নিন্দা করেন ও তাদের পক্ষে যুদ্ধ করারও হুমকী দেন, যা আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন এভাবে: ভণ্ডটি (বানু নাদিরকে) বলে: তোমরা বিতাড়িত হলে আমরাও তোমাদের সঙ্গে যাবো... আর তোমরা যদি (যুদ্ধে) আক্রান্ত হও, আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করবো। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী, তারা বাস্তবিকই মিথ্যাচারী (কুরআন ৫৯:১১)।
আব্দুল্লাহর সমর্থনের প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হয়ে ইহুদীরা মুহাম্মদের মদীনা ত্যাগের নির্দেশ অগ্রাহ্য করলে মুহাম্মদ তাদেরকে আক্রমণ করে দুর্গের মধ্যে অবরুদ্ধ করে রাখেন। ইবনে ইসহাক লিখেছেন, তাদেরকে দ্রুত আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে নবী তাদের সমস্ত পাম গাছ কেটে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। এতে বানু নাদির মুহাম্মদকে উদ্দেশ করে বলে: 'মুহাম্মদ, তুমি নিজেই যথেচ্ছা বা খেয়ালখুশি বশত ধ্বংসকাণ্ড নিষিদ্ধ করেছো ও যারা তা করে তাদেরকে নিন্দা করেছো। তাহলে তুমি কেন আমাদের পাম গাছ কাটছো ও পুড়িয়ে ধ্বংস করছো?'[76] শেষ পর্যন্ত নির্বাসনে যেতে দেওয়ার শর্তে তারা আত্মসমর্পণ করে। নবী তাদের তরবারী, বর্ম ও হেলমেটসহ ধনসম্পদ, বাড়ীঘর ও খামারগুলো দখল করে তাঁর শিষ্যদের মাঝে বণ্টন করে দেন।
বানু কুরাইজা হত্যাকাণ্ড
ইহুদীদের বিরুদ্ধে নবী মুহাম্মদের সবচেয়ে ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার ঘটনা ঘটে বানু কুরাইজা ইহুদী গোত্রের উপর ৬২৭ সালের এপ্রিল মাসে। এটা ঘটে খন্দক যুদ্ধের পরপরই, যে যুদ্ধে মক্কার বাহিনী মদীনায় মুসলিমদেরকে ব্যর্থ আক্রমণ করেছিল। মুহাম্মদ বানু কুরাইজাকে আক্রমণ করে তাদেরকে আবাসস' লের ভিতর প্রায় এক মাস আটকে রেখে নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে।
ইসলামী সূত্রগুলো দাবী করে যে, খন্দক যুদ্ধের সময় কুরাইশরা বানু কুরাইজার সাহায্য প্রার্থনা করলে তারা তাদেরকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি

---

[76]. Ibid

দেয়। কিন্তু বাস্তবে ঐ সুদীর্ঘ অবরোধের গোটা সময়টা কুরাইজা গোত্রটি ছিল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। বস' তঃ বানু কুরাইজা খন্দক খননের জন্য মুহাম্মদকে কোদাল- খনি- ধার দিয়ে সহযোগিতাও করেছিল, যা নবীর সমপ্রদায়কে রক্ষা করে। অথচ কুরাইশরা অবরোধ তুলে নেয়ার পরই মুহাম্মদ বানু কুরাইজার বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তি ও চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ তোলেন (সম্ভবত তাদের মাঝে কোন চুক্তি বিদ্যমান ছিল না[77])। আল্লাহ্ এ অভিযোগটি কুরআনে উপস্থাপন করেছেন এভাবে: 'এবং তিনি (আল্লাহ্) ধর্মগ্রন্থভুক্ত লোকদেরকে (অর্থাৎ বানু কুরাইজাকে) এনেছেন (বন্দী হিসেবে), যারা নিজেদের আবাসস' ল থেকে তাদেরকে (কুরাইশদের) সমর্থন করেছিল, এবং তাদের মনে ভীতির সৃষ্টি করেছেন' (কুরআন ৩৩:২৬)। আয়াতটি বলছে যে, বানু কুরাইজা গোত্রের লোকেরা তাদের আবাসস্থলের ভিতরে থেকেই কুরাইশদেরকে যুদ্ধে সহায়তা করেছিল, যে কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে বন্দী করেছেন ও তাদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আবাসস্থলের ভিতরে থেকেও বানু কুরাইজা কীভাবে কুরাইশদেরকে যুদ্ধে সহায়তা করতে পারে তা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন।

মুহাম্মদ বানু কুরাইজাকে আক্রমণ করলে আবদুল্লাহ্ বিন ওবাই এবারও তাঁর নিন্দা করেন। কিন্তু এ সময় তিনি ছিলেন মৃত্যু নিকটবর্তী এবং তার পক্ষের অধিকাংশ লোক মুহাম্মদের দলে যোগ দেওয়ায় তার সামাজিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কাজেই নবী এখন সহজেই তাকে অগ্রাহ্য করতে পারতেন। অবরুদ্ধ থাকাকালে বানু কুরাইজা কাইনুকা বা নাদির গোত্রের মতো নির্বাসনে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল, যা মুহাম্মদ প্রত্যাখ্যান করেন। আত্মসমর্পণের পর তিনি তাদের সমস্ত সাবালক, মোট ৮০০ থেকে ৯০০, পুরুষকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। পুরুষাঙ্গের পাশে জন্মানো লোমের ভিত্তিতে তাদের সাবালকত্ব যাচাই

[77]. Watt WM (1961) Islam and the Integration of Society, Routledge & Kegan Paul; London, p. 19. Indeed, there existed no treaty at all. The Constitution of Medina, which is peddled as the treaty in question by Muslims was never signed by any Jewish tribes. According to Montgomery Watt, whose books on Islam are widely published in Pakistan, there were nine contracting parties in this document and they were the Muslims and Arab Pagan tribes, who had become essentially Muslim by converting to Islam in large numbers after Muhammad's arrival in Medina.

করা হয়।[78] কুরাইজা গোত্রের শিশু ও নারীদেরকে দাস হিসেবে আটক করা হয় এবং তাদের ধনসম্পদ ও ঘরবাড়ী যথারীতি বাজেয়াপ্ত করে মুসলিমদের মাঝে বণ্টন করা হয়। ইসলামের ঈশ্বর নিম্নোক্ত প্রত্যাদেশের মাধ্যমে এ নিষ্ঠুর বর্বরতার স্বর্গীয় অনুমোদন দেন: '(তাদের) কতককে তোমরা হত্যা করেছো ও কতককে করেছো বন্দী। এবং তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে তাদের ভূমি, বাড়ীঘর, ধনসম্পদ ও খামারের... অধিকারী করেছেন। আল্লাহ সর্বদা সবকিছু করতে সক্ষম' (কুরআন ৩৩:২৬- ২৭)।

যাহোক, এ সিদ্ধান্ত অনুসারে বাজারের কাছে একটা পরিখা খনন করা হয়। সেখানে নবীর উপস্থিতিতে হাত বাধা অবস্থায় সে ৮০০- ৯০০ বন্দীকে একে একে পরিখার ধারে এনে তরবারীর আঘাতে মস্তক ছিন্ন করে কূপের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। নবী নিজে দুই ইহুদী নেতার শিরচ্ছেদ করেন। এ দৃশ্য চলে সকাল থেকে সারাদিন এবং মশাল জ্বালিয়ে রাত্রি পর্যন্ত। ক্যারন আর্মস্ট্রং ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমাদের ভুল ধারণা সংশোধনের লক্ষ্যে অবিরাম প্রচারণা চালানোর জন্য মুসলিমদের কাছে অতি প্রিয়। কিন্তু এ নৃশংস গণহত্যা তার মনেও এমন মর্মান্তিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যে, একে তিনি ইহুদীদের উপর জার্মান নাৎসিদের নিষ্ঠুরতার সাথে তুলনা করেন।[79] এ নির্মম হত্যাকাণ্ডকে ইহুদীদের উপর 'ফার্স্ট হলোকাস্ট' বা 'প্রথম হত্যাযজ্ঞ' আখ্যায়িত করা যায়।

এক ইহুদী নারী, যার স্বামীকে শিরচ্ছেদ করা হয়েছিল, সে তার স্বামীর হত্যাকারীদের দাসী হয়ে বেঁচে থাকার পরিবর্তে স্বামীর মত মৃত্যু কামনা করে। মুহাম্মদ তার দাবী মঞ্জুর করলে সে সহাস্যবদনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নেয়। নবীর যুবতী স্ত্রী আয়শা বানু কুরাইজার হত্যাযজ্ঞ সচক্ষে দেখেছিলেন। তিনি বলতেন: সে বীরাঙ্গনার মৃত্যুকালীন হাস্যপূর্ণ মুখখানি সব সময় যেন তার চোখের সামনে ভেসে উঠে। ইবনে ইসহাক জানান: 'আয়েশা প্রায়শঃই বলতেন, 'শীঘ্রই তাকে হত্যা করা হবে

---

[78]. Abu-Dawud 38:4390: Narrated Atiyyah al-Qurazi: "I was among the captives of Banu Qurayzah. They (the Companions) examined us and those who had begun to grow hair (public) were killed and those who has not were not killed..."

[79]. Armstrong K (1991) *Muhammad: A Western Attempt to Understand Islam*, Gollanz, London, p. 207.

জানা সত্ত্বেও সেই নারীর উচ্ছল তেজ ও সশব্দ হাসির কথা আমাকে যে কী বিস্মিত করেছিল, তা আমি কখনোই ভুলতে পারবো না।[80]

আল জাবীর নামক আরেক বৃদ্ধ ইহুদী, যিনি ইতিপূর্বে কয়েকজন মুসলিমের জীবন রক্ষা করেছিলেন, তাকে ক্ষমা করা হয়েছিল। কিন্তু এ ক্ষমার প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এই বলে যে, তার প্রিয়জনরা সবাই যখন মৃত্যুবরণ করলো তখন তাঁর আর বেঁচে থাকার সাধ নেই। ইবনে ইসহাক তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন এভাবে: 'পরিবার ও সন্তান্তসন্ততিবিহীন বৃদ্ধের জীবনে চাওয়া-পাওয়ার আর কী থাকতে পারে?' তা শুনে মুহাম্মদ চীৎকার করে উঠেন: হ্যাঁ, তুমিও তাদের সঙ্গে নরকের আগুনে যাবে", এবং তার শিরচ্ছেদের হুকুম দেন।[81]

নবী পবিত্র লুণ্ঠনের মালরূপে প্রাপ্ত বানু কুরাইজার ধনসম্পদের এক-পঞ্চমাংশ নিজের হিস্যারূপে রেখে অবশিষ্ট তাঁর অনুসারীদের মধ্যে ভাগ করে দেন। একই ভাবে বন্দী নারী ও শিশুদের ভাগ করা হয়। নারী বন্দীদের মধ্যে সুন্দরী তরুণীরা মুসলিমদের যৌনদাসীরূপে গৃহীত হয়। নবী নিজে রায়হানা নাম্নী এক সুন্দরী তরুণীকে তাঁর যৌনদাসী হিসেবে গ্রহণ করেন। বন্দী পুরুষদের হত্যার ঐ রাতেই তিনি রায়হানাকে বিছানায় নিয়ে সহবাস করেন। ভবিষ্যতে যুদ্ধের প্রয়োজনে অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়া সংগ্রহের জন্য কিছু বন্দীকে অন্যত্র বিক্রি করা হয়। ইবনে ইসহাক লিখেছেন: 'অতঃপর নবী বানু কুরাইজার কিছুসংখ্যক বন্দী নারীসহ সা'দ বিন জায়েদ আল-আনসারীকে নাজদ'এ পাঠান। আনসারী ঘোড়া ও অস্ত্রের বিনিময়ে তাদেরকে বিক্রি করে দেন।[82]

খাইবার ইহুদীদের উপর হামলা: বানু কুরাইজাকে নির্মূলের সাথে মদীনা ইহুদীমুক্ত হয়ে যায়। এবার মুহাম্মদের নজর পড়ে মদীনার বাইরে খাইবারের ইহুদীদের উপর। খাইবার ছিল আরব উপদ্বীপ অঞ্চলের আরেকটি শক্তিশালী ইহুদী অধ্যুষিত শহর, যার অবস্থান মদীনা থেকে প্রায় ৭০ মাইল উত্তরে সিরিয়ার পথে। বিশেষ করে তিনি মদীনা থেকে খাইবারে নির্বাসিত বানু নাদির গোত্রের ইহুদীদের উপর ছিলেন প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। কারণ তাদের নেতা আবু রফি মদীনার বিরুদ্ধে খন্দকের যুদ্ধে

---

[80]. Ibn Ishaq, p. 465; also Walker, p. 185-86

[81]. Ibn Ishaq, p. 466

[82]. Ibid, p. 465

কুরাইশদের মিত্র বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন। সুতরাং আবু রফি ও তার সমপ্রদায়ের উপর চরম প্রতিশোধ নিতে হবে।
কুরাইজাকে নির্মূলের অল্পকাল পরে ৬২৭ সালে নবী আলীর নেতৃত্বে খাইবারের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এ অভিযানে কিছু গবাদী পশু ও ঘোড়া ছিনিয়ে আনা ব্যতীত তেমন সফলতা আসেনি। অতঃপর নবী আবু রফিকে হত্যার জন্য একদল গুপ্তহত্যাকারী পাঠান। হত্যাকারীরা রাতের অন্ধকারে বন্ধুবেশে আবু রফির বাড়ীতে প্রবেশ করে তাকে খতম করে মদীনায় ফিরে এলে নবী আনন্দ-উল্লাসে চীৎকার করে উঠেন: তোমরা সফল হয়েছো! আর আপনিও, হে নবী - উত্তরে বলে খুনীরা।[83] আরো একটা হত্যা মিশন পাঠানো হয় খাইবারের নেতা ওজেইর (ইউসিয়ের)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে। কিন্তু এ সময় ইহুদীরা সতর্ক থাকায় পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়।
অতঃপর নবী ৬২৮ সালের জানুয়ারী মাসে খাইবারের নেতার সাথে আলোচনার জন্য প্রকাশ্যে তিরিশ জন মুসলিম প্রতিনিধি পাঠান। তারা খাইবারে পৌঁছে ওজেইরকে নিশ্চয়তা দেয় যে, ‘মুহাম্মদ তাকে খাইবারের শাসনকর্তা বানাবেন এবং তার সাথে বিশেষ সম্মানজনক আচরণ করবেন। তারা আল্লাহর নামে তার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়।’ এ নিশ্চয়তার ভিত্তিতে ওজেইরের নেতৃত্বে খাইবারের তিরিশ জনের একটি প্রতিনিধিদল মদীনার দিকে যাত্রা করে। মরুপথে ভ্রমণকালে প্রতিটি উটের পিঠে একজন মুসলিমের পিছনে একজন ইহুদী বসে। খাইবার থেকে কিছুদূর আসার পর মুসলিমরা ইহুদীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদেরকে হত্যা করে; মাত্র একজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা মুহাম্মদের কাছে যখন বর্ণনা করা হয়, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে তিনি বলেন: নিশ্চয়ই ঈশ্বর তোমাদেরকে পাপীষ্ঠদের মাঝ থেকে (নিরাপত্তার সাথে) প্রেরণ করেছেন।[84]
পরবর্তীতে ৬২৮ সালের মে মাসে নবী নিজে ১,৬০০ যোদ্ধার শক্তিশালী একটি বাহিনীর নেতৃত্বে খাইবার অভিযানে যাত্রা করেন। তাঁরা রাতের অন্ধকারে অত্যন্ত গোপনতার সাথে খাইবার পৌঁছান। ইবনে ইসহাক জানান: খাইবারের লোকেরা সকালে কাজের জন্য

83. Muir, p. 348
84. Ibid, p. 349

টুকরি- কোদাল নিয়ে বের হলেই নবী ও তাঁর বাহিনীকে দেখতে পায়। "মুহাম্মদ তাঁর বাহিনী নিয়ে এসেছে" বলে চিৎকার করতে করতে তারা লেজ গুটিয়ে পালায়। আল্লাহু আকবর! খাইবার ধ্বংস হয়েছে" বলে নবী খাইবার আক্রমণ করেন।[85] রক্তাক্ত যুদ্ধে মুসলিমরা শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। যুদ্ধে তিরানব্বই জন ইহুদী প্রতিরোধকারী ও উনিশ জন জিহাদী মারা যায়। ইহুদী নেতা আবু রফিকে হত্যার পর তার তরুণ নাতি কিনানা বানু নাদিরের নেতা হয়েছিলেন। সুরক্ষার জন্য তাঁদের ধনসম্পদ তিনি একটা গোপন স্থানে লুকিয়ে রেখেছিলেন। নবী এক দলত্যাগী বিশ্বাসঘাতক ইহুদীর কাছ থেকে কিনানার গুপ্ত সম্পদের কথা জানতে পান। গুপ্ত সম্পদের তথ্য বের করার জন্য নবী বুকে আগুন রেখে কিনানাকে নির্যাতন করেন। ইতিমধ্যে গুপ্ত সম্পদের খোঁজ পাওয়া যায়। এরপর কিনানাকে হত্যা করা হয়।

যুদ্ধে জয়লাভের পর খাইবার যোদ্ধাদেরকে (যুদ্ধ করতে সমর্থ এমন বয়সের লোকদের) হত্যা করা হয় এবং নারী ও শিশুদেরকে দাসদাসী হিসেবে বন্দী করা হয় (বোখারী ২:১৪:৩৮)। ইবনে ইসহাক লিখেছেন: খাইবারের নারীদেরকে মুসলিম যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়।[86] নারী- বন্দীদের মধ্যে তিন জন অসাধারণ সুন্দরী তরুণী ছিল: কিনানার সতর বছর বয়স্কা স্ত্রী সাফিয়া ও তার দুই অবিবাহিত চাচাত বোন। জানা যায় যে, সাফিয়া নবীর জিহাদী শিষ্য দিহাইয়া বিন খলীফা আল- কালবী'র ভাগে পড়ে। কিন্তু আরেক জিহাদী শিষ্য নবীর কাছে এসে সাফিয়ার অসাধারণ সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা করে বলে যে, কেবলমাত্র আল্লাহর নবীই তার যোগ্য হতে পারে। একথা শুনে মুহাম্মদ সাফিয়াকে নিজের হস্তগত করতে চান (বোখারী ৫:৫১২)। সহি মুসলিম হাদিসে (৮:৩৩২৯) বলা হয়েছে: আনাস বলেছেন: যুদ্ধের মালামালের মধ্যে সাফিয়া দিহাইয়ার ভাগে পড়ে এবং আল্লাহর নবীর উপস্থিতিতে তার প্রশংসা করে তারা বলে, 'আমরা এ পর্যন্ত তার মতো সুন্দরী নারী বন্দীদের মাঝে কখনও দেখিনি।' আবু দাউদ জানান, একথা শুনে মুহাম্মদ দিহাইয়া ও সাফিয়াকে তাঁর সম্মুখে হাজির করার নির্দেশ দেন। সাফিয়াকে দেখে নবী দিহাইয়াকে বলেন: 'বন্দীদের মধ্য থেকে অন্য

---

85. Ibn Ishaq, p. 511; also see Bukhari 2:68
86. Ibn Ishaq, p. 515

একজন দাস- তরুণীকে গ্রহণ করো।' নবী সাফিয়াকে মুক্ত করে দেন ও তাকে বিয়ে করেন' (আবু দাউদ ১৯:২৯৯২)। ইবনে ইসহাক লিখেছেন: 'মুহাম্মদ সাফিয়াকে তাঁর পিছনে অবস্থান নিতে বলেন ও নিজের আলখেল্লা তার গায়ে জড়িয়ে দেন, যাতে মুসলিমরা বুঝে যে তিনি নিজের জন্য তাকে পছন্দ করেছেন।[87] দিহাইয়া সাফিয়ার দুই চাচাত বোনকে নিয়ে নিজেকে প্রবোধ দিতে বাধ্য হয় (মুসলিম ৮:৩৩২৯)।

এ অভিযানে বাজেয়াপ্ত বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ নবী তাঁর যোদ্ধাদের মধ্যে যথারীতি বিতরণ করে দেন। তিনি আত্মসমর্পণকৃত বাকি ইহুদীদেরকে খাইবার থেকে বহিষ্কার করতে চেয়েছিলেন (বোখারী ৩:৫৩১)। কিন্তু বাজেয়াপ্তকৃত জমি চাষবাসের জন্য মুসলিমদের জনবল যথেষ্ট ছিল না। এক হাদীসে বলা হয়েছে: 'জমিতে কাজ করার জন্য তাদের যথেষ্ট শ্রমিক বা কর্মী ছিল না' (আবু দাউদ ১৯:৩০০৪)। সুতরাং মুহাম্মদ দুটো শর্তে তাদেরকে খাইবারে থাকার অনুমতি দেন: প্রথম, 'আমাদের যতদিন খুশী ততদিন তোমাদের থাকতে দিব' (বোখারী ৩:৫৩১) এবং দ্বিতীয়, উৎপাদিত দ্রব্যের (ফল এবং সবজি) অর্ধাংশ কর হিসেবে মুসলিমদেরকে দিতে হবে (বোখারী ৩:৫২১-২৪)।

খাইবারের ঘটনায় আতঙ্কিত ফাদাক- এর ইহুদী গোষ্ঠী তাদের জমির উৎপন্ন দ্রব্যের অর্ধাংশ সমর্পণের শর্তে মুহাম্মদের আনুগত্যের প্রস্তাব দেয়। এরপর আরবের কামুস, ওয়াটিহ্, সোলেলিম ও ওয়াদি আল-কোরা প্রভৃতি ইহুদী শহরগুলোকে বশীভূত হতে বাধ্য করা কিংবা নির্বাসিত করা হয়। মৃত্যুর আগে মুহাম্মদ সমগ্র আরব অঞ্চল থেকে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বিতাড়িত করার নির্দেশ দেন। ইবনে ইসহাক জানান: মৃত্যুশয্যায় নবী নির্দেশ দেন যে, 'দু'টো ধর্মকে আরব উপদ্বীপে স্থান দেওয়া ঠিক হবে না।'[88] এর ফলে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ওমর ৬৩৮ সালে খাইবারের সব ইহুদীকে বহিষ্কার করেন ও তার শাসনকালের শেষ দিকে (মৃত্যু ৬৪৪ সালে) আরব উপদ্বীপে কোন

---

[87]. Ibid

[88]. Ibid, p. 525

ইহুদী ও খ্রীষ্টান অবশিষ্ট ছিল না (বোখারী ৩:৫৩১, আবু দাউদ ১৯:৩০০১)।[89]

খ্রীষ্টানদের প্রতি নবী মুহাম্মদের আচরণ

অধ্যাপক এডোয়ার্ড সাইদ দুঃখ করে বলেন:'মধ্য যুগের অধিকাংশ সময় ধরে ও রেনেসাঁর প্রথমার্ধে ইউরোপে ইসলামকে মনে করা হতো ভ্রষ্ট, **ঈশ্বর-নিন্দুক ও অস্পষ্ট** একটা দানবীয় ধর্ম।[90] পাইপ্‌স লিখেছেন: 'খ্রীষ্টানরা অনেককাল ধরে ইসলামকে তাদের নিজস্ব ধর্ম থেকে উদ্ভূত বিপথগামী এক আন্দোলন হিসেবে দেখেছে।[91] ইগনাজ গোল্ডজিহার দাবী করেন: মুহাম্মদ কোনো নতুন ধারণা বা আদর্শের ঘোষণা দেন নি... তাঁর বার্তা ছিল ইহুদী, খ্রীষ্টান ও অন্যান্য ধর্ম বা সূত্র থেকে গ্রহণকৃত ধর্মীয় আদর্শ ও নিয়ম-কানুনের যোগবিশেষ মাত্র।[92] কুরআন নিজেই ইসলামে ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাবের কথা স্বীকার করে; তদুপরি পৌত্তলিক, জরথুষ্ট্রবাদ, সাবিয়ান এবং ইসলামপূর্ব অন্যান্য ধর্মবিশ্বাস ও শাস্ত্রীয় আচার ইসলাম ধর্মে ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্যামুয়েল জুয়েমার বলেন : ইসলাম কোন (নতুন) উদ্ভাবন নয়, বরং পুরনো ধারণার সংমিশ্রণ মাত্র।[93] ইসলাম বিদ্যমান ধর্ম, বিশেষত খ্রীষ্ট ও ইহুদীবাদ থেকে গৃহীত ধারণাসমূহের মিশ্রণে প্রতিষ্ঠিত - এ দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টানদের সঙ্গে নবী মুহাম্মদের সম্পর্ক ও আচরণের বিষয়টি বিস্তৃত আলোচনা করা হবে, যা পাঠকদের জন্য ইসলামের ভিত্তি সম্পর্কে এ দাবীগুলো হৃদয়ঙ্গম বা যাচাই করতে সহায়ক হবে। এ আলোচনা পরিষ্কার করে তুলবে বিশেষত খ্রীষ্টধর্ম কীভাবে মুহাম্মদের ধর্মের ধারণা ও মিশনকে ব্যাপক প্রভাবিত করেছিল, এবং কীভাবে খ্রীষ্টান ধর্ম ও এর অনুসারীদের প্রতি তাঁর মনোভাব ও ধর্মের সুর ইসলাম উত্তরোত্তর সুদৃঢ় হওয়ার সাথে সাথে ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয়।

মুহাম্মদের নবীত্ব ও ধর্মের উপর খ্রীষ্টান প্রভাব

---

89. Muir, p. 381

90. Said EW (1997) Islam and the west In Covering Islam: How the Media and Experts Determine How We See the Rest of the World, Vintage, London, p. 5-6

91. Pipes D (1983) *In the Path of God*, Basic Books, New York, p. 77

92. Goldziher I (1981) *Introduction to Islamic Theology and Law*, Trs. Andras & Ruth Hamori, Princeton, p. 4-5

93. Zwemer S (1908) *Islam: A Challenge to Faith*, New York, p. 24

অষ্টম শতকের খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদ দামেস্কের জন (মৃত্যু ৭৪৯)- এর মতে, মুহাম্মদের ধর্ম ছিল খ্রীষ্টান ধর্মেরই একটি ভ্রান্ত রূপ। তিনি লিখেছেন: 'সম্ভবত এক এরিয়ান (আর্য) মংক বা মঠাধ্যক্ষের মাধ্যমে ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্ট- এর সাথে পরিচিতি লাভের পর মুহাম্মদ তাঁর নতুন ধর্ম সমপ্রদায়কে সংগঠনে সচেষ্ট হন।' জার্মান দার্শনিক কুসা'র নিকোলাস (মৃত্যু ১৪৬৪) খ্রীষ্টধর্মের প্রাথমিক শতাব্দীগুলোতে মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে- ছিটিয়ে থাকা নেস্টোরিয়ান নামক এক খ্রীষ্টান সমপ্রদায়ের বিশ্বাসসমূহের ছাপ খুঁজে পান কুরআনে।[94]
ইসলামী সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, খ্রীষ্টানধর্মের সাথে মুহাম্মদের সর্বপ্রথম যোগাযোগ ঘটে বাহিরা নামক এক বিজ্ঞ নেস্টোরিয়ান মঠাধ্যক্ষের মাধ্যমে। বার বছর বয়সে (কারো কারো মতে নয় বছর বয়সে) চাচা আবু তালিবের সঙ্গে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমনকালে তিনি বাহিরার সান্নিধ্যে আসেন। এ যাত্রাকালে সিরিয়ার খ্রীষ্টান্তঅধ্যুষিত অঞ্চলগুলোর মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় মুহাম্মদ প্রথম খ্রীষ্টান ধর্ম, প্রথা ও ধর্মীয় আচার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন করেন। মুসলিম কাহিনীগুলো বলে যে, মুহাম্মদের ধর্মীয় আলোচনায় খুব আগ্রহ দেখে বাহিরা ভীষণ অভিভূত হন এবং তিনি নাকি মুহাম্মদের মাঝে আগামী এক নবীর ছায়া দেখতে পান।[95] বাহিরা নাকি মুহাম্মদকে কিছু খ্রীষ্টান মতবাদ ও আইন সম্পর্কে জ্ঞান দেন, এবং বাইবেলের কিছু অনুপ্রেরণাদায়ক অংশ পড়ে শোনান। বাহিরার কাছে বাইবেলের জ্ঞান লাভের ঘটনা সম্পর্কে ইবনে ইসহাক উল্লেখ করেন: 'সেখানে তিনি জ্ঞান লাভ করেন একটা পুস্তক থেকে যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে হস্তান্তরিত হয়ে এসেছে।'[96] মুহাম্মদ পরে সেসব হজমকৃত জ্ঞান কুরআনে প্রবিষ্ট করেন, যাতে করে আরবরা সত্যিকার একেশ্বরবাদের ধারণার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে।
আগেই বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরের নিকট থেকে ঐশীবাণী পাওয়ার আগে মুহাম্মদ সম্ভবত ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থে প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন। ইসলামী সাহিত্যে বেশ কিছু নজির আছে যা থেকে ধারণা করা যায় যে, মুহাম্মদ নিজ নবীত্বের মিশন শুরু করার আগে খ্রীষ্টান ও ইহুদী

---

[94]. Walker, p. 188
[95]. Al-Tabari, Vol. 6, p. 45
[96]. Ibn Ishaq, p. 79-81

ধর্মগ্রন্থের সাথে নিজেকে ভালভাবে পরিচিত করে নিয়েছিলেন এবং ঐ দু'ধর্মের মৌলিক বা কেন্দ্রীয় ধারণা 'ঈশ্বরের একত্ব' দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। খ্রীষ্টধর্মের সাথে তাঁর প্রথম ঘনিষ্ঠতা ঘটে পঁচিশ বছর বয়সে খাদিজার সঙ্গে বিয়ের পর। খাদিজার খ্রীষ্টান চাচাত ভাই ওয়ারাকা বিন নওফেলের মাধ্যমে খ্রীষ্টতত্ত্ব সম্পর্কে ছিল খাদিজার ঘনিষ্ঠতা। ওয়ারাকা এমনকি বাইবেলের 'গসপেল'- এর একটা অংশ আরবীতে অনুবাদ করেছিলেন। ইবনে ইসহাক লিখেছেন: 'ওয়ারাকা খ্রীষ্টানত্বের সাথে নিজেকে জড়িত করেন এবং পুরোপুরি পাণ্ডিত্য অর্জন না করা পর্যন্ত খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন।'[97] উপরে বলা হয়েছে যে, তিনিই প্রথম মুহাম্মদকে নিশ্চয়তা দেন যে তিনি জিব্রাইলের মারফত ঈশ্বরের ঐশীবাণী পেয়েছেন এবং মুহাম্মদকে নবীত্বের মিশনে উদ্বুদ্ধ- করণে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। খাদিজার এক দাস জায়েদ বিন হারিথা, যাকে মুহাম্মদ পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, তিনিও সিরিয়ার এক খ্রীষ্টান ছিলেন।

পঁচিশ বছর বয়সে খাদিজার বাণিজ্য কাফেলার দায়িত্বভার নিয়ে মুহাম্মদ সিরিয়ায় বাণিজ্য যাত্রা কালে সেখানে তিনি আরেক নেস্টোরিয়ান মঠাধ্যক্ষের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। বলা হয়, নাস্তর বা নেস্তুর নামক এ মঠাধ্যক্ষ নাকি মুহাম্মদকে এক নবী হিসেবে আলিঙ্গন করেন।[98] অন্যত্র মুসলিম লেখক হুসাইন বলেন যে, মুহাম্মদ একসময় প্রত্যেক বিকেলে তাউরাত ও ইন্‌জিল (গস্‌পেল) শ্রবণের উদ্দেশ্যে এক খ্রীষ্টানের কাছে যেতেন।[99] ইসলামের সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, ওয়ারাকা ও খাদিজা মুহাম্মদকে মক্কাবাসী এক খ্রীষ্টান মংক- এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এমন এক খ্রীষ্টান মংক ছিলেন আদ্দাস, যিনি বর্তমান ইরাকের নিনেভ থেকে এসে মক্কায় বসবাস করছিলেন। খাদিজা মুহাম্মদকে একবার আদ্দাসের কাছে নিয়ে যান, যিনি দীর্ঘ আলোচনায় নবীদের কাছে ঐশীবাণী আনয়নে ফেরেশ্‌তা জিব্রাইলের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন।

---

97. Ibid, p. 99
98. Muir, p. 21
99. Walker, p. 190

খ্রীষ্টান ধর্মের সাথে মুহাম্মদের অন্যান্য ক্ষেত্রে যোগাযোগের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করেছেন বেঞ্জামিন ওয়াকার।[100] জনৈক তামিম আল দা'রী ছিলেন এক খ্রীষ্টান। কেয়ামতের দিন বিশ্ব ধ্বংস ও পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে তিনি মুহাম্মদকে ধারনা দেন। আব্দুল কাইস গোত্রের কাইস ছিলেন আরেক খ্রীষ্টান, যার বাড়ীতে মুহাম্মদ প্রায়ই যেতেন। পেশায় তলোয়ার প্রস' তকারী জাবরা নামক এক তরুণ গ্রীক খ্রীষ্টান মক্কায় বাস করতেন। তাওরাত ও যীশুর শিক্ষা সম্বন্ধে তার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল এবং মুহাম্মদ প্রায়শঃ তার বাড়ীতে যেতেন। মুহাম্মদ আবু তাখিবা নামক জনৈক গ্রিক খ্রীষ্টানের বাড়ীতেও যেতেন মাঝে মাঝে। আবু রোকাইয়া নামক তামিম খ্রীষ্টগোত্রের এক ব্যক্তি সততার জন্য বিশেষ খ্যাত ছিল। স্বার্থহীনতা ও ধর্মে আত্মোৎসর্গের কারণে তাকে 'জনগণের মঠাধ্যক্ষ বা মংক' উপাধি দেয়া হয়েছিল। মুহাম্মদ তাঁর সান্নিধ্যেও আসেন ও পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। মুহাম্মদের সমসাময়িকরা মনে করতেন যে ইয়ামামার জনৈক রহমান তাঁকে কিছু খ্রীষ্টান ধারণা দিয়েছিলেন। ইবনে ইসহাক জানান যে, ইয়ামামার জনৈক রহমানের সাথে মুহাম্মদের যোগাযোগ ছিল। অন্যান্য আলোচকরা রহমানকে মূসাইলিমা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মূসাইলিমা ছিলেন নবীত্ব দাবীকারী ইয়ামামার এক বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক। মুহাম্মদের মৃত্যুর পর মূসাইলিমা ইসলামের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। এরপর মুসলিম ও মূসাইলিমার অনুসারীদের মধ্যে কয়েকটি রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয় ও পরিশেষে মূসাইলিমা নিহত হন (পরে আলোচিত)।
বহিরাঞ্চলের খ্রীষ্টানদের সঙ্গেও মক্কার যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল। আরব অঞ্চলের কয়েকটি খ্রীষ্টান গোত্র মক্কায় বাণিজ্যিক ডিপো স্থাপন করে সেখানে তাদের প্রতিনিধি রেখেছিল। ওয়াকার জানান: সাহ্ম কুরাইশ গোত্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ 'ইজ্ল' ও জুহ্রা কুরাইশ গোত্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ 'ঘাসান' ছিল এমন দুটো খ্রীষ্টান গোত্র, যারা কা'বার আঙ্গিনায় বাণিজ্য ডিপো স্থাপনের সুবিধা পেয়েছিল। ওয়াকার আরও জানান: এছাড়াও মক্কায় খ্রীষ্টানদের একটা ক্ষুদ্র অথচ প্রভাবশালী জনসংখ্যা ছিল - যারা ছিল আরব ও বহিরাগত, দাস ও মুক্ত মানুষ এবং আবিসিনিয়া, সিরিয়া, ইরাক বা প্যালেস্টাইন থেকে আসা। তারা

[100]. Ibid, p. 190-91

শিল্পী, রাজমিস্ত্রি ব্যবসায়ী, চিকিৎসক ও খোদাইকরের কাজ করতো। কোন কোন মুসলিম উপাখ্যান লেখকরা মক্কায় একটা খ্রীষ্টান কবরস্থানের উপস্থিতির কথাও লিখেছেন।[101]

মনিবাদের প্রভাব: মনিবাদ ছিল পারস্যের একতাবা'য় মনি (মৃত্যু ২৭৬) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রচলিত খ্রীষ্ট, জরথুষ্ট্রবাদ ও বৌদ্ধ ধারণার সংমিশ্রণে সৃষ্ট একটি বিপথগামী ধর্ম সমপ্রদায়। মুহাম্মদের সময় এ মতবাদ হিরা'য় (মেসোপটেমিয়ায়) বেশ প্রসার লাভ করে। মক্কার সঙ্গে হিরা'র জোরদার বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকায় মনিবাদ নিঃসন্দেহে মক্কাতেও পৌঁছেছিল। মনি দাবী করতেন যে, তিনি নিজেই প্যারাক্লিট বা দৈব- সত্তা, যার আগমনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যীশু। মনি দাবী করতেন যে, তিনিই সর্বশেষ নবী ও সৃষ্টিকর্তার নিকট থেকে প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত। মনি বলতেন: যীশু ক্রুশবিদ্ধ হননি; তাঁর পরিবর্তে অন্য একজন ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিল। মনিবাদের এ মৌলিক বিশ্বাসগুলো নিঃসন্দেহে মুহাম্মদকে প্রভাবিত করেছিল এবং ইসলামে সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হিসেবে স্থান পেয়েছে।

নেস্টোরিয়ান প্রভাব: নেস্টোরিয়াবাদ হল নেস্টোরিয়া (মৃত্যু ৪৫১) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আরেকটি খ্রীষ্টান সমপ্রদায়। নেস্টোরিয়া ছিলেন কনস্টানটিনোপলের (ইস্তাম্বুলের) বিশপ। মুহাম্মদের সময় নেস্টোরিয়াবাদ পারস্যে প্রসার লাভ করে মক্কা পর্যন্ত পৌঁছেছিল। উপরে নেস্টোরিয়ান সন্ন্যাসী বা মঠাধ্যক্ষের সঙ্গে মুহাম্মদের সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নেস্টোরিয়ানরা ছিলেন আচারসিদ্ধ, বিশুদ্ধতাবাদী এবং যীশু ও তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার প্রতিমা বা প্রতিচ্ছবি প্রদর্শনের বিরোধী, যে ধারণাগুলো ইসলামে গভীর রেখাপাত করেছে। এর প্রতিফলন ঘটে ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে একটি ডেনিস পত্রিকায় মুহাম্মদের প্রতিচ্ছবি প্রকাশকে কেন্দ্র করে। এর প্রতিবাদে মুসলিমরা ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে ব্যাপক সহিংস বিক্ষোভ করে যাতে অনেক প্রাণহানি ঘটে। ইসলামে জীবন্ত প্রাণীর ছবি অঙ্কন, বিশেষ করে নবী মুহাম্মদের মূর্তি বা ছবি নিষিদ্ধ।

খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুদের প্রভাব

---

[101]. Ibid, p. 180

ঐ সময়ের যোগী বা তপস্যাকারী খ্রীষ্টান ভিক্ষুরাও মুহাম্মদের ধর্মীয় চেতনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ইসলামী ও পৌত্তলিক ইতিহাসবিদদের তথ্যমতে, সে সময়ে খ্রীষ্টান মংক বা ভিক্ষুরা মিসর, এশিয়া মিনর (বর্তমান তুরস্ক), সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মেসোপটেমিয়া ও আরবের সড়কপথের ধারে ধারে সন্ন্যাসী সমপ্রদায় ও আশ্রম গড়ে তুলেছিল। তারা নিজেদেরকে ভালো কাজে, দাতব্য কর্মে এবং দরিদ্র, রোগী ও শিশু, বিশেষত এতিম নারী শিশুদের পরিচর্যায় উৎসর্গ করেছিল। রাত্রিকালে পরিশ্রান্ত বাণিজ্য-কাফেলা ও পর্যটকরা এসব সন্ন্যাসী মঠগুলোতে যাত্রাবিরতি করতো। সন্ন্যাসীরা পথচারীদেরকে আশ্রয় ও আতিথ্যের সাথে স্বাগত জানাতো। মুহাম্মদ যেহেতু এ অঞ্চলের বিভিন্ন ব্যবসাকেন্দ্রে ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রচুর যাতায়াত করতেন, তিনি অবশ্যই সে আশ্রমের সাথে পরিচিত ছিলেন ও তাঁদের আতিথেয়তা গ্রহণ করেছিলেন। সিরিয়ায় বাণিজ্য সফরে মংক বাহিরা কর্তৃক কিশোর মুহাম্মদ নানা সুখাদ্যে আপ্যায়িত হয়েছিলেন।[102] বুঝা যায় যে, এসব মঠবাসী খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীরা মুহাম্মদের মনে দারুণ ইতিবাচক রেখাপাত করেছিল, যার কারণে কুরআনে তিনি তাদের জীবনধারার সম্মানজনক স্বীকৃতি দেন এভাবে:

১. ভাল কাজে অর্থ ব্যয় করো: তোমাদের পিতামাতার, পরিবারের, এতিম শিশুদের, পথচারীদের ও অভাবীদের সাহায্যার্থে" (কুরআন ২:২১৫)।

২. পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম শিশু, অভাবী, প্রতিবেশী ও ভ্রমণকারীদের প্রতি দয়া পরবশ হও (কুরআন ৪:৩৬)।

খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের থেকে মুহাম্মদ ইসলামের আরেকটি প্রধান বিষয় গ্রহণ করেন, তা হলো প্রার্থনা বা নামাজের অনুষ্ঠানাদি। যৌনতা বর্জনকারী খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীরা দিনে বেশ কয়েকবার প্রার্থনায় রত হতেন। তাদের শ্রদ্ধা-মিশ্রিত প্রার্থনা বা নামাজের ভঙ্গি বা অঙ্গবিন্যাস ছিল: দুই হাত একত্র করে দাঁড়ানো, আনত হওয়া, হাঁটুতে ভর দিয়ে নত হওয়া ও গোড়ালির উপর বসা। মুহাম্মদ নিশ্চয়ই সন্ন্যাসীদের অনুকরণে ইসলামের নামাজের রীতি প্রবর্তন করেছিলেন। সি. জে. আর্চার-এর লেখা 'মিস্টিক এলিমেন্ট ইন মুহাম্মদ' (১৯২৪) অনুযায়ী, খ্রীষ্টান

---

[102]. Al-Tabira, Vol. VI, p. 44-45; Ibn Ishaq, p. 80

ভিক্ষুরা শেষ রাত্রির দিকে নামাজ বা প্রার্থনায় রত হতেন এ বিশ্বাসে যে, 'ঘুমের চেয়ে প্রার্থনা বা নামাজ ভাল।'[103] ভোরবেলায় নামাজের জন্য মুসলিমদের আহ্বানের 'আযান'-এ বাক্যটি সংযোজন করা হয়েছে। এসব খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের জীবনধারা, যেমন তাদের ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা, তাদের বদান্যতা ও দাতব্য কর্মের প্রতি মুহাম্মদ এতটাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যে, তিনি অত্যন্ত সম্মানের সাথে সেগুলোকে কুরআনে উল্লেখ করেন: 'ধর্মগ্রন্থের অনুসারীদের মধ্যে (খ্রীষ্টান) একটা সাধু বা ন্যায়পরায়ণ দল রয়েছে; তারা রাত্রিকালে আল্লাহর বাণী আবৃত্তি করে ও (ঈশ্বরকে) ভক্তি করে, ভাল কাজে নিযুক্ত ও খারাপ কাজ থেকে বিরত হয়; তারা ভাল কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে পরস্পরের সাথে হাত মেলায়; তারা ভালদের মধ্যে' (কুরআন ৩:১১৩-১৪)। কিন্তু নবুয়তীর মিশন শুরুর আগেই বিবাহ করে সংসার জীবনে জড়িত হয়ে পড়ায় মুহাম্মদ পরে সন্ন্যাসবাদের নিন্দা করেন। তিনি বলেন: সন্ন্যাসবাদ ঈশ্বর নির্দেশিত নয়, খ্রীষ্টানদের উদ্ভাবন মাত্র (কুরআন ৫৭:২৭)।

মক্কায় খ্রীষ্টানত্ব প্রবর্তনে উসমান ইবনে হুয়ারিথ-এর প্রয়াস

এখানে আরেক ব্যক্তির উল্লেখ বিশেষ দাবী রাখে। তিনি হলেন উসমান ইবনে হুয়ারিথ (হুবেরিখ), যিনি ছিলেন মক্কার এক প্রভাবশালী নেতা ও মুহাম্মদের প্রথম স্ত্রী খাদিজার চাচাত ভাই। ইবনে ইসহাক জানান, উসমান বহুঈশ্বরবাদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। কা'বায় ঘটাপূর্ণ পৌত্তলিকতার চর্চায় ত্যক্ত হয়ে হুয়ারিথ বাইজেনটাইন সাম্রাটের দরবারে (ইস্তাম্বুলে) যান ও খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। সেখানে তাকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করা হয়।[104] মুহাম্মদের নবীত্ব শুরুর প্রায় পাঁচ বছর আগে, ৬০৫ সালে, উসমান মক্কায় ফিরেন। মক্কার বহুঈশ্বরবাদ সংস্কারের লক্ষ্যে বাইজেনটাইন সম্রাটের আশীর্বাদের সূত্রে উসমান নগরীর গভর্নর পদ দাবী করেন। কিন্তু মক্কার শাসকদের বিরোধিতার মুখে তাকে সিরিয়ায় পলায়ন করতে হয় ও পরে সেখানে তিনি খুন হন।[105]

ওকায মেলায় কিস ইবনে সাইদা'র ধর্মোপদেশ

---

103. Walker, p. 62
104. Ibn Ishaq, p. 99
105. Walker, p. 66

জানা যায় যে, মুহাম্মদ মক্কার নিকটবর্তী ওকাযে বার্ষিক মেলায় ধর্মোপদেশের সভাগুলোতে যোগ দিতেন। ওকায মেলায় কিস ইবনে সাইদার ('কিস' অর্থ 'যাজক') সঙ্গে মুহাম্মদের সাক্ষাৎ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইসলামী সাহিত্যে বর্ণিত হয়েছে যে, মুহাম্মদের নবীত্ব শুরুর কিছুকাল আগে নাজরানের আইয়াদ গোত্রের বিশপ কিস ইবনে সাইদা মেলায় ধর্মোপদেশ দিতেন। তিনি 'প্রায় ভাবাবিষ্ট' হয়ে তৎকালীন আরব কবিতার ধরনে ধর্মীয় বক্তব্য দিতেন, কুরআনের প্রথম দিককার সূরাগুলোর ধরনের সাথে যার মিল রয়েছে। তার একটি ধর্মোপদেশ ছিল এরূপ:

হে জনগণ, কাছে এসো / এবং শোন ও ভয় করো / সংকেতসমূহ অনুধাবনের জন্য / অস্বীকার করার জন্য নয় / নক্ষত্রসমূহ উঠে ও অস্ত যায় / সাগর কখনও না শুকায়।

এবং উপরে ছাদের ন্যায় আকাশ / নীচে শুয়ে আছে ধরিত্রী / বৃষ্টি ঝরে / গাছপালা খায় / নারী ও পুরুষের বিয়ে হয়।

সময় চলে যাচ্ছে, সময় পালিয়ে গেছে / ও মরণশীলরা, বলো: / গোত্রগুলো আজ কোথায় / যারা এক সময় অবাধ্যতা দেখিয়েছিল / ঈশ্বরের নিয়মের / আজ তারা কোথায়?

নিশ্চয়ই আল্লাহ দেন / আলো তাদেরকে, যারা চায় সুপথের জীবন।

অতঃপর বিশপ মানবীয় নশ্বরতা, ঈশ্বরের বদান্যতা ও আগামী 'শেষ বিচারের দিন' সম্বন্ধে প্রচারে প্রবৃত্ত হন। মুহাম্মদ তার ধর্মোপদেশ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনেন ও গভীরভাবে প্রভাবিত হন। এটা মুহাম্মদের মন ও আত্মাকে আলোড়িত করে তুলে যে সম্পর্কে বিখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত আল-জাহিজ (মৃত্যু ৮৬৯) এক হাদীসে লিখেন যে: মুহাম্মদ কী স্বচ্ছতার সাথে স্মরণ করতেন সে দৃশ্যটি, মানুষটি, তাঁর আলঙ্কারিক ভাষা ও প্রত্যয় উৎপাদক বার্তা। কয়েক বছর পর যখন আইয়াদ গোত্রের প্রতিনিধিরা মক্কা সফরে আসেন, মুহাম্মদ তাঁদের কাছে কিস সাইদা সম্পর্কে জানতে চান। তাঁরা জানান যে, তিনি ৬১৩ সালের দিকে মারা গেছেন। এ খবরে নবী গভীর দুঃখ প্রকাশ করে ও কিস সাইদার প্রতি দয়ার মনোভাব নিয়ে বলেন: তিনি ছিলেন এমন এক ব্যক্তি, যিনি 'প্রকৃত সর্বজনীন ধর্মবিশ্বাস' প্রচার করতেন।[106]

---

[106]. Ibid, p. 90

ওকায মেলায় ইহুদী ধর্ম প্রচারকরাও ধর্মোপদেশ দিতেন। উভয় ধর্মের প্রচারকগণ আরব গোত্রগুলোর প্রতি রাগ দেখাত, পৌত্তলিকতা চর্চার জন্য তাদেরকে ধিক্কার দিত ও নরকের আসন্ন ভয়ঙ্কর শাস্তির ভয় দেখিয়ে হুঁশিয়ার করত। মুহাম্মদ সে মেলায় যেতেন এবং খ্রীষ্টান ও ইহুদী ধর্মপ্রচারকদের বক্তব্য শুনতেন। খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের পরস্পরের মাঝে বৈরিভাব থাকলেও, ধর্ম দু'টোর মধ্যে সাদৃশ্য - যেমন উভয় ধর্মে একটিমাত্র ঈশ্বর, উভয়েরই আসমানী কিতাব ও নিজস্ব নবী, উভয়েরই পৌত্তলিকতার নিন্দা এবং অবশ্যই তাদের ধর্মোপদেশে নরকে আসন্ন শাস্তির ভয় ইত্যাদি - তরুণ মুহাম্মদের মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করত।

মুহাম্মদের ধর্মে অন্যান্য বিশ্বাস ও উপকথার প্রভাব

মুহাম্মদের নবুয়তী মিশনের ভিত্তি সম্বন্ধে আরো স্পষ্ট ধারণার জন্য আমরা এখানে কিছুটা প্রসঙ্গের বাইরে যাব অন্যান্য ধর্মবিশ্বাস, প্রথা ও উপকাহিনীর আলোচনায়, যা প্রেরণা যুগিয়েছিল ও বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল মুহাম্মদের ধর্মতত্ত্বকে সূত্রবদ্ধ করতে।

হানিফদের প্রভাব: এক্ষেত্রে হানিফ সম্প্রদায়ের জায়েদ ইবনে আমর-এর প্রভাব উল্লেখের দাবী রাখে। 'হানিফ' ছিল সিরীয় খ্রীষ্টান শব্দ, যার অর্থ: যে ব্যক্তি পৌত্তলিকতা ত্যাগ করেছে। মুহাম্মদের সময়ে আরবে এ শব্দটা অনেক ক্ষেত্রে ইহুদী, খ্রীষ্টান, জরথুষ্ট্রবাদী ও সাবিয়ান একেশ্বরবাদীদেরকে বুঝাতে ব্যবহৃত হতো। মক্কায় এ শব্দটি যারা বিশেষতঃ খ্রীষ্টান ও ইহুদী প্রভাবে পৌত্তলিকতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল বা পৌত্তলিকতাকে একেশ্বারবাদে সংস্কারের চেষ্টা করছিল, তাদেরকে বুঝাত। ইবনে ইসহাক মক্কার 'হানিফ'দের বিশ্বাস সম্পর্কে বলেন:[107]

তারা বিশ্বাস করতো যে, তাদের লোকেরা পিতা ইব্রাহীমের ধর্মকে কলুষিত করেছে; এবং পাথর (অর্থাৎ কা'বার কালোপাথর)-এর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণের কোন মূল্য নেই; এটা না পায় শুনতে, না পায় দেখতে, না পারে সাহায্য করতে। তারা বলতো: "নিজেদের জন্যে একটা ধর্ম খোঁজ; কারণ ঈশ্বরের দোহাই! তোমাদের ধর্ম কোন ধর্ম

---

[107]. Ibn Ishaq, p. 99

নয়। সুতরাং তারা পথে বেরিয়ে পড়ে ইব্রাহীমের ধর্ম হানিফিয়া'র খোঁজে।
জায়েদ ছিলেন মুহাম্মদের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ও ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ওমরের চাচা। তিনি নিজেকে ইব্রাহীমের ধর্মের অনুসারী বলে আখ্যায়িত করতেন ও তাঁর গোত্রের পৌত্তলিকতা চর্চাকে নিন্দা করে কবিতা লিখতেন। তিনি মেয়ে- শিশুদের হত্যার নিন্দা করতেন। প্রতি বছর রমজান মাসে তিনি হীরা পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন হতেন।
৫৯৫ সালের দিকে মুহাম্মদ (বয়স ২৪- ২৫) পথিমধ্যে জায়েদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং কথার ফাঁকে মূর্তিদেবীকে উৎসর্গ করা একটা প্রাণীর মাংস দেন। জায়েদ সে মাংস নিতে অস্বীকার করে মুহাম্মদকে মূর্তিপূজা করার জন্য ধমক- ধামকি দেন ও পৌত্তলিক ঈশ্বরকে উৎসর্গ করা খাদ্য খাওয়ার জন্য তিরস্কার করেন। পরে মুহাম্মদ বলেন: 'এর পর আমি কখনও জেনেশুনে কোনও মূর্তিকে স্পর্শ করিনি বা তাদের উদ্দেশ্যে কোনও পশু উৎসর্গ (কুারবানী) করিনি।' জায়েদ কা'বা প্রাঙ্গনে বসে বসে প্রার্থনা করতেন: হে ঈশ্বর! আমি জানি না কিভাবে তুমি পূজিত হতে চাও। জানলে আমি নিশ্চয়ই তোমার পূজা করতাম। জনগণের বিদ্রূপে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি এ ব্যাপারে রাব্বী ও মঠাধ্যক্ষদেরকে প্রশ্ন করার জন্য প্রথমে সিরিয়ায় ও পরে ইরাকে যান। ৬০৮ সালে মক্কায় ফেরার পথে তিনি গুণ্ডাদের হাতে নিহত হন।[108]
মুহাম্মদ জায়েদের মতবাদ ও রীতিনীতি দ্বারা এমন প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, তিনি সেগুলোকে পরবর্তীতে ইসলামে অঙ্গীভূত করেন। বস্তুতঃ মুহাম্মদ শুরুতে তাঁর শিষ্যদেরকে হানিফ[109] বলে আখ্যায়িত করতেন। কুরআন এ ব্যাপারে বলে যে, মুহাম্মদ কেবল ইব্রাহিমের মৌলিক ও বিশুদ্ধ ধর্ম (একেশ্বরবাদ) প্রচার করছেন (কুরআন ২১:৫১), যিনি বহুঈশ্বরবাদী ছিলেন না (কুরআন ১৬:১২৩)। অর্থাৎ ইব্রাহীম ছিলেন একজন হানিফ।[110] কুরআনের পরবর্তি এক আয়াতে (৩:৬৭) তিনি 'মুসলিম' শব্দটি সন্নিবেশ করেন, এবং তখন থেকে ইব্রাহীম হয়ে যান একজন মুসলিম ও হানিফ (অর্থাৎ বহুঈশ্বরবাদী নন)।

---

108. Ibid, p. 99-103, Walker, p. 89
109. Those not Polytheists in Mecca were called Hanif.
110. Ibn Ishaq, p.100

মুহাম্মদের ধর্মানুসারে তাঁর আপন পিতামাতা ও প্রিয় চাচা আবু তালিব সহ সকল অমুসলিম দোজখের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। অথচ ব্যতিক্রমীভাবে তিনি জায়েদের উপর ঈশ্বরের ক্ষমার কথা বলেন। ইবনে ইসহাক লিখেছেন, মুহাম্মদকে যখন প্রশ্ন করা হয়: জায়েদের জন্য কি আমরা ঈশ্বরের ক্ষমা প্রার্থনা করব? তিনি উত্তর করেন: হ্যাঁ, কারণ তিনি সমস্ত মানুষের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে মৃতদের মধ্য থেকে উত্থিত হবেন।"[111] নবী আরও বলেন: 'তিনি জান্নাতগামীদের একজন। আমি তাকে সেখানে দেখেছি।[112] এ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মুহাম্মদ ও তাঁর ধর্মমত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জায়েদ বিন আমর (এবং সাধারণভাবে হানিফা তত্ত্বের)- এর বিরাট প্রভাব ছিল।

অন্যান্য একেশ্বরবাদের প্রভাব

স্পষ্টতঃই মুহাম্মদের ধর্মমত সূত্রবদ্ধ করণে খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের সবচেয়ে বড় প্রভাব ছিল। আরব অঞ্চলে আরও একেশ্বরবাদী ধর্মমত বিদ্যমান ছিল, যেমন পারস্যের অগ্নিপূজক 'জরথুষ্ট্রবাদ' (অর্থাৎ পার্শী) ও নক্ষত্রপূজক 'সাবিয়ানবাদ' এবং সেগুলোও মুহাম্মদকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি সেসব ধর্মের কিছু কিছু চিন্তাধারা ও আইন ইসলামে অঙ্গীভূত করেছেন। ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের পাশাপাশি, কুরআন সাবিয়ানদেরকেও আসমানী কিতাবভুক্ত মানুষরূপে উল্লেখ করেছে এবং জরথুষ্ট্রবাদী (মাজদা/মেজিয়ান)- দের প্রতিও আনুকূল্য প্রকাশ করেছে (কুরআন ২২:১৭)। তিনি জরথুষ্ট্রবাদের বেহেশ্ত ও দোযখের ধারণা ইসলামে অঙ্গীভূত করেন। কুরআনে ৭১:১৫ নং আয়াতে 'নক্ষত্রের উপর শপথ' সুস্পষ্টরূপে সাবিয়ান ধর্মের প্রভাব পরিদৃষ্ট করে।

বহুঈশ্বরবাদের প্রভাব

ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের বড় কেন্দ্র কা'বার সান্নিধ্যে লালিত মুহাম্মদের ভেতরেও ধর্মানুরাগ গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। যে বহুঈশ্বরবাদী ধর্ম ও প্রথার মাঝে তিনি বেড়ে উঠেন, সেগুলোর চিহ্নও তাঁর নতুন ধর্মে প্রতিফলিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, 'হজ্জ' ও 'ওমরাহ্' ছিল কা'বায় বহুঈশ্বরবাদী তীর্থযাত্রীদের ধর্মীয় আচার, যা তিনি সামান্য পরিবর্তন করে ইসলামে অঙ্গীভূত করেন। যেমন হজ্জের ক্ষেত্রে মুহাম্মদ

---

[111]. Ibn Ishaq, p. 100

[112]. Walker, p. 90

শুধু এইটুকু পরিবর্তন করেছেন যে, এখন পশু উৎসর্গ (কুরবানী) করা হয় অদৃশ্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে, যা এর আগে পৌত্তলিকরা উৎসর্গ করতো মূর্তিদেবদেবীর উদ্দেশ্যে।

মুহাম্মদের জীবন্তকেন্দ্রিক ঘটনাসমূহের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ স্পষ্ট করে তোলে যে, তৎকালে বিদ্যমান একেশ্বরবাদে একটিমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা তাঁকে বিশেষ প্রভাবিত করেছিল। ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মবিশ্বাসী ও প্রচারকদের সাথে আলাপ-আলাচনা ও সান্নিধ্য তাঁর মনকে একেশ্বরবাদে অনুপ্রাণিত করেছিল। এসব ধর্মে ঈশ্বরের কঠোর বিচার এবং নরকে ভয়ঙ্কর শাস্তির ধারণা নিশ্চয়ই মৃত্যু পরবর্তী ঈশ্বরের শাস্তির ভয়ে তাঁর মনে ভীতির সঞ্চার করেছিল। কুরাইশদের পৌত্তলিক বিশ্বাসে এমন ভয়ঙ্কর বিচার ও শাস্তির ধারণা ছিল না। মুহাম্মদের নবুয়তী শুরুর মাত্র পাঁচ বছর আগে মক্কার বহুঈশ্বরবাদকে খ্রীষ্টধর্মের একত্ববাদে রূপান্তর করতে হুয়ারিথের ব্যর্থ মিশনটিও অবশ্যই মক্কার পথভ্রষ্ট পৌত্তলিকদের মাঝে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠায় তাঁকে সুদৃঢ় প্রেরণা দিয়েছিল।

ইসলামে খ্রীষ্টান ধারণা

স্পষ্টত নবী মুহাম্মদ খ্রীষ্টধর্ম দ্বারা ভীষণ প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁর নতুন ধর্ম প্রচার শুরু করার আগে সম্ভবত খ্রীষ্টধর্মে প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন; কুরআনে খ্রীষ্টধর্মের অনেক ধারণা আল্লাহর ঐশীবাণীরূপে অনুকৃত হওয়া সেটি প্রতীয়মান করে। নবী স্পষ্টতঃই খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের প্রার্থনা বা নামাজের প্রচলিত ধরন বা রীতি নকল করেছিলেন। ৬১৫ সালে মুহাম্মদ যখন তাঁর কয়েকজন অনুসারীকে আবিসিনিয়ায় বসবাসের জন্য পাঠান, তখন সেখানকার খ্রীষ্টান রাজা তাদেরকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন। আল তাবারীর মতে, ওসব পরবাসীরা পরে জানান: আমরা আবিসিনিয়ায় গেলে উত্তম আতিথেয়তা সহকারে আশ্রয় পাই। আমাদের ধর্ম চর্চায় নিরাপত্তা ছিল' এবং কোনরকম কটু কথা শুনতে হয় নি বা কোনরূপ নির্যাতন ভোগ করতে হয় নি।[113] এ ঘটনা মুহাম্মদের মনে স্পষ্টতঃ খ্রীষ্টানত্ব সম্পর্কে অনুকূল মনোভাবের জন্ম দিয়েছিল, যা বুঝা যায় এরপর থেকে প্রেরিত আল্লাহর আয়াতগুলোতে খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের সম্পর্কে প্রশংসাসূচক দৃষ্টিভঙ্গির

---

[113]. Al-Tabari, Vol. VI, p. 99

প্রকাশে। এ প্রবণতা মুহাম্মদের মদীনায় স্থানান্তর হওয়ার এক বছর পর পর্যন্ত বলবত থাকে।

উদাহরণস্বরূপ, কুরআনে আল্লাহ যীশুকে সম্বোধন করে বলেন: 'তোমাকে যারা অনুসরণ করে তাদেরকে আমি শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের চেয়ে অধিকতর মর্যাদাবান করব' (কুরআন ৩:৫৫)। কুরআন এটাও বলে যে, খ্রীষ্টানরা অহঙ্কারমুক্ত ও মুসলিমদের প্রতি অত্যন্ত বন্ধু ভাবাপন্ন' (কুরআন ৫:৮২), যা মুসলিম পরবাসীদের প্রতি আবিসিনিয়ার খ্রীষ্টান রাজার সহানুভূতি ও আতিথেয়তার বিষয়টি ইঙ্গিত করে। ৬৩০ সালের জানুয়ারিতে মক্কায় বিজয়োল্লসিত প্রবেশের পর মুহাম্মদ কাবার সমস্ত মূর্তি ভেঙ্গে ফেলার এবং দেয়াল ও স্তম্ভে অঙ্কিত শিল্পকর্ম বা ছবি মুছে ফেলার নির্দেশ দেন। উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ সময় আব্রাহাম ইসমাইলের প্রতিচ্ছবি ভেঙ্গে ফেলা হয়। কিন্তু যীশুকোলে মেরীর (মরিয়মের) প্রতিচ্ছবিটির উপর নিজের হাত রেখে নবী তা রক্ষা করেন।

কুরআনে বাইবেল সদৃশ পঙক্তি: মুহাম্মদ খ্রীষ্টান আচার ও ধারণাসমূহ শুধু আত্মস্তই করেন নি, তিনি বাইবেলের কিছু অংশ প্রায় অপরিবর্তিত বা ঈষৎ পরিবর্তিত করে কুরআনে সংযোজন করেন। এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল:[114]

১. 'ন্যায়বানরাই পৃথিবীর অধিকারী হবে' (কুরআন ২১:১০৫); এ আয়াতটি সরাসরি বাইবেল থেকে গৃহীত (সাল্ম ৩৭:২৯)

২. মার্ক- এর গস্‌পেল একটি আয়াতে বলে: 'ধরিত্রী নিজের জন্য নিজ থেকেই ফল আনয়ন করে; প্রথমে পত্র, অতঃপর মঞ্জুরী বা শিষ ও তারপর সেই মঞ্জুরী থেকে পূর্ণাঙ্গ শস্য' (মার্ক ৪:২৪)। কুরআনে এর উপস্থাপনা হয়েছে এভাবে: 'ওগুলো হলো বীজ যা থেকে অঙ্কুর জন্মায়, অতঃপর মঞ্জুরীর মধ্যে তাকে এবং তার বৃদ্ধিকে ঋজু করে এবং বৃন্তের উপর বেড়ে উঠে (কুরআন ৪৮:২৯)।

৩. যীশু বলেছেন: 'একটি উটের সূঁচের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ একজন ধনী ব্যক্তির স্বর্গে প্রবেশের তুলনায় সহজ হবে' (ম্যাথিয়ু১৯:২৪)। কুরআন বলে: 'স্বর্গের দুয়ার খুলবে না তাদের জন্য যারা আমাদেরকে

---

[114]. Ibid, p. 93

মিথ্যা অপবাদ দেয়; সূঁচের ছিদ্রপথে উটের প্রবেশ তাদের স্বর্গ গমনের চেয়ে সহজতর হবে।' (কুরআন ৭:৪০)।

৪. বাইবেল বলে: 'শেষ বিচারের দিন সমগ্র নভোঃমণ্ডল গড়াতে গড়াতে (কাগজের) বেলুনাকার ধারণ করবে' (ঈসাঃ ৩৪:৪)। কুরআন বলে: 'সেদিন আমরা (অর্থাৎ আল্লাহ্) আসমান্তজমিনকে সঙ্কুচিত করব একটা কাগজের বেলুনাকারে' (কুরআন ২১:১০৪)।

৫. বাইবেল বলে: 'যেখানে দুই বা তিন ব্যক্তি মিলিত হয়, আমিও তাদের মধ্যে থাকি' (ম্যাথিয়ু ১৮:২০)। কুরআন বলে: 'তিন ব্যক্তি গোপনে একত্রিত হতে পারে না, কারণ ঈশ্বর সেখানে হন চতুর্থ (ব্যক্তি)' (কুরআন ৫৮:৭)।

৬. বাইবেল বলে: 'যীশু আরো অনেক কিছুই করে গেছেন, তার সবকিছু লিখা হলে আমার ধারণা সমগ্র পৃথিবীও সে বইটি ধারণ করতে পারবে না' (জন ২১:২৫)। কুরআন বলে: 'সমুদ্রের সব পানিও যদি কালি হতো, তাও ঈশ্বরের বাণী লিপিবদ্ধ করতে অপর্যাপ্ত হতো' (কুরআন ১৮:১০৯)।

ইসলামে গৃহীত খ্রীষ্টান পরিভাষা বা শব্দাবলি: ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো পরিভাষাও প্রচলিত খ্রীষ্ট ধর্মীয় পরিভাষা থেকে ধারকৃত। 'ইসলাম' (মুসলিমও)-এর অর্থ 'ঈশ্বরের কাছে নত হওয়া' যার উদ্ভব সেমিটিক স্‌ল্‌ম (SLM) শব্দ থেকে, যা খ্রীষ্ট ধর্মে 'ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ' অর্থে ব্যবহৃত হতো। 'কুরআন' শব্দটির উদ্ভব আরামাইক বা সিরীয় শব্দ 'কেরানা' থেকে, যা তৎকালীন খ্রীষ্টান প্রথানুযায়ী গীর্জায় (চার্চে) ধর্মানুষ্ঠানে 'পবিত্র গ্রন্থ পাঠ' অর্থে ব্যবহৃত হতো। 'সূরা' শব্দটির উদ্ভব হয়েছে খ্রীষ্টধর্মে ব্যবহৃত আরামাইক শব্দ 'সুত্‌রা' থেকে, যার অর্থ ছিল ধর্মগ্রন্থের অংশ বিশেষ। 'আয়াত' (ayat) অর্থ 'ভার্স' বা 'চিহ্ন' (sign), এবং সেটিও খ্রীষ্টান প্রথা থেকে নেয়া হয়েছে। ইসলামের আরও কতকগুলো পরিভাষা সে সময় আরবাঞ্চলের খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীরা ব্যবহার করতো।

কুরআনে যীশু ও বাইবেলের প্রতি সুদৃষ্টি: কুরআন যীশু ও বাইবেলকে যথেষ্ট মর্যাদার আসন দিয়েছে, যার কিছু ধারণা ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে। কুরআন বলে যে, 'ঈশ্বর মানবজাতির জন্য করুণার নিদর্শনরূপে যীশুকে প্রেরণ করেন' (কুরআন ১৯:২১)। কুরআন বলে যে, গস্‌পেল ('ইভান্‌জেল' থেকে 'ইন্‌জিল') একটি স্বর্গীয়

পুস্তক, যা যীশুর উপর নাজীল করা হয় এবং যারা একে অনুসরণ করে তাদের অন্তরে ঈশ্বরের করুণা বা অনুকম্পা বর্ষিত (কুরআন ৫৭:২৭)। কুরআন খ্রীষ্টান গস্‌পেল বা যীশুর উপদেশাবলীকে মানবজাতির দিক নির্দেশক হিসেবে নিশ্চিত করেছে (কুরআন ৩:৩), যা সত্য ধারণ করে (কুরআন ৯:১১১) এবং আলোক ও পথ নির্দেশ দেয় (কুরআন ৫:৪৬)। কুরআন কুমারীমাতা মেরীকে (মরিয়মকে) অত্যন্ত সম্মানিত নারীরূপে গণ্য করে। বিশ্বের সকল নারীর উপরে মেরীকে স্থান দিয়ে কুরআন বলে: তিনি ঈশ্বর কর্তৃক বিশুদ্ধ হয়েছিলেন (কুরআন ৩:৩৭) এবং সে বিশুদ্ধতা বজায় রেখেছিলেন (কুরআন ৬৬:১২)। মেরী ছিলেন একজন সাধিকা নারী (কুরআন ৫:৫৭)। ঈশ্বর তাঁর গর্ভে নিজের তেজ বা সত্তা অন্তর্হিত করেছিলেন (ফুঁ দিয়ে) যীশুকে সৃষ্টির জন্যে; সুতরাং যীশুর জন্ম হয়েছিল ঈশ্বরের সৃজনশীল কর্মরূপে এক অকলঙ্ক কুমারী নারীর গর্ভে ও তাঁর কুমারীত্ব অটুট রেখে (কুরআন ১৯:২১, ২১:৯১)। কুরআন ঘোষণা করে: 'যারা গস্‌পেল (যীশুর ধর্মোপদেশ) অনুসরণ করবে তারা আসমান ও জমীন উভয়েরই প্রাচুর্য্য ভোগ করবে' (কুরআন ৫:৬৯)।

ইসলামে কোনোই নূতনত্ব নেই: উপরোক্ত আলোচনা এটা স্পষ্ট করে তুলে যে, বিভিন্ন ধর্মীয় চিন্তাধারা ও ধর্মচর্চা - যেমন খ্রীষ্টান, ইহুদী, জরথুস্ট্রবাদ, হানিফি, পৌত্তলিক এবং প্রচলিত উপকথা ও পৌরাণিক কাহিনী, যা মুহাম্মদের সময় আরবে প্রচলিত ছিল - তার সবগুলোই কুরআনে স্থান পেয়েছে, তা অবিকৃতভাবেই হোক কিংবা পরিবর্তিতরূপে। বস্তুতঃ হোক ইসলাম আল্লাহ- প্রেরিত ঐশীবাণীতে সৃষ্ট কিংবা মুহাম্মদ কর্তৃক উদ্ভাবিত - কিন্তু এতে প্রায় কোনই নতুনত্ব নেই। ইসলামে সংযোজিত এমন মতবাদ, আচার বা চর্চা খুবই কম, যা সে সময়ে প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাস, সামাজিক রীতি- প্রথা ও জনপ্রিয় পৌরাণিক কাহিনী বা উপকাহিনীগুলোতে বিদ্যমান ছিল না। আল্লাহ ও মুহাম্মদ কেবল বিদ্যমান ধারণা, চিন্তাধারা ও চর্চাসমূহ ইসলামে অঙ্গীভূত করেছেন। এ ক্ষেত্রে ইগ্‌নাস গোল্ডজিহার ও স্যামুয়েল জুয়েমারের মত বিজ্ঞ পণ্ডিতদের মতামত যে মুহাম্মদ কোনও নতুন ধারণার জন্ম দেন নি, বরং তিনি বিদ্যমান ধারণা ও চর্চাসমূহের মিশ্রণে ইসলাম সংকলন করেছিলেন - সেটি সঠিক প্রতীয়মান হয়। এর সাথে একমত হয়ে ইব্‌নে ওয়ারাক লিখেন:

মুহাম্মদ কোন মৌলিক চিন্তাবিদ ছিলেন না; তিনি কোন নতুন নৈতিক তত্ত্ব দেননি, বরং তিনি কেবল বিদ্যমান সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে ধার করেছিলেন। ইসলাম যে (অন্যান্য ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে) সারগ্রহণে সংকলিত তা দীর্ঘদিন স্বীকৃত হয়েছে। এমনকি মুহাম্মদও জানতেন যে ইসলাম কোন নতুন ধর্ম ছিল না, বরং কুরআনে বিধৃত তথাকথিত প্রত্যাদেশ পূর্বে বিদ্যমান ধর্মগ্রন্থসমূহের সত্যতা জ্ঞাপন মাত্র। নবী সব সময় ইহুদী, খ্রীষ্টান ও অন্যান্য মহান ধর্মসমূহের সঙ্গে সম্বন্ধের দাবী করেন।[115]

খ্রীষ্টধর্ম স্পষ্টতঃই মুহাম্মদের ধর্মপ্রচারকে অত্যন্ত অনুপ্রাণিত করেছিল, যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল মক্কার পৌত্তলিকতাকে সংস্কার করা। খ্রীষ্টান মতবাদ ও চর্চাসমূহ ইসলামে সবচেয়ে বেশী অঙ্গীভূত হয়েছে। সুতরাং প্রাচীন খ্রীষ্টানরা যে ইসলামকে তাদের ধর্ম থেকে উদ্ভূত পথভ্রষ্ট এক ধর্ম মনে করতেন, সেটি যথার্থই ন্যায়সঙ্গত ছিল।

কুরআনে খ্রীষ্ট ধর্মের নিন্দা

কুরআনের মোট ১১৪টা সূরা বা অধ্যায়ের মধ্যে প্রায় ২০টি প্রেরিত হয়েছিল মুহাম্মদের নবুয়তীর প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যে। এ আয়াতগুলোতে খ্রীষ্ট ধর্মতত্ত্বের উল্লেখ খুব কম। কেবল ৬১৫ সালে মুহাম্মদ তাঁর কিছু শিষ্যকে খ্রীষ্টান্ত অধ্যুষিত আবিসিনিয়ায় পাঠানোর সামান্য আগে থেকে শুরু করে ও এর পরে রচিত আয়াতগুলোতে বাইবেলের তত্ত্ব ও কাহিনীসমূহের সত্যতা ঘোষণা করতে থাকেন। এ প্রবণতা অব্যাহত থাকে তাঁর মদীনায় স্থানান্তরের অল্পকাল পর পর্যন্ত।

এটাও একটা কারণ হতে পারে যে, মুহাম্মদ যখন দেখলেন মক্কার পৌত্তলিকরা তাঁর ধর্মের পতাকাতলে আসবে না, তখন তিনি দৃষ্টি ফেরালেন খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের প্রতি - এ বিশ্বাসে যে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে স্বীকৃতি দিলে ও তা কুরআনে সংযোজিত করলে তারা ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী হতে পারে। আবিসিনিয়ায় স্বাগত ও আতিথেয়তা প্রাপ্ত মুসলিম শরণার্থীদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা বজায় রাখতেও আবিসিনিয়ার খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ রাখা একটা কৌশলগত প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আবিসিনিয়ার সঙ্গে কুরাইশদের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল। বলা হয় যে, কুরাইশরা আবিসিনিয়ার খ্রীষ্টান

[115]. Ibn Warraq (1995) *Why I am not a Muslim*, Prometheus Books, New York, p. 34

রাজার নিকট একটা প্রতিনিধিদল পাঠায় সেখানে আশ্রিত মুসলিমদের বহিষ্কার বা মক্কায় ফেরৎ পাঠানোর অনুরোধ করে। তারা রাজার কাছে অভিযোগ করে যে, মুসলিমরা একটা বিপথগামী ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করছে। রাজা কোন ব্যবস্থা নেয়ার আগে তাদের ধর্মীয় পথভ্রষ্টতার প্রমাণ চান। মুসলিম শরণার্থীদেরকে রাজদরবারে ডেকে তাদের ধর্মীয় মতবাদের বিষয়ে প্রশ্ন করলে তাদের মুখপাত্র জাফর ধূর্ততার সাথে 'সূরা মরিয়ম' থেকে কিছু অংশ পাঠ করে শোনায়। এ সূরায় খ্রীষ্টান ধর্মবিশ্বাসের সত্যতা জ্ঞাপনপূর্বক কুমারীমাতা মেরি, জন দ্য বাপটিস্ট ও যীশুর অলৌকিক জন্মের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। রাজা এতে সন্তুষ্ট হয়ে মুসলিম শরণার্থীদেরকে বহিষ্কার করতে অস্বীকার করেন।[116]

কুরআনে বেশ কয়েক বছর ধরে খ্রীষ্টধর্মের সত্যতা জ্ঞাপন করে তাদেরকে ইসলামে আহবান করলেও খ্রীষ্টানরা (ইহুদীরাও) উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় তাঁর ধর্মে যোগ দেয় নি। মদীনায় পুনর্বাসিত হওয়ার পর প্রায় এক বছর পর্যন্ত মুহাম্মদ খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের ইসলামে আনয়নের চেষ্টা অব্যাহত রাখেন, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। বরঞ্চ তাঁর আয়াতগুলোতে তাদের ধর্ম সম্পর্কে অনেক ভুল তথ্য থাকায় তারা মুহাম্মদকে হয়রানি করতে শুরু করে (ইহুদীদের কর্তৃক হয়রানির আলোচনা হয়েছে উপরে)। তারা মুহাম্মদের বিশিষ্ট সমালোচক ও জ্বালাতনকারী হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তাদের প্রতি নবীর মনোভাব কঠোর হতে শুরু করে। খ্রীষ্টান ও ইহুদী ধর্ম থেকে প্রচুর ধার করা সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণে তাদের উদাসীনতার কারণে তিনি এখন তাদেরকে নিন্দা করতে দ্বিধা করেন না। তিনি খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে তাদের ধর্মগ্রন্থ ভুল বুঝা কিংবা বিস্মৃত হওয়ার অভিযোগ তুলেন (কুরআন ৫:১৪)। 'ট্রিনিটি' তত্ত্ব সম্পর্কে আপন ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে (তিনি মনে করতেন খ্রীষ্টানরা 'তিন ঈশ্বরে' বিশ্বাস করে) তিনি খ্রীষ্টানদের আক্রমণ করেন: 'অবশ্যই তারা নাস্তিক, যারা বলে যে ঈশ্বর তিন জনের মধ্যে তৃতীয়' (কুরআন ৫:৭৩); এবং পরামর্শ দেন: 'সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত বার্তাবাহককে বিশ্বাস করো এবং তিন (ঈশ্বর)- এর কথা বলো না' (কুরআন ৪:১৭১)।

---

116. Walker, p. 109

ইহুদীদের চিন্তাধারার মত মুহাম্মদ এবার যীশুর ঐশ্বরিকতা ও পুনরুত্থানের তত্ত্ব অস্বীকার করেন। কুরআন বলে: 'যীশু ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন না, কারণ ঈশ্বর জন্ম দেন না' (কুরআন ১১২:৩)। আরেক আয়াত বলে: 'সন্তান জন্ম দেওয়া আল্লাহর মহানত্বের সঙ্গে মানানসই নয়' (কুরআন ১৯:৩৬)। আল্লাহ আরো বলেন: 'ঈশ্বরের সন্তান থাকা তাঁর গৌরবকে হীন করে' (কুরআন ৪:১৭১)। ইবনে ইসহাক একটা কাহিনী বর্ণনা করেছেন, যেক্ষেত্রে মুহাম্মদ দু'জন খ্রীষ্টধর্ম যাজককে ঈশ্বরের পুত্র আছে এমন বিশ্বাস করায় তিরস্কার করেন। তখন তারা তাঁকে প্রশ্ন্ করেন: 'তাঁর পিতা কে ছিলেন, মুহাম্মদ?'

তিনি নিজে ছিলেন কুমারীমাতা মেরীর গর্ভে যীশুর জন্মের সত্যতা জ্ঞাপনকারী। তাদের এ আকস্মিক ও কঠিন প্রশ্নের তাৎক্ষণিক উত্তর নবীর কাছে না থাকায় তিনি নীরব থাকেন।[117] প্রশ্নটার একটা যোগ্য উত্তর যোগাতে তাঁর সময়ের প্রয়োজন ছিল এবং পরে একটা আয়াত নাজীল হয় এ সম্পর্কে, যাতে বলা হয়: 'ঈশ্বর যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করতে পারেন। আল্লাহ যখন একটা বিষয়ে ভাগ্যলিপি করেন, তিনি তা সৃষ্টি করেন যখন ইচ্ছা তখন; যখন তিনি কোনও পরিকল্পনা করেন, শুধু বলেন 'হও' এবং তা হয়ে যায়' (কুরআন ৩:৪৭)।

কুরআন এখন খ্রীষ্টানদের উপর - যারা বলে যীশু ঈশ্বরের পুত্র - আল্লাহর অভিশাপ বা গজব কামনা করে (কুরআন ৯:৩০)। মুহাম্মদ যীশুর ক্রুশবিদ্ধতার সত্যতা প্রত্যাখান করেন। যেমন কুরআন বলে: 'তারা তাঁকে হত্যা করে নি, ক্রুশবিদ্ধও করে নি'; বরং 'আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে তুলে নেন' আপাতদৃষ্টে ক্রুশবিদ্ধকালে (কুরআন ৪:১৫৭-৫৮)। এ ধারণা নকল করা হয়েছে মনিবাদ থেকে, যা ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা বুঝা উচিৎ যে, মানবজাতির পাপের জন্য যদি যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনা অস্বীকার করা হয়, তাহলে খ্রীষ্টান ধর্ম তার দাবীকৃত মহত্ত্বের বিরাট অংশ হারিয়ে ফেলে।

খ্রীষ্টানদের প্রতি মুহাম্মদের শত্রুতা

খ্রীষ্টানদের দ্বারা তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের প্রত্যাখান ও সমালোচনায় ক্রুদ্ধ হয়ে মুহাম্মদ খ্রীষ্টান ধর্মের অনেক মতবাদের শুধু নিন্দা করেই শান্ত থাকেন নি। খ্রীষ্টান যাজক বা সন্ন্যাসীরা, যারা মুহাম্মদের ধর্মে যোগ

[117]. Ibid, p. 199

দিতে খ্রীষ্টানদেরকে নিরুৎসাহিত করছিলেন, মুহাম্মদ তাদেরকে এখন লোভী ও জনগণের সম্পদ-গ্রাসকারী বলে নিন্দা করেন। যেমনটা কুরআন বলছে: '(খ্রীষ্টান) সন্ন্যাসীরা বেপরোয়াভাবে মানবজাতির সম্পদ গ্রাস করে ও 'আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আল্লাহর পথে ব্যয় না করে যারা সোনা-রূপা জমায়, তাদেরকে (হে মুহাম্মদ!) যন্ত্রণাময় ধ্বংসের খবর দাও' (কুরআন ৯:৩৪)।

আল্লাহ তাঁর সত্যধর্ম (ইসলাম) প্রসারে বিঘ্ন সৃষ্টি করায় খ্রীষ্টানদের নিন্দা শুরু করে তাদের উপর প্রতিশোধ নেয়ার অঙ্গীকার করেন (কুরআন ৯:৩০)। খ্রীষ্টানদের প্রতি আল্লাহর মনোভাব বিদ্বেষপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং নতুন প্রত্যাদেশ পাঠিয়ে মুসলিমদের মাঝে তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াতে শুরু করেন: 'হে বিশ্বাসীগণ। তোমরা তাদেরকে অভিভাবক করো না, যারা তোমাদের আগে ধর্মগ্রন্থ পেয়েছে (খ্রীষ্টান, ইহুদী) ...যদি তোমরা সত্যিকার বিশ্বাসী হও, আল্লাহর প্রতি কর্তব্যে সি' র থাকো' (কুরআন ৫:৫৭)। আল্লাহ এখন খ্রীষ্টানদেরকে সত্য লংঘনকারী বলে অভিশাপ দিয়ে নরকে প্রেরণ করেন, যেখানে তারা অনন্তকাল বাস করবে (কুরআন ৫:৭৭, ৯৮:৬)।

ইসলামের ধূর্ত পণ্ডিতরা সাধারণত কুরআনে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি অনুকূল আয়াতগুলো উল্লেখ করে ইসলামকে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অত্যন্ত মিত্র ভাবাপন্ন প্রমাণ করতে। স্পষ্টতঃ ঐ আয়াতগুলো পরিকল্পিতভাবে রচিত হয়েছিল খ্রীষ্টান ধর্ম ত্যাগ করে তাদেরকে ইসলামে যোগ দেওয়ার ও মুহাম্মদকে নবী হিসেবে মেনে নেওয়ার আহ্বান করতে। কিন্তু তাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করতে আল্লাহর বেপরোয়া প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হলো, তখন তিনি অনেকগুলো বিদ্বেষপূর্ণ ও হিংসা-উত্তেজক আয়াত স্বর্গ থেকে প্রেরণ করেন, যা ঐ সব পণ্ডিতরা কখনও উল্লেখ করে না। এমন কিছু বিদ্বেষপূর্ণ আয়াতের তালিকা নিচে দেওয়া হলো:

১. ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা দেবমূর্তি ও মিথ্যা দেবদেবীতে বিশ্বাসী। (কুরআন ৪:৫১)

২. 'ওরা (খ্রীষ্টান ও ইহুদী) তারাই, যাদেরকে আল্লাহ অভিশপ্ত করেছেন।' (কুরআন ৪:৫২)

৩. আল্লাহ খ্রীষ্টানদের মাঝে বিদ্বেষ ও ঘৃণা জাগ্রত করেছেন। (কুরআন ৫:১৪)

৪. ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা পথভ্রষ্ট। (কুরআন ৫:৫৩)

৫. খ্রীষ্টানরা দোযখের আগুনে পুড়বে। (কুরআন ৫:৭২)
৬. ট্রিনিটির ব্যাপারে খ্রীষ্টানরা ভ্রান্ত, যার জন্যে তারা কঠিন নরকযন্ত্রণা ভোগ করবে। (কুরআন ৫:৭৩)
৭. খ্রীষ্টান, ইহুদী বা অবিশ্বাসীদেরকে অভিভাবক নিযুক্ত কোরো না। (কুরআন ৫:৫৭)
৮. ইহুদী বা খ্রীষ্টানদের বন্ধু- রূপে গ্রহণ করো না। যদি তোমরা তা করো, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের একজন মনে করবেন। (কুরআন ৫:৫১)
৯. খ্রীষ্টান ও ইহুদীরা পথভ্রষ্ট। আল্লাহ স্বয়ং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। (কুরআন ৯:৩০)
১০. ধনী ও লোভী খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের জন্য ভয়ঙ্কর নরক যন্ত্রণা অপেক্ষা করছে। (কুরআন ৯:৩৪)
১১. ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা সীমা লংঘনকারী। (কুরআন ৫:৫৯)
১২. অপকর্ম হলো ইহুদী রাব্বী ও খ্রীষ্টান যাজকদের পারদর্শিতা। (কুরআন ৫:৬৩)
১৩. আল্লাহ মুহাম্মদের উপর যা নাজীল করেছেন, খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের তা অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে। না করলে আল্লাহ তাদেরকে বানর বা উল্লুকে পরিণত করবেন, যেমনটা তিনি করেছিলেন সাবাথ ভঙ্গকারীদের ক্ষেত্রে। (কুরআন ৪:৪৭)
১৪. খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাও যতদিন না অপমানে নত হয়ে তারা বশ্যতা কর (জিজিয়া) দেয়। (কুরআন ৯:২৯)

মৃত্যুশয্যায় মুহাম্মদের খ্রীষ্টান বিদ্বেষ

খ্রীষ্টানদের প্রতি নবী মুহাম্মদের বিদ্বেষ তাঁর মৃত্যুশয্যা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অন্তিম শয্যায় উপনীত নবী সারারাত যন্ত্রণায় ও বিলাপে চীৎকার করতে থাকেন। যন্ত্রণাকাতরদেরকে মুহাম্মদ যেভাবে সান্ত্বনা দিতেন, সেই সূত্রে স্ত্রী আয়শা তাঁকে বলেন: ‘হে নবী! যদি আমাদের মধ্যে কেউ এ রকম বিলাপ করতো তখন আপনি নিশ্চয়ই তাকে তিরস্কৃত করতেন।’ তিনি উত্তর করেন: ‘কিন্তু আমি জ্বরের আগুনে দ্বিগুণ যন্ত্রণায় পুড়ছি।’[118] পরদিন সকালে যন্ত্রণা আরো বেড়ে গেলে তিনি প্রায় অচেতন হয়ে পড়েন। তাঁর অপর এক স্ত্রী উম্মে সালমা আবিসিনিয়ার

118. Ibid, p. 141

একটি ঔষধের মিশ্রণ খাওয়ানোর পরামর্শ দেন, যা তিনি সেখানে নির্বাসিত থাকাকালে শিখেছিলেন। এর প্রতিক্রিয়ায় কিছুটা হুঁশ ফিরে পেয়ে মুহাম্মদ তাঁকে যা পান করানো হয়েছে তার ব্যাপারে সন্দিহান হন ও ঘরে উপসি' ত সব মহিলাকে সেটা খাওয়ানোর নির্দেশ দেন। তাঁর উপস্থিতিতে প্রত্যেক মহিলার মুখে ঔষধটি ঢেলে দেওয়া হয়।
আবিসিনিয়ার ঔষধের এ আলোচনা শেষ পর্যন্ত গড়ায় আবিসিনিয়ার বিষয়ে আলোচনায়। তাঁর দুই স্ত্রী উম্মে সালমা ও উম্মে হাবিবা ঐ দেশে নির্বাসিতা ছিলেন। তাঁরা সেখানকার সুন্দর মরিয়ম ক্যাথেড্রাল বা গীর্জা এবং তার দেয়ালের বিস্ময়কর ছবির কথা বলেন। তাঁদের কথাবার্তা শুনে ক্রোধোন্মত্ত নবী চীৎকার করে উঠেন: 'হে প্রভু! ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের ধ্বংস করো। প্রভুর ক্রোধ তাদের উপর প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠুক। সমগ্র আরব ভূখণ্ডে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম না থাকুক।' [119] নবীর এ অন্তিম ইচ্ছা তাঁর উত্তরাধিকারীরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন আরব ভূখণ্ড থেকে সকল খ্রীষ্টান ও ইহুদীকে বিতাড়নের মাধ্যমে।

খ্রীষ্টান শাসকদের কাছে মুহাম্মদের হুমকীপত্র

৬২৮ সালে, যখন মুহাম্মদ মক্কা দখলের মত শক্তিও অর্জন করে উঠেন নি, তখন তিনি ইয়ামামা, ওমান ও বাহরাইনের রাজাদের কাছে তাঁর নবুয়তীর ঘোষণা দিয়ে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য দূত মারফত চিঠি পাঠান। বাহরাইন ও ওমান থেকে তিনি তেমন কোন আশ্বাস পান নি। ইয়ামামার খ্রীষ্টান প্রধান ও তৎকালে সে অঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিধর ব্যক্তি হাউদা ইবনে আলী মুহাম্মদের সাথে নবুয়তীর ভাগ চান। হাউদার উত্তর পেয়ে মুহাম্মদ তাঁকে অভিশাপ দেন ও এক বছর পর হাউদা মারা যান। ইসলাম গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে তিনি অন্যান্য বিদেশী শাসকদের কাছেও পত্র পাঠান: যেমন রোমের (ইস্তাম্বুলের) সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে এবং ঘাসানিথের যুবরাজ সপ্তম হারিথ ও মিসরের খ্রীষ্টান গভর্নরের কাছে। রোম ও ঘাসান শাসকরা তিরস্কারের সাথে সে পত্রকে 'এক পাগলের বার্তা' আখ্যা দেন। মিসরের রোমান গভর্নরও ইসলাম গ্রহণ করেন নি, কিন্তু মুহাম্মদের কাছে উপহার স্বরূপ দুই পরম সুন্দরী দাস- বালিকাসহ তাঁর পত্রের বন্ধুত্বপূর্ণ উত্তর

---

[119] . Ibid, p. 142: also Ibn Ishaq, p. 523

দেন। বৃদ্ধ নবী যৌন্তদাসীরূপে মিসরীয় সুন্দরী খ্রীষ্টান তরুণী মারিয়াকে নিজ হেরেমের অন্তর্ভূক্ত করেন।

খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে নবীর যুদ্ধাভিযান

পরবর্তিতে মুসলিমরা ক্ষমতাবান হয়ে উঠলে, যেসব খ্রীষ্টান শাসক মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণের আহ্বান্তপত্র প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাদের সবার বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধাভিযান চালান। কিন্তু মিসরীয় গভর্নরের কাছ থেকে সুন্দরী মারিয়াকে উপহার পেয়ে সন' ষ্ট হওয়ায়, তিনি কখনোই মিসর আক্রমণ করেন নি, যদিও তাঁর মৃত্যু পর ইসলামের শাসকরা মিসর আক্রমণ করে।

৬২৯ সালের সেপ্টেম্বরে মুহাম্মদ সিরিয়ার সীমান্তবর্তী খ্রীষ্টান্তঅধ্যুষিত মুতায় ৩, ০০০ জিহাদীর একটা শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করেন। মুহাম্মদ তাঁর কমাণ্ডারদের প্রথমে খ্রীষ্টানদেরকে ইসলামে আহ্বান করার নির্দেশ দেন। তারা সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলে আল্লাহর নামে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালাতে বলেন। খ্রীষ্টানরা মুসলিম হামলাকারীদের মুকাবিলার জন্য এক বিশাল বাহিনী সমবেত করেছিল। এ যুদ্ধে মুসলিমরা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রধান দুই মুসলিম সেনানায়ক জায়েদ ও জাফর নিহত হন। কেবলমাত্র খালিদ বিন ওয়ালিদের কুশলতা ও বুদ্ধিমত্তার কারণে অবশিষ্ট মুসলিম যোদ্ধারা জীবন বাঁচিয়ে পালাতে সক্ষম হয়।[120]

৬৩০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মুহাম্মদ আমর বিন আ'স- এর নেতৃত্বে ওমানের খ্রীষ্টান শাসকদেরকে ইসলাম গ্রহণ ও কর দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে এক বাহিনী পাঠান। তাদের কয়েকটি গোষ্ঠী ইসলাম গ্রহণ করে। মাজুনা গোত্রকে খ্রীষ্টধর্ম চর্চার অনুমতি দেওয়া হয় তাদের অর্ধেক জমিজমা ও ধনসম্পদ মুসলিমদের হাতে সমর্পণের শর্তে। একই মাসে হিমিয়ারের খ্রীষ্টান যুবরাজের কাছে তিনি পত্র পাঠান তাকে ইসলামের কাছে নতি স্বীকার করে প্রয়োজনীয় টাইদ্(প্রদেয় বাৎসরিক ফসল ও নবজাত পশুর এক- দশমাংশ) ও কর দেবার দাবী জানিয়ে। অস্বীকার করলে তাদেরকে আল্লাহর শত্রু আখ্যায়িত করা হয়। তাদেরকে নিজস্ব

---

[120]. Ibn Ishaq, p. 532-40; Muir, p. 393-95.

ভাষা ত্যাগ করে আরবী ভাষায় কথা বলার নির্দেশ দেওয়া হয়। জীবন বাঁচাতে যুবরাজ ইসলাম গ্রহণ করেন।[121]

৬৩০ সালের অক্টোবর মাসে মুহাম্মদ সিরিয়ার বাইজেন্টাইন সীমান্তে আক্রমণের জন্য ৩০, ০০০ ঘোড়া ও পদাতিক মুসলিম যোদ্ধা সমবেত করেন। দুই বছর আগে সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও সিরিয়ার ঘাসানিদ যুবরাজ মুহাম্মদের ইসলাম গ্রহণের বার্তাপত্র প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সিরিয়া সীমান্তের কাছে তাবুক- এ পৌঁছে মুহাম্মদ সেখানে তাঁবু গাড়েন। তিনি আশপাশের ক্ষুদ্র নৃপতিদের কাছে পত্র প্রেরণ করেন এই বলে: হয় ইসলাম গ্রহণ করো নতুবা 'জিজিয়া' কর দাও। আইলা খ্রীষ্টান গোত্রের যুবরাজ ইওহানা (জন) ইবনে রুবা তার জনগণের উপর মুহাম্মদের আক্রমণ এড়াতে জিজিয়া কর দেওয়ার শর্তে একটা চুক্তি সম্পাদন করেন। মুহাম্মদ তাবুকে কুড়ি দিন অবস্থানকালে ছোট ছোট কয়েকটি সমপ্রদায়কে বশীভূত করেন। এরপর মুহাম্মদ তাঁর এ অভিযানের মূল উদ্দেশ্য সিরিয়া আক্রমণের চিন্তা করেন। এ সময় মুহাম্মদের কাছে গুপ্ত খবর আসে যে, এক বিশাল গ্রীক বাহিনী মুসলিমদেরকে মুকাবিলা করতে সীমান্তে সমবেত হয়েছে। এ খবরে তাঁর বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়ে এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভীতিগ্রস্ত মুসলিম যোদ্ধাদের চাপে নবীকে পিছুপদ হতে হয়।

তাবুকে অবস্থানকালে মুহাম্মদ খালেদ বিন ওয়ালিদকে দুমা মরূদ্যানটি বশীভূত করতে পাঠান। দুমার শাসক ছিলেন কাল্‌ব গোত্রের আরব খ্রীষ্টান যুবরাজ ওকাইদির বিন আব্দুল মালিক। ওকাইদির ও তার ভাই শিকারে বের হলে পথিমধ্যে খালেদ বিন ওয়ালিদ ওঁৎপেতে থেকে তাদেরকে আক্রমণ করে: ওকাইদিরের ভাই নিহত হয় এবং ওকাইদিরকে বন্দী করে মদীনায় নিয়ে আসা হয়। ওকাইদিরকে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করে প্রথাগত কর প্রদানের জন্য একটা চুক্তি স্বাক্ষর করান। মুহাম্মদের মৃত্যুর পর ওকাইদির বিদ্রোহ করেন। তার অবাধ্যতা ও ধর্মত্যাগের প্রতিশোধ নিতে খালেদ বিন ওয়ালিদ পুনরায় দুমা আক্রমণ করে এবং তার সমপ্রদায়কে পরাস্ত করে ওকাইদিরকে হত্যা করে।

খ্রীষ্টান প্রতিনিধি দলের প্রতি নবীর আচরণ

---

[121]. Walker, p. 204-05

খ্রীষ্টানদের সঙ্গে মুহাম্মদের ব্যবহারের মানদণ্ড আচ করা যায় ৬৩১ সালে কয়েকটি খ্রীষ্টান প্রতিনিধি দলের সঙ্গে তাঁর আলাপ- আলোচনা ও আচরণের ধরন বিচার করে। ৬৩০ সালে মক্কা দখলের পর গোটা আরবাঞ্চলের আতঙ্কিত গোত্রগুলো প্রতিনিধিদল পাঠাতে থাকে মদীনায় - মুহাম্মদের আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। বনি হানিফা গোত্রের এক প্রতিনিধিদল আসে ফেব্রুয়ারীতে (৬৩১)। তাদের সঙ্গে নবীর কী আলোচনা হয়েছিল তা পরিষ্কার নয়। তবে ফিরে যাবার আগে নবী তাঁর অভিসিঞ্চণের অবশিষ্ট জলপূর্ণ এক পাত্র তাদেরকে দিয়ে নির্দেশ করেন: তারা যেন তাদের গীর্জা ভেঙ্গে ফেলে সে পানি ছিটিয়ে দেওয়ার পর সে- স্থানে একটা মসজিদ নির্মাণ করে।

এক মাস পর আংশিক খ্রীষ্টান তাগলীব গোত্রের ষোল সদস্যের এক প্রতিনিধিদল স্বর্ণের ক্রস (ক্রুশ) পরে মদীনায় মুহাম্মদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। মুহাম্মদ তাদের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেন যে, তারা তাদের ধর্ম ধরে রাখতে পারবে, কিন্তু তাদের সন্তানদেরকে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত (বাপটাইজ) করতে পারবে না।[122] তার অর্থ হলো, সে সন্তানরা মুসলিমদের সম্পত্তি হয়ে যাবে।

সে বছর নেজরানের ১৪ সদস্যের আরেকটি উল্লেখযোগ্য খ্রীষ্টান প্রতিনিধিদল নবীর কাছে আসে। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন কিন্‌দা গোত্রের আব্দুল মাসিহ্, বকর গোত্রের বিশপ আবু হারিথা ও অভিজাত দাইয়ান পরিবারের এক প্রতিনিধি। মুহাম্মদ তাদেরকে কুরআনের একটি অংশ পড়ে শোনালে ভদ্রতার খাতিরে তাঁরা মেনে নেয় যে, তাঁর লোকদের জন্য তাঁর একটি বার্তা আছে। তখন তিনি তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলেন, যা তারা প্রত্যাখান করেন। উভয়পক্ষ প্রচুর তর্ক- বিতর্ক করে, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়। শেষে নবী দু'পক্ষের মধ্যে পরস্পরকে অভিশাপ দেওয়ার এক প্রতিযোগিতার প্রস্তাব দেন, এ মর্মে যে মিথ্যাবাদী পক্ষের উপর আল্লাহর অভিশাপ পড়বে। কিন্তু খ্রীষ্টান দলটি এরূপ নীচ কাজে অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানায়।[123] আল্লাহ কুরআনে এ ঘটনাটির বর্ণনা করেছেন এভাবে: 'তোমার কাছে

---

[122]. Muir, p. 458
[123]. Ibid, p. 458-60

যে জ্ঞানবার্তা এসেছে তা নিয়ে যারা তোমার সাথে তর্ক করে, তাদেরকে বলো: এসো, আমরা আমাদের সন্তানদের ও তোমাদের সন্তানদের এবং আমাদের নারীদের ও তোমাদের নারীদের এবং আমাদের নিকটজনদের ও তোমাদের নিকটজনদের ডাকি; অতঃপর আমরা প্রার্থনায় রত হই ও মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর গজবের জন্য প্রার্থনা করি' (**কুরআন ৩:৬১**)।

যাহোক বিদায় নেয়ার আগে মুহাম্মদ প্রতিনিধি দলটিকে নিশ্চয়তা দেন যে, তাদের ধর্মচর্চায় বাধা দেওয়া হবে না, তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না এবং তাদের ভূমি ও ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে না। কিন্তু পরে ঐ বছরই নবী নেজরানের জনগণকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য চাপ দিতে খালিদকে পাঠান। নিষ্ঠুর গণহত্যাকারী হিসেবে খ্যাত খালিদের অভিযানের খবর শুনে তাদের অনেকেই নতি স্বীকার করে। কিন্তু অন্যান্য সীমানে- অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের চাপ থাকায় খালিদকে অন্যত্র মনোযোগ দিতে হয়। ফলে মুহাম্মদের মৃত্যু পর্যন্ত নেজরানের অধিকাংশ লোকই খ্রীষ্টান রয়ে যায়। পরে খলীফা ওমর আরবাঞ্চল থেকে অবশিষ্ট খ্রীষ্টানদের বিতাড়িত করতে নতুন অভিযান শুরু করেন। এ নতুন আক্রমণের মুখে ধ্বংসের ভয়ে নেজরান গোত্রের অধিকাংশ লোকই ইসলাম গ্রহণ করে। ৬৩৫ সালে ওমর তাদের অনেক বিশিষ্ট নাগরিক, ধর্মপণ্ডিত ও নেতাকে নির্বাসনে পাঠান।[124]

৬৩২ সালে নবী প্যালেস্টাইন সীমান্তে একটা অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণকালে হঠাৎ করে অন্তিম রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। সমগ্র আরব ভূখণ্ড থেকে অন্যান্য ধর্মানুসারীদেরকে উচ্ছেদ করতে তাঁর অন্তিম ইচ্ছা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পরবর্তী খলীফাগণ কাঁধে তুলে নেন। মুসলিম বাহিনী প্রথমে গোটা আরবের লোকদেরকে শক্তি প্রয়োগে ধর্মান্তরিত করতে ব্রতী হয়। এরপর তাদের নজর পরে মধ্য এশিয়ার খ্রীষ্টান গোত্রগুলোর উপর। মধ্য এশিয় ইয়ামামার মূসাইলিমা নাকি মুহাম্মদের নবুয়তী শুরুর আগেই প্রত্যাদেশিত হয়ে একটা মূলতঃ খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার করছিলেন। তিনি মুহাম্মদকে নবী স্বীকৃতি দিয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন, যাতে তিনি বিদ্বেষ এড়াতে নিজ নিজ অঞ্চলে নিজ নিজ ধর্ম প্রচারের আবেদন জানান। মূসাইলিমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

[124]. Walker, p. 207

করে মুহাম্মদ উত্তরে লিখেন: 'ঈশ্বরের নবী মুহাম্মদের নিকট থেকে মিথ্যুক মূসাইলিমার প্রতি... পৃথিবীটা ঈশ্বরের। তাঁর ইচ্ছা সৃষ্টির মধ্যে কে এর উত্তরাধিকারী হবে এবং অবশ্যই সে হবে প্রকৃত ধার্মিকরা।[125]
জানা যায়, মূসাইলিমা খুবই জনপ্রিয় ছিলেন; তার অনুসারীদের শক্তি মুহাম্মদের চেয়ে কোনও অংশে কম ছিল না। আবু বকর মূসাইলিমার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন, কেননা ইতিমধ্যে মূসাইলিমার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা নতুন ধর্ম ইসলামের প্রভাব অনেকটা হ্রাস করছিল। ইয়ামামার প্রথম যুদ্ধে মূসাইলিমার অনুসারীদের কাছে মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয়। ৬৩৪ সালে দ্বিতীয় যুদ্ধে মুসলিমরা এমন শোচনীয় পরাজয় বরণ করে যে, মদীনায় খুব কম বাড়ীই ছিল যেখান থেকে বিলাপ শোনা যায় নি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, এ যুদ্ধে সর্বোৎকৃষ্ট কুরআন মুখস্তকারী মুহাম্মদের ৩৯ জন প্রধান সঙ্গী (সাহাবা) নিহত হন। এর কয়েক মাস পর ৬৩৪ সালে আবু বকর ভয়ঙ্কর খালেদের নেতৃত্বে মূসাইলিমাকে উৎখাত করার জন্য এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। দু'পক্ষের মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ ঘটে আকরাবায়, পরে যা 'গার্ডেন অব ডেথ' বা 'মৃত্যু বাগিচা' নামে খ্যাত হয়। মূসাইলিমাসহ তার দশ হাজার যোদ্ধা নিহত হয় এবং অবশিষ্ট লোকদের সবাইকে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয়।[126] এরপর আরবাঞ্চলে খ্রীষ্ট ধর্মানুসারীদের আর কোন উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল না।

মুহাম্মদ কর্তৃক স্বীকৃত ইসলামে অমুসলিমদের অবস্থান বা মর্যাদা

অমুসলিমদের সাথে মুহাম্মদের আচরণের ভিত্তিতে এখন আমরা আরব উপদ্বীপের পৌত্তলিক, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে তিনি যে মর্যাদা দিয়েছিলেন, তা মূল্যায়ন করতে পারি।

ইসলামে পৌত্তলিকদের অবস্থান

নবী মুহাম্মদ মক্কার পৌত্তলিকদের মাঝে দীর্ঘ তের বছর ইসলাম প্রচারের চেষ্টা করে বেশীদূর অগ্রসর হতে ব্যর্থ হন। মক্কার অধিকাংশ লোক তাঁর বার্তা প্রত্যাখ্যান করে; কিন্তু তাঁর বার্তা মক্কাবাসীদের

[125]. Ibn Ishaq, p. 649
[126]. Ibid, p. 209

প্রচলিত ধর্ম, প্রথা ও পূর্বপুরুষদের প্রতি ঘৃণাব্যঞ্জক হওয়া সত্ত্বেও এবং কা'বাকে তাঁর ঈশ্বরের মালিকানাধীন দাবী করলেও, মক্কাবাসীদের কাছ থেকে তাঁকে কখনো সহিংস বিদ্বেষের মুখোমুখি হতে হয় নি। কুরাইশরা তাঁর উপর কেবল একটিমাত্র শত্রুতার নজীর স্থাপন করেছিল - যেটা ছিল মুহাম্মদের সম্প্রদায়ের উপর দু'বছরের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবরোধ আরোপ - যা অনেকটা সভ্য ও ভদ্রোচিত পন্থা। মক্কার পৌত্তলিকরা মুহাম্মদের বিদ্বেষ ও অশ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব ও কার্যকলাপের মুখে যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিল। মক্কায় তাঁর কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সার্থকতার কোন আশা না দেখে ও মদীনায় তাঁর অনুপস্থিতিতেই ইসলামের ভাল অগ্রগতি দেখে তিনি ৬২২ সালে মদীনায় পাড়ি জমান। আল্লাহ পরে মক্কাবাসীর ইসলাম প্রত্যাখ্যানকে 'বিশৃংখলা সৃষ্টি ও নিপীড়ন' আখ্যা দিয়ে তাকে 'হত্যার চেয়েও সাংঘাতিক' বিবেচনা করেন। তাদের ইসলাম প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধ নিতে আল্লাহ মক্কাবাসীদেরকে আক্রমণ ও হত্যার অনুমোদন দেন (কুরআন ২:১৯০- ৯৩)। মক্কাবাসীকর্তৃক আল্লাহর নতুন ধর্ম প্রত্যাখ্যান তাঁর দৃষ্টিতে এতটাই গর্হিত ও ক্ষমার অযোগ্য ছিল যে, তিনি প্রত্যাখ্যানকারীদের হত্যা করা মুসলিমদের জন্য অবশ্যকরণীয় দায়িত্ব বলে ঘোষণা করেন - সেটি মুসলিমরা পছন্দ করুক বা নাই করুক (কুরআন ২:২১৬)। আল্লাহ মক্কার পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও তাদেরকে হত্যা করাকে বৈধ করেন, এমনকি যুদ্ধ- নিষিদ্ধ মাসগুলোতেও, যেমন ঘটেছিল নাখলায় ইসলামের প্রথম সফল জিহাদী হামলা ও হত্যাকাণ্ড (কুরআন ২:২১৭)।

নাখলার বিতর্কিত, অথচ সফল, রক্তাক্ত জিহাদের পর বেশ কয়েকটি বড় আকারের যুদ্ধ সংঘটিত হয় মদীনার মুসলিম ও মক্কার পৌত্তলিকদের মধ্যে: যেমন বদরের যুদ্ধ (৬২৪), ওহুদের যুদ্ধ (৬২৫) ও খন্দকের যুদ্ধ (৬২৭)। এসব সংঘাত বা যুদ্ধের পরিণাম হিসেবে ৬৩০ সালে মুহাম্মদ মক্কা বিজয়ে সক্ষম হন। তিনি কুরাইশদের পবিত্র দেব- মন্দির কা'বা দখল করে তাতে স্থাপিত দেব- দেবীর মূর্তিসমূহ ধ্বংস করেন। এভাবে তিনি কা'বাকে ইসলামের ঈশ্বর আল্লাহর পবিত্র ঘরে রূপান্তরিত করেন।

সেদিন যদিও অনেক পৌত্তলিক ইসলাম গ্রহণ করে, মক্কার নেতা আবু সূফীয়ানের সাথে চুক্তির ভিত্তিতে যারা পৌত্তলিকতা চর্চা অব্যাহত

রাখতে চায়, তাদেরকে মুহাম্মদ অনুমতি দিয়েছিলেন। এ ছাড়পত্র এক বছর টিকে থাকে। ৬৩১ সালের পরবর্তী হজ্জ্ব পালনের সময় আল্লাহ হঠাৎ বেশ কয়েকটি আয়াত নাজীল করেন - যেমন আয়াত ৯:১- ৫, বিশেষত আয়াত ৯:৫ - যাতে পৌত্তলিকদের ইসলাম গ্রহণ অথবা মৃত্যু, এ- দুটোর একটি উপায় বেছে নেয়ার নির্দেশের মাধ্যমে মূর্তি- পূঁজা নির্মূল করা হয়। আয়াত ৯:৫ বলে: 'অতঃপর যখন পবিত্র মাস গত হবে, পৌত্তলিকদের যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদেরকে বন্দী করবে ও আটক করবে এবং তাদের জন্য সর্বত্র ওঁৎপেতে থাকবে। কিন্তু তারা যদি অনুশোচিত হয় ও (আল্লাহর) উপাসনায় লিপ্ত হয়, এবং গরীবদের প্রাপ্য (যাকাত) দান করে, তাহলে তাদের পথ মুক্ত করে দাও।'

এ নির্দেশের ফলে মুহাম্মদের জীবদ্দশাতেই আরব দেশ থেকে মূর্তি- পূজা নির্মূল হয়। সুতরাং ইসলাম গ্রহণ অথবা মৃত্যু - এ দুটোর একটি বেছে নেওয়া মূর্তি- পূজক, পৌত্তলিক, প্রাণীবাদী ও নাস্তিকদের প্রতি ইসলামের আদর্শ বিধান।

ইসলামে ইহুদীদের মর্যাদা

নবী মুহাম্মদ প্রাথমিক অবস্থায় ইহুদীদেরকে ইসলাম গ্রহণ ও তাকে নবী হিসেবে মেনে নেয়ার আহ্বান জানান। তারা তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে তিনি তাদের উপর কঠোর হয়ে উঠেন। বদরের যুদ্ধে অভাবনীয় বিজয়ের পরপরই তিনি মদীনার ইহুদী গোত্র বানু কাইনুকাকে প্রথম আক্রমণ করেন। তারা পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করলে মুহাম্মদ তাদেরকে হত্যা করতে চান। আল- তাবারী লিখেছেন: 'তাদেরকে শৃঙ্খলিত করা হয়েছিল এবং মুহাম্মদ তাদেরকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন।'[127] কিন্তু ইসলামে ঘোষিত সুবিখ্যাত ভণ্ড আব্দুল্লাহ বিন ওবাই- এর জোর হস্তক্ষেপে নবী ইহুদীদেরকে গণহত্যা করা থেকে বিরত হতে বাধ্য হন। তৎপরিবর্তে তিনি গোটা কাইনুকা গোত্রটিকে পৈতৃক বাড়ীঘর থেকে নির্বাসনে পাঠান।

পরবর্তী বছর এক ভূয়া অজুহাতে মুহাম্মদ মদীনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী বানু নাদিরকে আক্রমণ করেন। আব্দুল্লাহ বিন ওবাই তখনও যথেষ্ট শক্তিশালী নেতা ছিলেন। তিনি ইহুদীদের পক্ষে যুদ্ধ করারও

---

[127]. Al-Tabari, Vol. VII, p. 86

হুমকী দেন। এমতাবস্থায় নবী আবারো তাদেরকে হত্যা না করে নির্বাসনে পাঠান। এর দু’বছর পর মুহাম্মদ যখন মদীনার সর্বশেষ ইহুদী গোষ্ঠী বানু কুরাইজাকে আক্রমণ করেন, তখন দুর্বল হয়ে পড়া আব্দুল্লাহর নিন্দাকে অগ্রাহ্য করে মুহাম্মদ তাঁর মূল পরিকল্পনায় ফিরে যান - যা তিন বছর আগে তিনি বানু কাইনুকা গোত্রের উপর প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। তিনি সাবালক সমস- ইহুদীকে হত্যা করেন এবং তাদের নারী ও শিশুদেরকে দাস বানান। বানু কুরাইজা ইহুদীদের আটককৃত ধনসম্পদ এবং নারী ও শিশুদেরকে তাঁর শিষ্যদের মাঝে বিতরণ করে দেন। নারীদের মধ্যে যারা তরুণী ও সুন্দরী ছিল, তাদেরকে যৌনদাসী হিসেবে ব্যবহার করা হয়। নবী ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য কিছু বন্দী নারীকে বিদেশে বিক্রি করে দেন।

মোটকথা, ইহুদীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে মুহাম্মদ একের পর এক তাদের গোত্রগুলোকে আক্রমণ করেন ও তাদের সাবালক পুরুষদেরকে হত্যা এবং নারী-শিশুদেরকে দাস বানানোর সিদ্ধান্ত নেন। মুহাম্মদের দৃষ্টিতে এটাই হয়ে দাঁড়ায় ইসলামে ইহুদীদের মর্যাদার চূড়ান্ত বিধিলিপি।

ইসলামে খ্রীষ্টানদের মর্যাদা

মক্কা ও মদীনায় সে আমলে খ্রীষ্টানদের উপসি' তি খুব বেশী ছিল না। সুতরাং খ্রীষ্টানদের সঙ্গে মুহাম্মদের সে রকম কোন তিক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত ছিল না, যেমনটা ছিল পৌত্তলিক ও ইহুদীদের সঙ্গে। যাহোক, খ্রীষ্টানদের প্রতি তাঁর আচরণের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় বাহরাইন, ওমান, মিসর, সিরিয়া ও বাইজেন্টাইনের খ্রীষ্টান শাসকদের কাছে পাঠানো কয়েকটি চিঠিতে। এখানে দুটো চিঠির পর্যাপ্ত আলোচনা হবে: তার একটা ৬৩০ সালে ওমানের খ্রীষ্টান রাজার কাছে এবং অপরটি তাবুক অভিযানের সময় আইলা গোষ্ঠির খ্রীষ্টান যুবরাজের কাছে প্রেরিত হয়েছিল। বর্তমান ওমান সরকারের ওয়েবসাইটে ওমানের খ্রীষ্টান রাজার কাছে পাঠানো নবীর ঐ পত্রের একটা কপি সংরক্ষণ করা হয়েছে।[128] তাতে লিখিত হয়েছে:

---

[128]. This document has now been removed from the Oman Government Website (http://www.mofa.gov.om/oman/discoveroman/omanhistory/OmanduringIsla). Wikipedia preserves a copy of it at http://www.wikiislam.com/ wiki/ Quotations—on— Islam# Official— Oman— Site.

ঈশ্বর মুসলিমদের মক্কায় প্রবেশে ক্ষমতায়িত করার পর ইসলাম কর্তৃত্বকর শক্তিতে পরিণত হয়ে উঠে এবং ভীতি ব্যবহারের মাধ্যমে বিস্তৃত হয়... অতঃপর নবী শান্তিপূর্ণ উপায়ে ওমানের দুই রাজা আল জুলান্দার পুত্র জাফর ও আব্দসহ প্রতিবেশী রাজা ও শাসকগণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে অগ্রাধিকার দেন। ইতিহাস পুস্তক আমাদের বলে যে, নবী ওমানের জনগণকে বার্তা পাঠান এবং সে সঙ্গে আল জুলান্দার পুত্রদ্বয় জাফর ও আবদ'এর কাছে সামরিক পাহারায় একটি চিঠি আনেন আমর বিন আল আস, যাতে তিনি লিখেছিলেন: 'পরম দয়ালু ও করুণাময় ঈশ্বরের নামে, মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহর কাছ থেকে আল জুলান্দার পুত্রদ্বয় জাফর ও আবদ'এর নিকট এ পত্র। তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, যারা সঠিক পথ বেছে নেয়। ইসলাম গ্রহণ কর, তাতে তোমরা নিরাপদ থাকবে। আমি ঈশ্বরের বার্তাবাহক সমগ্র মানবজাতির কাছে। এতদ্বারা আমি সব জীবিতদের সতর্ক করছি যে, অবিশ্বাসীরা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। ইসলাম গ্রহণ করলে তোমরা রাজা হিসেবে বহাল থাকবে, কিন্তু ইসলাম থেকে বিরত থাকলে তোমরা রাজত্ব হারাবে এবং আমার ঘোড়াগুলো তোমাদের এলাকায় প্রবেশ করবে আমার নবীত্ব প্রমাণের নিমিত্তে।'

৬২৮ সালের এ চিঠিটি খ্রীষ্টানদেরকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইসলাম গ্রহণ করতে বলে। তা না করলে তাদেরকে ইসলামের ক্রোধ মোকাবিলা করতে হবে, যার অর্থ যুদ্ধ, মৃত্যু ও ধ্বংস, এবং তার সাথে নারী- শিশুদের দাসত্ব বরণ - যেমনটি নবী ঘটিয়েছিলেন বানু কুরাইজা গোত্রের ভাগ্যে।

৬৩০ সালের অক্টোবরে আইলা গোত্রের যুবরাজের কাছে প্রেরিত চিঠিতে নবী লিখেন: 'হয় (ইসলামে) বিশ্বাস কর, নতুবা জিজিয়া কর দাও। তোমরা জান জিজিয়া কি জিনিস? যদি তোমরা ভূমি ও সমুদ্র পথে নিরাপত্তা চাও, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর নবীকে মেনে নাও। কিন্তু তাঁদেরকে বিরোধিতা ও অসন্তুষ্ট করলে, আমি তোমাদের কাছ থেকে কিছুই নেব না, যতক্ষণ না তোমাদের বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধ হবে এবং ছোটদের বন্দী ও বড়দের হত্যা করবো। কারণ আমি আল্লাহর সত্যিকার নবী।'[129]

---

[129]. Muir, p. 402

এ চিঠির ভাষা অনুযায়ী, দুই বছরের মধ্যে খ্রীষ্টানদের সঙ্গে মুহাম্মদের আচরণের ধরন কিছুটা পাল্টে যায়। এর আগে তাদেরকে বেছে নেয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল: ইসলাম গ্রহণ অথবা মৃত্যু (সে সাথে তাদের নারী শিশুদের দাস করা)। এখন তাদের জন্য তৃতীয় আরেকটা পথ খুলে যায়, সেটি হলো মুহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে 'জিজিয়া' কর প্রদান। বানু কুরাইজা ইহুদীদের গণহত্যার প্রায় দেড় বছর পর ৬২৮ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে খাইবারের ইহুদীদেরকে একই রকম উপায় দেওয়া হয়েছিল। খাইবারের ইহুদীদেরকে পরাজিত করার পর তাদের নারী-শিশুদেরকে দাসরূপে নিয়ে যাওয়া হয়। ইহুদীদের মধ্যে যারা বেঁচে ছিল, তাদেরকে জমিতে উৎপাদিত ফসলের অর্ধাংশ বশ্যতা-কর হিসেবে মুসলিমদেরকে দিতে বাধ্য করা হয়। এবং যতদিন মুসলিমরা চায় ততদিন তারা সে জমিতে বসবাস ও তা চাষ করার সুযোগ পাবে। পরে আল্লাহ এ নতুন দৃষ্টান্তকে খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের প্রতি মুসলিমদের আচরণের চূড়ান্ত বিধানরূপে লিপিবদ্ধ করেন কুরআনের ৯:২৯ নং আয়াতে (প্রত্যাদেশিত ৬৩১ সালে): 'যারা আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিনকে বিশ্বাস করে না, যা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহক নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ হিসেবে মানে না, কিংবা সত্য ধর্মকে (ইসলামকে) গ্রহণ করে না - তারা গ্রন্থপ্রাপ্ত (ইহুদী, খ্রীষ্টান) হলেও তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাও যতক্ষণ না তারা বশ্যতা স্বীকার করে ও বিনীত হয়ে 'জিজিয়া প্রদান করবে।'

ইসলামে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে অধিকতর সুবিধাপ্রাপ্ত 'গ্রন্থভুক্ত লোক' বলে বিবেচনা করা হয়। তথাপি তারা যদি ইসলাম গ্রহণ না করে, মুসলিমদেরকে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে যেতে হবে যতদিন্তনা তারা পরাজিত হয় এবং কর্তৃত্বকারী ইসলামের কাছে অপমান ও বশ্যতার প্রতীকরূপে মাথা নত করে 'জিজিয়া কর' দেয়। এ রায়ের দ্বারা (৯:২৯) আল্লাহ ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে মুসলিমদেরকে আক্রমণের খোলা নির্দেশ দেন। তাদেরকে পরাজিত করার পর মুসলিমরা তাদের নারী-শিশুদেরকে দাস বানাতে পারবে, যেভাবে নবী বানু কুরাইজা ও খাইবারের ইহুদীদের ক্ষেত্রে করেছিলেন। যদি পরাজিত ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা স্বেচ্ছায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেয় এবং অবমাননাকর জিজিয়া কর, ভূমি কর ও অন্যান্য বশ্যতা কর দিতে রাজী হয়, তাহলে তাদেরকে 'ওমরের চুক্তি'র শর্তানুযায়ী নিদারুণ

অনেকগুলো অক্ষমতা নিয়ে ইসলামের শাসনতলে বেঁচে থাকার অনুমতি দেওয়া হবে (পরবর্তী অধ্যায়ে দেখুন)।

এর প্রায় এক বছর পর মুহাম্মদের মৃত্যুর আগে মনে হয় তিনি আবার মত পরিবর্তন করেছিলেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের তৎকালীন ইসলামী ভূখণ্ড আরবাঞ্চল থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেন এই বলে: 'দু'টি ধর্মকে আরব উপদ্বীপে থাকতে দেওয়া যাবে না।' একইভাবে আরব ভূখণ্ড থেকে ইতিমধ্যেই পৌত্তলিকদেরকে নির্মূল করা হয়েছিল। একটা হাদীস এ ব্যাপারে বলে: 'ওমর বিন আল-খাত্তাব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি আল্লাহর নবীকে বলতে শুনেছেন, 'আমি আরব উপদ্বীপ থেকে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের বিতাড়িত করবো এবং সেখানে মুসলিম ছাড়া আর কেউ থাকবে না' (মুসলিম ১৯:৪৩৬৬)। সে মোতাবেক খলীফা ওমর আরব উপদ্বীপকে ইহুদী ও খ্রীষ্টান মুক্ত করেন (বুখারী ৩:৩৯:৫৩)।

ইসলাম পৌত্তলিক, অ্যানিমিস্ট (প্রাণীবাদী) ও নাস্তিক শ্রেণীর লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণ ও মৃত্যু - এ দু'য়ের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার রায় দিয়েছে। কিন্তু খ্রীষ্টান ও ইহুদীদেরকে ইসলামী শাসনের অধীনে চরম অবমানিত ও শোষিত হয়ে মানবেতর জীবনযাপনের সুযোগ দিয়েছে। উল্লেখ্য যে, মুহাম্মদের সময়ে বিশ্ব-জনসংখ্যার বিপুল অংশ ছিল ভারত, চীন, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকায় বসবাসকারী পৌত্তলিক বা বহুঈশ্বরবাদী। এসব জনগণের অনেকেই, বিশেষ করে ভারত ও চীনের জনগণ, প্রাচীনকাল থেকেই গড়ে তুলেছিল মূল্যবান ও সৃজনশীল সভ্যতা। অথচ ইসলাম ধর্মের আগমনের সাথে তাদেরকে নিষ্ঠুরভাবে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হবে অথবা হত্যা করে ভয়ঙ্কর দোজখের আগুনে প্রেরণ করা হবে তৎকালীন একটা সংস্কৃতিহীন ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর দ্বারা, যারা তখন পর্য মানবতার জন্য কোন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে নি।

নবীর জিহাদ ও তার ফলাফল

নবী মুহাম্মদের জিহাদ, অর্থাৎ আল্লাহর পথে নবীর সংগ্রাম বা লড়াই, স্পষ্টতঃই তাঁর সকল কর্মকাণ্ড - হোক তা শান্তিপূর্ণ, ধৈর্যশীল অথবা সামরিক - যা তিনি আরবাঞ্চলে ইসলাম প্রচারে ও ইসলামের ভৌগলিক বিস্তারে প্রয়োগ করেছিলেন, তার সবই অন্তর্র্ভুক্ত। মুহাম্মদের মদীনায় গমনের পর ইসলামে জিহাদের মতবাদ প্রবেশ

করলে তার পর থেকে নবী তাঁর ক্ষুদ্র অনুসারী দলকে ক্রমে ক্রমে আরব উপদ্বীপের সবচেয়ে শক্তিধর সামরিক বাহিনীতে পরিণত করেন। আল্লাহর রাস্তায় তাঁর সংগ্রাম বা জিহাদের সবচেয়ে বড় সফলতা ছিল একটা শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, মদীনায় উদীয়মান একটি খিলাফত। তাঁর যুগান্তরকারী নবীত্বকালে মুহাম্মদ স্পষ্টভাবে জিহাদী কর্মকাণ্ডের তিনটি প্রধান কর্মধারা স্থাপন করে যান। সেগুলো হচ্ছে:

১) ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সহিংসতার প্রয়োগ: অবিশ্বাসীদেরকে, বিশেষতঃ বহুঈশ্বরবাদীদেরকে, জোরপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তরিতকরণ।

২) ইসলামী সাম্রাজ্যবাদ: বহুঈশ্বরবাদী, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের বাসস্থান ও ভূখ- দখল করে ইসলামী রাজ্য ও শাসন কায়েম করণ।

৩) ইসলামী ক্রীতদাসত্ব ও দাস-ব্যবসা: উদাহরণস্বরূপ, বানু কুরাইজা ইহুদী গোত্রের নারী ও শিশুদেরকে দাস বানানো ও কিছু সংখ্যককে বিক্রি করা।

নবী মুহাম্মদ আল্লাহর কড়া তত্ত্বাবধানে জিহাদের এসব প্রতিরূপ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নবীর মৃত্যুর পর মদীনা খিলাফত থেকে ইসলামের পবিত্র বীর বা জিহাদীরা ইসলামের প্রসার ও বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে আরবাঞ্চলের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। ঈশ্বর নির্দেশিত জিহাদ অভিযানকে অগ্রগামী করতে মুসলিম যোদ্ধারা অতি সতর্কতার সাথে নবীর প্রতিষ্ঠিত জিহাদের আদর্শ কর্মধারা তিনটির পুনরাবৃত্তি ঘটাতে থাকে যুগে যুগে।

ইসলামের স্বার্থে যুদ্ধ করার জন্য নবী তাঁর অনুসারীদেরকে এতটাই উৎসর্গীকৃত ও সাহসী করে তুলেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর দশ বছরের মধ্যে মুসলিম জিহাদীরা বিশাল শক্তিশালী পারস্য সাম্রাজ্য দখল করে নেয় এবং সে সময়ে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর সাম্রাজ্য বাইজেনটিয়ামে তাৎপর্যপূর্ণ ও অপরিবর্তনীয় অনুপ্রবেশ ঘটায়। মুহাম্মদের মৃত্যুর এক শতাব্দীর মধ্যে ইসলাম বিশ্বের বৃহত্তম সাম্রাজ্য বা খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে, যা আরব দেশ থেকে ঝড়ের গতিতে বিস্তৃত হয়ে পূর্বে ট্রান্সক্সিয়ানা ও সিন্ধু থেকে শুরু করে মিসর ও উত্তর আফ্রিকার সবটুকু জয় করে পশ্চিমে ইউরোপে ফ্রান্সের প্রাণকেন্দ্রে পৌঁছে যায়। নবীর ইসলাম প্রচার ও প্রসারের আদর্শ কর্মধারাটি পরবর্তীতে ইসলামের বিস্তারে কি ভূমিকা রেখেছিল, তা পরবর্তি

অধ্যায়ে আলোচিত হবে। (নবীর প্রতিষ্ঠিত 'সাম্রাজ্যবাদ' ও চর্চাকৃত 'ক্রীতদাসত্ব' এবং পরবর্তিতে ইসলামে তার চর্চা সম্পর্কে সার্বিক ধারণা পেতে আরও পড়ুন এ লেখকের ইসলামী সাম্রাজ্যবাদ ও ইসলামী দাসত্ব বই দুটো (ব- দ্বীপ প্রকাশন, ২০১২)।

অধ্যায় ৪
ইসলামের প্রসার:
শক্তির জোরে না শান্তিপূর্ণ উপায়ে?

'অতএব পবিত্র মাসগুলো অতিক্রান্ত হলে পৌত্তলিকদের যেখানে পাও হত্যা করো, এবং তাদেরকে বন্দী ও অবরোধ করো, এবং তাদেরকে অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রত্যেক স্তরে ওঁৎপেতে থাকো; কিন্তু তারা যদি অনুশোচিত হয় ও প্রার্থনা (নামাজ) চালিয়ে যায় এবং দরিদ্র কর বা যাকাত প্রদান করে (অর্থাৎ তারা মুসলিম হয়ে যায়), তাদের রাস্তা মুক্ত করে দাও; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।' -- (কুরআন ৯:৫)

'জিহাদের বাধ্যবাধকতার ভিত্তি হলো মুসলিম প্রত্যাদেশের সর্বজনীনতা। ঈশ্বরের কথা ও ঈশ্বরের বার্তা সমগ্র মানবজাতির জন্য; যারা এসব গ্রহণ করেছে তাদের কর্তব্য হলো, যারা তা গ্রহণ করেনি তাদেরকে ধর্মান্তরিত করা অথবা তাদেরকে বশীভূত করতে অবিরাম সংগ্রাম (জিহাদ) করে যাওয়া। এ বাধ্যবাধকতা সময় স্থানের ঊর্ধ্বে। এটা ততদিন চলবে যতদিন না গোটা বিশ্ব ইসলাম গ্রহণ করে অথবা ইসলামী শক্তির কাছে নত হয়।' -- (বার্নার্ড লুইস, দ্য পলিটিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ অব ইসলাম, পৃঃ ৭৩)

'ইসলামের বিস্তার ঘটে সামরিক পন্থায়। মুসলিমদের মাঝে এ ব্যাপারে কৈফিয়ত দেওয়ার একটা ঝোঁক রয়েছে এবং আমাদের সেটি করা উচিত নয়। ইসলামের বিস্তারের জন্য তোমাকে অবশ্যই লড়াই করতে হবে - এটা কুরআনেরই নির্দেশ।' -- (ডঃ আলী ইসা ওসমান, ইসলামী পণ্ডিত, ফিলিস্তিনী সমাজবিদ ও জাতিসংঘের 'রিলিফ এ্যান্ড

ওয়ার্কস এজেন্সি অন এডুকেশন'- এর উপদেষ্টা, দ্য মুসলিম মাইন্ড, পৃঃ ৯৪)

ইসলামের বিস্তারে প্রাথমিক যুদ্ধসমূহ

ইসলামের বিস্তৃতি ঘটেছিল সহিংসতার মাধ্যমে নাকি শান্তিপূর্ণ প্রচারকার্যের (দাওয়া) মাধ্যমে, এ প্রশ্নে দীর্ঘকাল ধরে বিতর্ক চলে আসছে, যা সামপ্রতিক দশকগুলোতে আরো জোরালো হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে ইন্টারনেট অনুসন্ধান করলে বহু ইসলামপন্থী লেখকের প্রচুর নিবন্ধ, মন্তব্য বা পুস্তক চোখের সামনে হাজির হয়, যার মাধ্যমে তারা ইসলামের বিস্তৃতিতে সহিংসতার প্রয়োগকে শক্তভাবে অস্বীকার করতে চান। যাহোক নবী মুহাম্মদ কর্তৃক ইসলামের প্রতিষ্ঠা (ইতিমধ্যে আলোচিত) ও তার পরবর্তী ইতিহাসে (এ বইয়ে আলোচিত হবে) অসংখ্য রক্তক্ষয়ী লড়াই ও যুদ্ধ ছড়িয়ে- ছিটিয়ে রয়েছে, যা হাজার হাজার, লাখ লাখ মানুষের প্রাণ ছিনিয়ে নিয়েছে। সে আলোচনায় যাবার আগে প্রতিষ্ঠাকালীন বছর ও দশকগুলোতে ইসলামের রক্তাক্ত ইতিহাসের দিকে প্রথমে একটু নজরপাত করা যাক।

ধার্মিক ইসলামী ইতিহাসবিদদের দ্বারা লিখিত নবী মুহাম্মদের জীবনীতে মদীনায় বসবাসকালীন তাঁর জীবনের শেষ ১০ বছরে নবী কর্তৃক পরিচালিত বা নির্দেশিত ৭০ থেকে ১০০টি ব্যর্থ বা সফল আক্রমণ, লুণ্ঠন অভিযান ও যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর মধ্যে ১৭ থেকে ২৯টিতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। নীচে নবীর পরিচালিত বা নির্দেশিত প্রধান প্রধান অভিযান ও যুদ্ধসমূহের একটি তালিকা দেওয়া হলো:

৬২৩ সাল - ওয়াদ্দানের যুদ্ধ
৬২৩ " - সাফওয়ানের যুদ্ধ
৬২৩ " - দুল- আশিরের যুদ্ধ
৬২৪ " - নাখলার যুদ্ধ
৬২৪ " - বদরের যুদ্ধ
৬২৪ " - বানু সালিমের যুদ্ধ
৬২৪ " - ঈদ- উল- ফিতর ও যাকাত- উল- ফিতরের যুদ্ধ
৬২৪ " - বানু কাইনুকার যুদ্ধ
৬২৪ " - সাউইক- এর যুদ্ধ
৬২৪ " - ঘাতফানের যুদ্ধ

৬২৪ ” - বাহরাইনের যুদ্ধ
৬২৫ ” - ওহুদের যুদ্ধ
৬২৫ ” - হুমরা- উল- আসাদের যুদ্ধ
৬২৫ ” - বানু নাদিরের যুদ্ধ
৬২৫ ” - ধাতুর- রিকার যুদ্ধ
৬২৬ ” - বাদরু- উখরার যুদ্ধ
৬২৬ ” - দুমাতুল- জান্দালের যুদ্ধ
৬২৬ ” - বানু মুস্‌তালাক নিকাহ’র যুদ্ধ
৬২৭ ” - খন্দকের যুদ্ধ
৬২৭ ” - আহজাব’এর যুদ্ধ
৬২৭ ” - বানু কুরাইজার যুদ্ধ
৬২৭ ” - বানু লাহিয়ানের যুদ্ধ
৬২৭ ” - ঘাইবা’র যুদ্ধ
৬২৭ ” - খাইবারের যুদ্ধ
৬২৮ ” - হুদাইবিয়া অভিযান
৬৩০ ” - মক্কা বিজয়
৬৩০ ” - হুনসিনের যুদ্ধ
৬৩০ ” - তাবুকের যুদ্ধ

৬৩২ সালে নবী মুহাম্মদ মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর শ্বশুর আবু বকর ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম খলীফা হন। ইসলামের ধর্মীয় প্রসার ও আওতা সমপ্রসারণে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ অব্যাহত থাকে:

৬৩৩ সালে - ওমান, হাদ্রামাউত, কাজিমা, ওয়ালাজা, উলেইস ও আনবারের যুদ্ধ

৬৩৪ সালে - বসরা, দামাস্কাস ও আজ্‌নাদিনের যুদ্ধ

খলীফা আবু বকর মারা যান ৬৩৪ সালে। নবীর অপর এক শ্বশুর ও সহচর ওমর আল- খাত্তাব দ্বিতীয় খলীফা হন। তার পরিচালনাধীনে ইসলামের ভূখণ্ড বিস্তারে যুদ্ধবিগ্রহ জোরদার হয়ে উঠে:

৬৩৪ সালে - নামারাক ও সাকাতিয়ার যুদ্ধ
৬৩৫ সালে - সেতু (ব্রীজ), বুওয়াইব, দামাস্কাস ও ফাহ্‌ল- এর যুদ্ধ
৬৩৬ সালে - ইয়ারমুক, কাদিসিয়া ও মাদাইনের যুদ্ধ
৬৩৭ সালে - জালুলার যুদ্ধ
৬৩৮ সালে - ইয়ারমুকের যুদ্ধ, জেরুজালেম ও জাজিরা বিজয়

৬৩৯ সালে - খুজইজিস্তান বিজয় ও মিসর আক্রমণ
৬৪১ সালে - নিহাওয়ান্দ- এর যুদ্ধ
৬৪২ সালে - পারস্যের রেই- এর যুদ্ধ
৬৪৩ সালে - আজারবাইজান বিজয়
৬৪৪ সালে - ফারস ও খারান বিজয়

খলীফা ওমর ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি ৬৪৪ সালে খুন হলে নবীর এক জামাতা ও সহচর ওসমান পরবর্তী খলীফা হন এবং ইসলামের বিস্তারে যুদ্ধ অব্যাহত থাকে:

৬৪৭ সালে - সাইপ্রাস দ্বীপ বিজয়
৬৪৮ সালে - বাইজেনটাইনের বিরুদ্ধে অভিযান
৬৫১ সালে - বাইজেনটাইনের বিরুদ্ধে নৌযুদ্ধ
৬৫৪ সালে - উত্তর আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে ইসলাম

খলীফা ওসমান খুন হন ৬৫৬ সালে। নবীর কন্যা ফাতিমার স্বামী আলী পরবর্তী খলীফা হন। মুহাম্মদের মৃত্যুর দুই দশক পরবর্তী এ সময়ে আভ্যন্তরীণ মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব মুসলিম সমপ্রদায়কে দুর্দশাগ্রস- করে তোলে। এ সময় ইসলামের ভিতরে দলাদলি ও যুদ্ধ শুরু হয়, যেমন আলী ও নবীর স্ত্রী আয়েশার মধ্যে সংঘটিত 'উটের যুদ্ধ' এবং আলী ও মুয়াবিয়ার মধ্যে সংঘটিত সিফিনের যুদ্ধ। এর ফলে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অনেকটা নিস্তেজ হয়ে যায়। খলীফা আলীর অধীনে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে মাত্র দু'টি উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়:

৬৫৮ সালে - নাহ্‌রাওয়ানের যুদ্ধ
৬৫৯ সালে - মিসর বিজয়

৬৬১ সালে বিষাক্ত ছুরির আঘাতে আলী খুন হন। আলীর খুন সঠিকভাবে পরিচালিত খলীফাদের রাজত্ব বা খলীফায়ে রাশেদীনের যুগের সমাপ্তি টানে। এরপর মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে উমাইয়া বংশ ক্ষমতায় আসে এবং ইসলামী সাম্রাজ্যের বিজয়যুদ্ধ পুনরায় চাঙ্গা হয়ে উঠে:

৬৬২ সালে - মিসর ইসলামের শাসনাধীনে আসে
৬৬৬ সালে - মুসলিমদের দ্বারা সিসিলি আক্রান্ত হয়
৬৭৭ সালে - কনস্টান্টিনোপল অবরোধ
৬৮৭ সালে - কুফার যুদ্ধ
৬৯১ সালে - দ্বার- উল- জালিক- এর যুদ্ধ
৭০০ সালে - উত্তর আফ্রিকায় সামরিক অভিযান

৭০২ সালে - দ্বার- উল- জামিরার যুদ্ধ
৭১১ সালে - জিব্রাল্টার আক্রমণ ও স্পেন বিজয়
৭১২ সালে - সিন্ধু বিজয়
৭১৩ সালে - মুলতান বিজয়
৭১৬ সালে - কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ
৭৩২ সালে - ফ্রান্সের টুর- এর যুদ্ধ
৭৪০ সালে - নোবল- এর যুদ্ধ
৭৪১ সালে - উত্তর আফ্রিকার বাগদৌরার যুদ্ধ
৭৪৪ সালে - আইন আল জুর- এর যুদ্ধ
৭৪৬ সালে - রূপার ঠুঠার যুদ্ধ
৭৪৮ সালে - রেই' এর যুদ্ধ
৭৪৯ সালে - ইসপাহান ও নিহাওয়ান্দ- এর যুদ্ধ
৭৫০ সালে - জাব- এর যুদ্ধ
৭৭২ সালে - উত্তর আফ্রিকার জানবী'র যুদ্ধ
৭৭৭ সালে - স্পেনের সারাগোসার যুদ্ধ।

এ সময়কালে অনেক ক্ষুদ্র ও ব্যর্থ অভিযান চালানো হয়, যেগুলো এ তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। যেমন দ্বিতীয় খলীফা ওমরের শাসনকালে ৬৩৬ সালে ভারত সীমান্ত আক্রমণ শুরু করা হয়েছিল। ভারতে ইসলামের স্থায়ী পদাঙ্ক স্থাপনের জন্য আট দশক ধরে বহুবার উদ্যোগ নেয়ার পর অবশেষে সাফল্য মেলে ৭১২ সালে যখন মোহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু জয় করেন। এ দীর্ঘ তালিকার সাথে আমরা পরবর্তী শতাব্দীতে বিভিন্ন সীমানে- যুদ্ধের উপর আরো একটি দীর্ঘ তালিকা যুক্ত করতে পারি, যেমন ১০০০ সালে গজনীর সুলতান মাহমুদ কর্তৃক ভারত আক্রমণ শুরুর পর যতদিন মুসলিমরা ভারতের ক্ষমতায় ছিল ততদিন যুদ্ধবিগ্রহ ও সহিংসতা বিক্ষিপ্তভাবে চলমান থাকে। উমাইয়া খলীফা মুয়াবিয়া (শাসনকাল ৬৬১- ৮০) পাঁচ বছর ধরে (৬৭৪- ৭৮) কনস্টান্টিনোপল অধিকারের চেষ্টা করেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি বেশ কয়েকটি ব্যর্থ আক্রমণ পরিচালনা করেন। পরে ৭১৬ সালে কনস্টান্টিনোপল অধিকারের প্রচেষ্টা পুনরুজ্জীবিত করা হয়। সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়, যাতে মুসলিমরা অবর্ণনীয় ক্ষতি ভোগ করে। পরবর্তী শতাব্দী জুড়ে কনস্টান্টিনোপল দখলের জন্য আরও চেষ্টা চালানো হয়।

অবশেষে ১৪৫৩ সালে খ্রীষ্টান ধর্মের এ লোভনীয় কেন্দ্রস' লটি মুসলিমদের কব্জায় আসে।

অমুসলিমদের বিরুদ্ধে নবী মুহাম্মদ ও তাঁর পরবর্তী খলীফাগণ ও অন্যান্য মুসলিম শাসক কর্তৃক আক্রমণাত্মক রক্তাক্ত ইতিহাসের এ সুদীর্ঘ তালিকা সত্ত্বেও মুসলিমরা ওসব রক্তঝরানো নৃশংসতা সম্পর্কে মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে দেখাতে সক্ষম যে, মুহাম্মদ একজন শান্তিকামী মানুষ ছিলেন এবং দুনিয়াভর অমুসলিমরা ইসলাম গ্রহণ করেছিল ইসলাম ধর্মের শান্তিপ্রিয়তা ও ন্যায়পরায়ণতায় আকৃষ্ট হয়ে। এ অধ্যায়ে মুসলিমদের এ যুক্তিগুলোর বিস্তারিত আলোচনা হবে, প্রধানত মধ্যযুগের ভারতে মুসলিম শাসকদের অধীনে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির আলোকে। এটা বিশেষ উল্লেখ্য যে, ভারতে ইসলামের হানাফী মাহজাব প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা ইসলামের চারটি প্রধান আইনশাস্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে উদার ও নমনীয়। কেবলমাত্র এ শাস্ত্রটি মূর্তিপূজক বা পৌত্তলিকদেরকে কুরআন (৯:৫) প্রদত্ত মৃত্যু অথবা ইসলাম গ্রহণের বিধানটি লঙ্ঘন করে তাদেরকে ইসলামের শাসনাধীনে জিম্মি'র মর্যাদায় উন্নীত করে ধর্মীয় স্বাধীনতাসহ জীবনধারণের অধিকার দিয়েছে।

ইসলামের প্রসারে কুরআনের নির্দেশ ও নবী স্থাপিত আদর্শ

নবী মুহাম্মদের নবীত্বের মক্কার অধ্যায়টির সঙ্গে কোনো অস্ত্রশস্ত্র যুক্ত ছিল না, যদিও তাঁর বার্তা মক্কারবাসীর ধর্ম, প্রথা ও পূর্বপুরুষ সম্পর্কে অপমানকর ছিল। প্রথম দিকে তাঁর দল খুব ছোট থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু বিবৃতির মধ্যে মুহাম্মদ তাঁর ভবিষ্যৎ সহিংসতার ইচ্ছা প্রদর্শন করেন। ইতিমধ্যে উল্লিখিত নবীর এক বিবৃতি - 'হে কুরাইশরা! আমি অবশ্যই সুদসহ তোমাদের উপর এর পরিশোধ নেবো' - সুস্পষ্টরূপে তাঁর ভবিষ্যৎ সহিংসতার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। নবুয়তীর প্রথম পাঁচ বছরে রচিত কিছুসংখ্যক আয়াতও কুরাইশদেরকে ইহলৌকিক শাস্তি প্রদানের কথা বলে। যেমন কুরআন ৭৭:১৬-১৭ তাদেরকে ধ্বংস করার হুমকি দেয়। কুরআন ৭৭:১৮ কুরাইশদের হুমকি দেয়: 'এভাবে আমরা অপরাধীদেরকে শায়েস্তা করবো।' কিন্তু এ পর্যায়ে এসব ইহলৌকিক শাস্তি আসবে আল্লাহর কাছ থেকে। ৬১৯ সালে নবী যখন অন্যত্র আশ্রয়ের খোঁজে তা'য়েফে যান, সেখানেও তিনি কুরাইশদের বিরুদ্ধে শত্রুতা প্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি

তা'য়েফবাসীদেরকে মক্কার কুরাইশদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ও নবীর পক্ষে যুদ্ধ করার প্ররোচনায় সচেষ্ট হন।

মুহাম্মদ মদীনায় স্থানান্তরের পূর্বে 'আকাবার দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞায়' তিনি সুস্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে তাঁর সহিংসতার ইচ্ছাটি প্রকাশ করেন। এ অঙ্গীকার বা প্রতিজ্ঞায় তিনি মদীনার শিষ্যদের কাছ থেকে রক্ত দিয়ে নবীর নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। এ প্রতিজ্ঞার কী প্রয়োজন ছিল? মক্কা ও মদীনার মত আরব শহরগুলোতে বিদেশ থেকে জনগণ আসতো, ব্যবসা স্থাপন করতো, এমনকি শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মপ্রচারও করতো। মুহাম্মদ যদি মদীনায় শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের জন্যই যেতেন, কেউ তাঁকে ক্ষতি করতে আসতো না। এক বছর আগে তিনি মূসাবকে মদীনায় পাঠালে সেখানে সে সক্রিয়ভাবে ইসলাম প্রচার করে বহু লোককে ইসলামে দীক্ষিত করে। এর জন্য মদীনার লোকদের কাছ থেকে তাকে কোনরকম শত্রুতামূলক ব্যবহার ভোগ করতে হয়নি। অতএব মুহাম্মদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন হয়েছিল এ কারণে যে, তিনি ইতিমধ্যেই মদীনায় পৌঁছে সহিংস কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন: প্রথমত কুরাইশদের বিরুদ্ধে; অতঃপর সমগ্র মানবতার বিরুদ্ধে বৈশ্বিক পর্যায়ে আল্লাহর বিশুদ্ধ ধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে (পরবর্তী অধ্যায়ে দেখুন)।

নবীর মদীনায় স্থানান্তরের পরপরই তাঁর কর্মকাণ্ডের ধারা সম্পূর্ণরূপে পাল্টে যায়। আকাবার দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার মাধ্যেমে নবী কর্তৃক অবিশ্বাসী বিশ্বের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল তা অচিরেই শুরু হয়ে যায়। মুহাম্মদ ও তাঁর শিষ্যদেরকে কুরাইশদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরায় উদ্বুদ্ধ করতে জিহাদী আয়াতগুলো শীঘ্রই আল্লাহর নিকট থেকে নেমে আসতে থাকে। কুরাইশদের বিরুদ্ধে শাস্তি এখন থেকে নির্দিষ্ট হবে মুহাম্মদ ও তাঁর শিষ্যদের হাত দিয়ে, আল্লাহর হাত দিয়ে নয় এবং এ যুদ্ধকালে যারা মারা যাবে তারা পরবর্তি জীবনে আল্লাহর অপার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে। সুতরাং আল্লাহ বলেন: 'এরূপে (তোমরা আদেশ প্রাপ্ত): কিন্তু আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিজেই তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি (তোমাদেরকে লড়াই করতে দিচ্ছেন) তোমাদের পরীক্ষার জন্য (আল্লাহর প্রতি ভক্তির)। যারা আল্লাহর পথে লড়াইয়ে নিহত হবে, তারা কখনও তাদের কর্মফল হারাবে না' (কুরআন ৪৭:৪)।

বিন ওমর বর্ণিত এক হাদিসে নবী নিজে এ ব্যাপারে ছিলেন সম্পূর্ণ অকপট। আল্লাহর নবী বলেন: ‘আমি আল্লাহ কর্তৃক জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদেশপ্রাপ্ত, যতক্ষণ না তারা ঘোষণা করছে যে আল্লাহ ছাড়া কারো উপাসনা পাওয়ার অধিকার নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর নবী। এবং সঠিকভাবে নামাজ আদায় করে ও বাধ্যতামূলক বা দাতব্য প্রদান করে। যদি তারা তা পালন করে, তাহলে আমার নিকট থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ হবে এবং তারপর আল্লাহ তাদের হিসাব নিবেন’’ (বুখারী ১:২৪)।

মুহাম্মদ যখন ইনে-কাল করেন তখন মক্কা ও মদীনা অবিশ্বাসী শূন্য করা হয়েছিল। কুরআনের ৯:৫ নং আয়াত অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণ অথবা মৃত্যুবরণ - এ শর্ত দিয়ে নবী ইতিমধ্যে নব-প্রতিষ্ঠিত আরবের ইসলামী রাষ্ট্র থেকে মূর্তি-উপাসনা সম্পূর্ণ নির্মূল করেছিলেন। অবশিষ্ট কিছু ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা তখনো আরব উপদ্বীপের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে থেকে গিয়েছিল। নবীর মৃত্যুকালীন ইচ্ছানুযায়ী ওসব ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে তাঁর উত্তরাধিকারীরা বহিষ্কার করে। কিন্তু আরব ভূখণ্ডের বাইরে ইসলাম-বিজিত দেশগুলোতে তাদেরকে নিজ নিজ ধর্মসহ বেঁচে থাকার সুযোগ দেওয়া হয়, যদিও অবমানিত ও শোষিত ‘জিম্মি’ প্রজারূপে।

সুতরাং কুরআনের নির্দেশ অনুসারে নবী-স্থাপিত ইসলাম বিস্তারের আদর্শ নমুনায় মৃত্যু যন্ত্রণা দিয়ে পৌত্তলিক বা মূর্তি-উপাসকদের ধর্মান্তরিত করা হয়। ইহুদীদের ক্ষেত্রে নবী তাদেরকে আক্রমণ ও জন্মভূমি থেকে বহিষ্কার করার রীতি প্রতিষ্ঠা করেন, যেমনটা করেছিলেন বানু কাইনুকা ও বানু নাদিরের ক্ষেত্রে। বানু কুরাইজার ক্ষেত্রে মুহাম্মদ তাদেরকে আক্রমণ করে তাদের সাবালক পুরুষদের সবাইকে হত্যা করেন এবং তাদের নারী-শিশুদেরকে দাস বানানোর মাধ্যমে ধর্মান্তরিত করে মুসলিম বানান। খাইবারের ইহুদীদের পরাজিত করে তাদের নারী-শিশুদেরকে দাসরূপে নিয়ে যাওয়া হয়। পুরুষদের মধ্যে যুদ্ধের পর যারা বেঁচে গিয়েছিল, তাদেরকে জমি চাষবাসের সুযোগ দেওয়া হয় উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক বশ্যতা কর রূপে মুসলিমদেরকে প্রদানের শর্তে। তারা তাদের জমি ভোগ করবে যতদিন না মুসলিমরা তা চাষবাসের জন্য যথেষ্ট মুসলিম শ্রমিকের ব্যবস্থা করতে পারে।

খ্রীষ্টানদের ক্ষেত্রে, নবী যখন খ্রীষ্টান রাজা ও যুবরাজদের কাছে দূত পাঠান, তিনি দাবী করেন যে, হয় তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করুক, নইলে তাঁর যোদ্ধাদের নৃশংসতা মোকাবিলা করুক। অন্য এক ঘটনায় তিনি খ্রীষ্টানদের আদেশ করেন তাদের সন্তানদেরকে ব্যাপটাইজ না করার জন্য, যাতে করে সেসব সন্তানরা ইসলামে অঙ্গীভূত হয়ে যায়। কুরআনের ৯:২৯ নং আয়াতটিতে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে শেষ পর্যন্ত 'জিম্মি' প্রজার মর্যাদা দেওয়া হয়। তাদেরকে মুসলিমরা আক্রমণ করে পুরুষদেরকে হত্যা করতে পারবে, পারবে তাদের নারী ও শিশুদেরকে দাস হিসেবে কব্জা করতে এবং অবশিষ্টরা নিজস্ব ধর্মচর্চাসহ বেঁচে থাকার সুযোগ পাবে, যদি তারা অবমাননাকর জিম্মি প্রজার জীবন মেনে নেয় (নিচে ওমরের চুক্তি দেখুন)।

মক্কায় মুহাম্মদের ১৩ বছর নবীত্বকালে তিনি প্রায় ১৫০ জনকে ধর্মান্তর করতে পেরেছিলেন, যা ছিল অনেকটা শান্তিপূর্ণ। কিন্তু মদীনায় তাঁর নবীত্বের শেষ ১০ বছর ছিল অত্যন্ত সংঘাত ও সহিংসতাপূর্ণ। এ সময় তিনি অমুসলিম বাণিজ্য- কাফেলার উপর লুণ্ঠন অভিযান ও অমুসলিম সমপ্রদায়ের উপর আক্রমণে লিপ্ত হন। এ প্রক্রিয়ায় বিধর্মীদেরকে গণহারে হত্যা, উচ্ছেদ ও দাসত্বকরণ অথবা মৃত্যু যন্ত্রণা দিয়ে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়।

মুহাম্মদের নবীত্বের মক্কা পর্ব ছিল পুরোপুরি ব্যর্থ। সুতরাং তাঁর নবীত্বের মদীনাস' সহিংস অধ্যায়টি, যা ইসলামকে একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করায়, তা হয়ে দাঁড়ায় ইসলামের বিস্তারে নবীর প্রধান কর্ম-প্রক্রিয়া। উল্লেখ্য যে, মুহাম্মদ ইসলাম প্রচারে ভবিষ্যতে সহিংসতা প্রদর্শন করবেন এমন ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন মক্কায় অবস্থানকালেই, যখন তিনি ছিলেন সামরিকভাবে অতিশয় দুর্বল। তাঁর সমপ্রদায় সামরিকভাবে সবল হলে মক্কাতেই তিনি সহিংসতা শুরু করে দিতে পারতেন। কুরআন ও আল- বুখারী হাদীসের অনুবাদক এবং মদীনার ইসলামীক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ মুহসিন খান এ সম্ভাবনার সাথে একমত। তিনি বলেন: 'প্রথমে যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল, তারপর অনুমোদন পায় এবং পরে একে বাধ্যতামূলক করা হয়।[1] কেন স্বর্গ থেকে জিহাদের অনুমতি ধীরে ধীরে আসে, সে বিষয়ে ডঃ

---

1. Khan M. M. (1987) Introduction, in the *Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari*, Kitab Bhavan, New Delhi, Vol, I, P. XXVI

সোবিহ্‌- আস- সালেহ মধ্যযুগের মেধাবী মিসরীয় ধর্মবিশারদ ইমাম জালালুদ্দিন আল- সুয়ুতির (মৃত্যু ১৫০৫ সাল; তিনি 'ইবনে আল কুতুব' বা 'পুস্তকের সন্তান' নামে সবিশেষ পরিচিত) উদ্ধৃতি দিয়েছেন এভাবে: 'মুসলিমরা শক্তিশালী না হওয়া পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমোদন বিলম্ব করা হয়েছিল। যখন তারা দুর্বল ছিল তখন তাদেরকে ধৈর্যধারণ করে সহ্য করার আদেশ দেওয়া হয়।' [2] ডঃ আস- সালেহ মিসরের আরেক বিখ্যাত মধ্যযুগীয় ধর্মশাস্ত্রবিদ আবু বকর আজ- জারকাশী (মৃত্যু ১৪১১)'র মতামত যুক্ত করেন: 'সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহ মুহাম্মদের দুর্বল অবস্থায় পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেন, তাঁর (মুহাম্মদ) ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে। কারণ তিনি যদি এ দুর্বল অবস্থায় যুদ্ধের আদেশ দিতেন, তাহলে তা অত্যন্ত বিপর্যয়কর ও অসুবিধাজনক হতো। কিন্তু ইসলাম যখন শক্তিশালী হয়ে উঠে, তখন তিনি নবীকে নির্দেশ করেন যা পরিস্থিতির সাথে মানানসই ছিল - অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থ অনুসারীদেরকে স্বধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম হতে অথবা বশ্যতা কর দিতে, আর পৌত্তলিকদেরকে মুসলিম হতে কিংবা মৃত্যুর স্বাদ বরণ করতে।'[3]

সুতরাং এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সতর্কতার সাথে রচিত স্বর্গীয় বাণী বা আয়াত দ্বারা প্ররোচিত সহিংসতাই ছিল নবী মুহাম্মদের ইসলাম প্রচার ও মদীনায় একটি উদীয়মান ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাণশক্তি। সহিংস জিহাদ হলো ইসলামের প্রাণ, যার বিনা ইসলাম হয়তো- বা সপ্তম শতাব্দীতেই মৃত্যুবরণ করতো। নবীর ইসলাম বিস্তারের এ আদর্শ প্রক্রিয়া বা রূপরেখা তাঁর উত্তরাধিকারী মুসলিম খলীফা ও শাসকবর্গ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে গ্রহণ ও তার বাস্তব প্রয়োগ করেন। ইসলামের কর্তৃত্বের শেষকালেও অটোমান জিহাদীরা বলকান ও পূর্ব ইউরোপকে সহিংস জিহাদের আগুনে বিধ্বস্ত করছিল; এবং ১৬৮৩ সালে তারা দ্বিতীয়বারের জন্য ইউরোপ ও পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস' ল ভিয়েনার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। একই সময়ে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব (রাজত্ব ১৬৫৮- ১৭০৭) ভারতকে সহিংস জিহাদের ধ্বংসযজ্ঞে জর্জরিত করছিল হাজার হাজার হিন্দু ধর্মমন্দির

---

2. Sobhy as-Saleh (1983) *Mabaheth Fi 'Ulum al-Qur'an*, Dar al-'llm Lel-Mayayeen, Beirut, p. 269
3. Ibid, p. 270

ধ্বংস এবং হিন্দু ও অন্যান্য অমুসলিমদেরকে জবরদস্তীমূলকভাবে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করে (নীচে আলোচিত)।

ইসলামের বিস্তারে যুদ্ধের বিষয়ে মুসলিম পণ্ডিতদের ভাষ্য

মুসলিমদের জন্য রক্তের বন্যা বহানো ইসলামের যুদ্ধের বিশাল তালিকা উপেক্ষা করা দুঃসাধ্য, বিশেষত সমালোচকরা যখন 'ইসলাম তরবারীর দ্বারা বিস্তৃত' বলে সমালোচনা করে। এসব যুদ্ধের অনেকগুলোই সংঘটিত হয় ইসলামের প্রাণকেন্দ্র আরব দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে। কেউ যদি মুসলিমদের দাবী অনুযায়ী বিশ্বাস করে যে, এসব অগণিত যুদ্ধ ছিল ইসলামের পক্ষ থেকে আত্মরক্ষামূলক, তাকে হতে হবে চরম বা উপহাসমূলকভাবে বিশ্বাসপ্রবণ। আরব উপদ্বীপের মুসলিম জন্মভূমি কখনোই পারস্য, স্পেনীয় বা ভারতীয়দের আক্রমণের শিকার হয় নি। ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানীতে এক বক্তৃতায় পোপ বেনেডিক্ট ১৩৯১ সালে বাইজেন্টাইন সম্রাট ও এক মুসলিম পণ্ডিতের মধ্যে ঘটিত এক আলোচনার[4] উল্লেখ করে ইসলামের সহিংস স্বভাবের কথা বলায় মুসলিম বিশ্ব প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠে। তারা এমন সহিংসতা ও বর্বরতা শুরু করে দেয় যে, বেশ কয়েকটি গীর্জায় অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর করা হয় এবং বেশ কিছু লোক মারা যায়। ব্রিটেনের (সোমালিয়ারও) মোল্লারা নবীকে অপমান করার অভিযোগে পোপকে হত্যার হুমকীও দেয়।[5] এ ঘটনায় মুসলিমরা যে লাগামহীন বর্বরতা, সহিংসতা ও সন্ত্রাসী প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে, তা কেবল ইসলাম সম্পর্কে পোপের অভিযোগের সত্যতাই প্রমাণ করে।

এ ধরনের অভিযোগে একদিকে অধিকাংশ মুসলিম সহিংস প্রতিবাদে লিপ্ত হয়, অপরদিকে ইসলামী পণ্ডিতরা সে অভিযোগ খণ্ডাতে কলম তুলে নেয়। আজকের প্রভাবশালী মুসলিম পণ্ডিত ডঃ শেখ ইউসুফ আল-কারাদাউই, যাকে লন্ডনের মেয়র কেন্‌লিভিংস্টোন ইসলামী বিশ্বে শান্তি ও উদারতার কণ্ঠস্বর হিসেবে আলিঙ্গন করেছেন, তিনি পোপের মন্তব্যের নিন্দা করেন এভাবে:

---

[4]. Pope quoted Emperor Manuel II Palaeologus (1391): "Show me just what Muhammad brought that was new, and there you will find things only evil and inhuman, such as his command to spread by the sword the faith be preached."

[5]. Doughty S and Medermott N (2006) *The Pope must die, says Muslim,* Daily Mail (UK), 18 September.

পোপ ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কুরআন ও নবী মুহাম্মদের হাদীস না পড়ে, বাইজেন্টাইন সম্রাট ও পারস্যের মুসলিম বুদ্ধিজীবীর মধ্যেকার আলোচনার উদ্ধৃতিকে যথেষ্ট মনে করে ইসলাম সম্পর্কে মন্তব্যটি করেছেন... নবী মুহাম্মদ যে কেবলমাত্র অপকর্ম ও অমানবিকতা এনেছেন পৃথিবীতে, যেমন তরবারীর দ্বারা ইসলামের বিস্তার, এমন কথা বলা কার্যত মিথ্যা অপবাদ বা খাঁটি অজ্ঞতা ছাড়া কিছুই নয়।[6]

অপর এক মেধাবী ইসলামী পণ্ডিত হলেন ডঃ জাকির নায়েক, যিনি ইসলামীক রিসার্চ ফাউন্ডেশন (মুম্বাই, ভারত)-এর প্রেসিডেন্ট। ইসলামের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও যুক্তিবাদী কণ্ঠস্বরের জন্য তিনি মুসলিম বিশ্বে বিশেষ সমাদৃত। আল-কারাদাউই এবং জাকির নায়েক উভয়েই সহিংসতার মাধ্যমে ইসলাম বিস্তারের অভিযোগের ব্যাখ্যা দিয়ে একে ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের মাঝে সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত 'ব্যাপক ভুল ধারণা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এখানে ইসলামের এ দুই বিখ্যাত পণ্ডিতের যুক্তি আলোচিত হবে। নবী মুহাম্মদ ও তাঁর পরবর্তি খলীফাগণ যেসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, সে সম্পর্কে আল-কারাদাউই চারটি অজুহাত লিপিবদ্ধ করেছেন:[6]

১. ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা
২. বিদেশী শাসকদের অত্যাচার দমন
৩. অত্যাচারী শাসকের নিপীড়নের হাত থেকে দুর্বল দেশগুলোকে মুক্ত করা
৪. অত্যাচার-নিপীড়ন দূর করা

ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা

ইসলামের প্রথম যুগে মুসলিম শাসকগণ কর্তৃক বিদেশী রাজ্যগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে সুবিজ্ঞ আল-কারাদাউই লিখেছেন:

. . . মদীনার উদীয়মান মুসলিম রাষ্ট্রকে শুধুমাত্র তার সার্বভৌমত্ব প্রদর্শনই করতে হয়নি, সমগ্র মানবজাতির কাছে ক্ষমাশীলতা ও ন্যায় বিচারের এবং তা চর্চা করার জন্য একটা আদর্শের বার্তাও পৌঁছাতে

---

6. Islam Online, *Muslim Insist on Pope's Apology*, 15 Sept, 2006; http://www.islamonline.net/English/News/2006-09/15/01.shtml

6. Islam Online, *Muslim Insist on Pope's Apology*, 15 Sept, 2006; http://www.islamonline.net/English/News/2006-09/15/01.shtml

হয়েছে। এরূপ পরিবর্তন করতে চাওয়া যে কোন রাষ্ট্রকে সে সময়ের বৃহৎ শক্তিবর্গের (বাইজেন্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্য) শত্রুতা ও আক্রমণের মুখে স্বাভাবিকভাবেই পড়তে হতো। এ শক্তিগুলো উদীয়মান মুসলিম রাষ্ট্রকে তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে হুমকী হিসেবে দেখেছে। তারা (মুসলিমরা) বিশ্বাস করতো, এটা দুই দলের মধ্যে অনিবার্যরূপে একটা সংঘাত সৃষ্টি করবে। সুতরাং মুসলিমরা সে সময়ে, আজ যাকে বলা হচ্ছে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ, তা গ্রহণ করার মতো অবস্থানে ছিল, যাতে করে তারা যেসব দেশের সাথে মুসলিম রাষ্ট্রের আদর্শ ও স্বার্থে ভিন্নতা রয়েছে, প্রতিবেশী সেসব দেশের সম্ভাব্য হুমকির বিরুদ্ধে নিজেদের ভূখণ্ডকে রক্ষা করতে পারে।

আল- কারাদাউই কোন্ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের কথা বলেছেন, তা নির্দিষ্ট করেন নি। প্রথমতঃ মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র এলো কোথা থেকে? সেখানে নবী কি শরণার্থী ছিলেন না? একজন শরণার্থী বসতিস্থাপনকারী হিসেবে নবী মদীনার উপর নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠার কী দাবী থাকতে পারে?

মদীনায় নবীর ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে ছাড় দিয়ে চলুন দেখি তিনি কী উপায়ে সে রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা করেন! বানু কাইনুকা ইহুদীরা কি মুসলিমদের উপর কোন হামলা করেছিল, যা মুহাম্মদকে কোনরূপ সুযোগ না দিয়ে ৬২৪ সালে তাঁর ঘাড়ে ইহুদী সমপ্রদায়টির উপর প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়? উল্লেখ্য যে, বানু কাইনুকার উপর মুহাম্মদের এ আক্রমণটি ঘটে মদীনার পৌত্তলিক ও ইহুদীরা দয়া পরবশ হয়ে সেখানে তাঁকে আশ্রয় দানের মাত্র দেড় বছর পর।

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, মুহাম্মদ বানু কাইনুকা ইহুদী সমপ্রদায়কে আক্রমণ করেন এক ইহুদী বালকের দুষ্টুমি করে এক মুসলিম মহিলাকে উত্ত্যক্ত করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এজন্য এক মুসলিম ঐ ছেলেটিকে হত্যা করে। পরবর্তীতে ইহুদীরাও সে মুসলিমকে হত্যা করে। এ অজুহাতে নবী গোটা বানু কাইনুকা গোত্রকে আক্রমণ করে তাদের সবাইকে গণহারে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন, যদি ভণ্ড আব্দুল্লাহ হস্তক্ষেপ না করত। যদিও এ ঘটনাটিকে বানু কাইনুকার বিরুদ্ধে মুহাম্মদের আক্রমণের কারণ বলা হয়, কিন্তু ইব্নে ইসহাক ও আল- তাবারি লিখিত মুহাম্মদের জীবনীতে এ আক্রমণের জন্য খুবই নিছক একটা কারণের (যা কোন কারণই নয়) কথা বলা হয়েছে। আল- তাবারী

আল- জুহুরী উদ্ধৃত জিব্রাইলের মুহাম্মদের কাছে আনা একটি আয়াতের কথা উল্লেখ করেন, যাতে বলা হয়েছে: 'কোনও সমপ্রদায়ের কাছ থেকে তুমি যদি বিশ্বাসঘাতকতার ভয় কর, তাহলে একইভাবে তাদের প্রতি তাদের চুক্তি ছুঁড়ে মার' (কুরআন ৮:৫৮)। মুহাম্মদ তখন বলেন: 'আমি বানু কাইনুকাকে ভয় পাই' এবং এটা বলে 'ঈশ্বরের বার্তাবাহক তাদের দিকে অগ্রসর হন।'[8]

স্পষ্টতঃ এ বর্ণনাটি যদি বানু কাইনুকাকে আক্রমণের সত্যি কারণ হয়, তাহলে সে আক্রমণের জন্য মুহাম্মদের আদৌ কোন ভিত্তি ছিল না। অথচ কেবলমাত্র ভণ্ড আব্দুল্লাহ বিন ওবাই- এর জোর হস্তক্ষেপ আত্মসমর্পণকারী ইহুদীদেরকে মুহাম্মদের মূল পরিকল্পনা তথা গণহত্যা থেকে রক্ষা করে এবং তাদেরকে নির্বাসনে পাঠিয়ে নবীকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এমনকি উত্ত্যক্ত করার ঘটনাটি সত্য হলেও, এ সামান্য ঘটনায় উত্যক্তকারী বালকটিকে কোন বিচারেই হত্যা করা যায় না। এ সামান্য ঘটনায় গোটা ইহুদী গোত্রকে আক্রমণের জন্য নবীর সে সিদ্ধান্ত ন্যায়বিচারের ন্যূনতম মানের পর্যায়েও পড়ে না। আর ইহুদী গোত্রটির সবাইকে হত্যার পরিকল্পনা এবং সেটি কার্যকর করতে না পেরে তাদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করা ছিল চরম বর্বরতা।

মুহাম্মদ একইভাবে ৬২৫ সালে বানু নাদির ও ৬২৭ সালে বানু কুরাইজা গোত্রকে আক্রমণ করেন। পুনরায় প্রশ্ন উঠে: বানু নাদির ইহুদীরা কি মুসলিম বা তাদের রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ করেছিল, যা মুহাম্মদকে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিআক্রমণে বাধ্য করে? বানু নাদিরের উপর আক্রমণের কারণ ছিল নাদির নেতার বাড়ীতে ছাদের উপর থেকে পাথর ছুঁড়ে তাঁকে হত্যার চক্রান্ত, যা ছিল এক নিতান্তই অবাস্তব বা ভুয়া অভিযোগ, যে ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত শিষ্যদেরও কোনই ধারণা ছিল না। এ ভিত্তিহীন অভিযোগ উদ্ভাবন করে তিনি বানু নাদিরকে আক্রমণ করেন ও নির্বাসনে পাঠান। বানু কুরাইজা ইহুদীরাও মুসলিমদের বিরুদ্ধে মারাত্মক কিছুই করেনি। কিন্তু মুহাম্মদ তাদের বিরুদ্ধে একটি চুক্তি ভঙ্গের ভুয়া অভিযোগ তোলেন। অথচ কথিত চুক্তি সম্ভবত কখনো বিদ্যমান ছিল না (ইতিমধ্যে আলোচিত)। বানু কুরাইজা ইহুদীদের নৃশংসভাবে হত্যা ছিল ৬২৪ সালে বানু কাইনুকার বিরুদ্ধে

---

8. Al-Tabari, Vol. VII, p. 86

তাঁর মূল পরিকল্পনার বাস- বায়ন মাত্র। আব্দুল্লাহর হস্তক্ষেপে তিনি সে পরিকল্পনা কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ৬২৫ সালে তখনো ক্ষমতাশালী আব্দুল্লাহ বানু নাদিরের পক্ষে যুদ্ধ করার হুমকী দিলে মুহাম্মদ নাদির গোত্রকে নির্বাসনে পাঠানোর মনস্ত করেন। ৬২৭ সালে বানু কুরাইজার উপর আক্রমণের সময় মুহাম্মদ দুর্বল আব্দুল্লাহর নিন্দা উপেক্ষা করেন। দুই- দুই বার হতাশার পর এবার ইহুদীদেরকে নির্মম ও নৃশংসভাবে হত্যার মাধ্যমে নবী ইহুদীদের প্রতি তাঁর মূল পরিকল্পনা কার্যকর করেন। আব্দুল্লাহ ছিলেন এক হৃদয়বান, ন্যায়বান মানুষ। অথচ তিনি কুরআন, সুন্নত ও অন্যান্য ইসলামী লেখায় হিপোক্রিট বা ভণ্ড হিসেবে বারংবার নিন্দিত হয়েছেন।

মোট কথা, প্রথমতঃ মুহাম্মদের নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কোনোই অধিকার ছিল না মদীনায়, যেখানকার লোকেরা তাঁর বিপদের সময় বসবাসের জন্য অনুগ্রহপূর্বক তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিল। অথচ তিনি মদীনায় তাঁর ইসলামী রাষ্ট্রের বীজ বপন করেন মদীনার জনগণের, বিশেষ করে ইহুদী জনগোষ্ঠীর, উপর চরম নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতা প্রয়োগ করতঃ তাদেরকে গণহারে নির্বাসনে পাঠিয়ে, হত্যা করে ও দাস বানিয়ে।

শক্তিশালী পারস্য ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য দুটোর কাছ থেকে মদীনাস্থ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি শত্রুতা সম্পর্কিত আল- কারাদাউইর উদ্ধৃতি একটা ভিত্তিহীন মিথ্যা উদ্ভাবন মাত্র। বাইজেন্টাইন বা পারস্যের শাসকরা কখনোই মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করেনি। বরং মুহাম্মদই তাঁর আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রদর্শন করতঃ ৬২৮ সালে তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সে সাম্রাজ্য দুটোর শাসকদের নিকট চিঠি পাঠিয়েছিলেন, 'ইসলাম গ্রহণ অথবা ভয়ঙ্কর পরিণতি মোকাবেলা'র হুমকি দিয়ে। এ সময় মুহাম্মদের সমপ্রদায় ছিল নিতান্তই একটা দুর্বল শক্তি, যখন তারা মক্কানগরী দখলের সামর্থ্যও অর্জন করে উঠেনি। যথার্থরূপেই বিশ্বের দুই সবচেয়ে ক্ষমতাধর শাসক তাঁর বিরুদ্ধে কোনো রকম ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তাটুকুও না করে সে হুমকিপত্রকে উপেক্ষা করেন।

মুহাম্মদের চিঠিকে গুরুত্ব না দেওয়ায় উভয় সাম্রাজ্যকেই ব্যাপক মূল্য দিতে হয়। এর দু'বছর পর নবী নিজে ৩০ হাজার সেনার এক বিশাল বাহিনী নিয়ে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণাত্মক অভিযানের

প্রত্যাশায় বের হয়ে সিরিয়ার নিকট তাবুকে পৌঁছেন। পরবর্তী দুই দশক ধরে মুহাম্মদের অপূর্ণ স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে ইসলামী বাহিনী পারস্য সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করে এবং বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যেও ধ্বংসাত্মক অনুপ্রবেশে সক্ষম হয়। কোনো রকম উস্কানি, হুমকী বা শত্রুতা ছাড়াই এসব আক্রমণাত্মক অভিযান চালানো হয়। মুহাম্মদ নিজের বাইজেন্টাইন ও পার্শিয়ান শাসকদেরকে তাঁর শাসনের কাছে নতি স্বীকারের দাবীর মাধ্যমে শত্রুতার উস্কানি দিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর দুই সম্রাট ক্ষুদ্র মুহাম্মদের সে শত্রুতামূলক উস্কানি উপেক্ষা করে নিজেদের ঘাড়ে বিপদ ডেকে আনে।

বিদেশী শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতা দমন

আল- কারাদাউইর মতে, মুসলিমরা যুদ্ধে রত হয়েছিল অন্যান্য দেশের শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতা দমন করার জন্য, যারা ইসলামের আহ্বানে সাড়া দিতে তাদের প্রজাদের বাধা দেয়। মুসলিমদের দায়িত্ব হলো (সর্বশক্তিমান আল্লাহর নির্দেশে) অন্যান্য দেশের জনগণের কাছে ইসলামকে পরিচিত করে তোলা। কিন্তু স্বেচ্ছাচারী সরকারগুলো তাদের নাগরিকদেরকে ইসলামের কথা ও কুরআনের আহ্বান শুনতে দেয় নি। ওসব শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতা বা উৎপীড়ন ইসলামের সর্বজনীন আহ্বান ছড়াতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সুতরাং নবী (তাঁর উপর শান্তি ও দয়া বর্ষিত হোক) নিকটস্থ দেশসমূহের শাসকদের নিকট পত্র মারফত ইসলামের আহ্বান করেন। তিনি তাদেরকে বলেন যে, তারা এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলে তাদের নাগরিকদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য দায়ী থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, তিনি বাইজেন্টাইন সম্রাটের কাছে লেখা চিঠিতে বলেন, 'যদি তুমি এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান কর, তুমি তোমার জনগণকে পথভ্রষ্ট করার জন্য দায়ী থাকবে।' তিনি পারস্য সম্রাটের কাছেও লিখেছিলেন, 'যদি তুমি ইসলামের আহ্বান প্রত্যাখ্যান কর, তাহলে ম্যাজিয়ান (জরাথ্রুস্ট্রবাদী)- দেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য দায়ী থাকবে।' এবং মিসরের গভর্নর আল- মুকাওয়াকিসকে তিনি লেখেন, 'ইসলামের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলে তুমি কপ্ট'দেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য দায়ী থাকবে।' সুতরাং অন্যান্য দেশের শাসকদের বিরুদ্ধে মুসলিমরা যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কারণ হলো ইসলাম ও ওসব দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যকার প্রতিবন্ধকতা দূর করা, যাতে করে কোনরূপ শাস্তির ভয় ছাড়া তারা নিজেদের পছন্দমত সিদ্ধান্ত নিতে

পারে - সর্বশক্তিমান আল্লাহকে তারা বিশ্বাস করবে না অবিশ্বাস করবে।
এসব যুক্তি আলোচনার আগে দেখে নেয়া যাক, কীভাবে আল-কারাদাউই নিজের বক্তব্যে স্ববিরোধিতা করছেন। এর আগে তিনি দাবী করেন যে, বাইজেন্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যের শত্রুতা মুসলিমদেরকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে বাধ্য করেছিল, যা পুরোপুরি ভিত্তিহীন বা অজ্ঞতা থেকে সৃষ্ট। তাঁর পরবর্তী যুক্তিতে বলেন: মুসলিমরা আক্রমণাত্মক যুদ্ধই করেছিল - কারণ পারস্য, রোম ও মিসরের শাসকরা ইসলামের সর্বজনীন বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল, ঐ দুই শক্তিশালী সাম্রাজের কাছ থেকে মুসলিমরা হুমকীর মুখে পড়ার কারণে নয়। অতঃপর তিনি একটি লাইন উল্লেখ করেছেন, গোটা চিঠি নয়, যা নবী মুহাম্মদ ওসব দেশের শাসকদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। বাইজেন্টাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পাঠানো চিঠি সম্পর্কে ইবনে ইসহাক লিখেছেন: 'নবীর চিঠিসহ দিহাইয়া বিন খলীফা আল-কালবী হিরাক্লিয়াসের কাছে এলেন। ঐ চিঠিতে বলা হয়: 'তুমি ইসলাম গ্রহণ করলে নিরাপদ থাকবে, এবং আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন; কিন্তু তুমি যদি ইসলাম প্রত্যাখ্যান কর, কৃষকদের পাপ তোমার উপর বর্তাবে।'[9] একইভাবে ওমানের রাজার কাছে প্রেরিত মুহাম্মদের চিঠিতে (ইতিপূর্বে উল্লিখিত) দাবী করা হয়: 'ইসলাম গ্রহণ করলে তুমি নিরাপদ থাকবে। তুমি ইসলামের কাছে নতি স্বীকার করলে, তুমি রাজা হিসেবে বহাল থাকবে। কিন্তু যদি ইসলাম থেকে বিরত থাক, তুমি শাসন ক্ষমতা হারাবে এবং আমার নবুয়তী প্রমাণ করতে আমার ঘোড়া তোমার এলাকায় ঢুকবে।'
চিঠিগুলো সম্পর্কে আল-কারাদাউই যা বলেন, চিঠির প্রকৃত ভাষ্য তার বিপরীত। বিদেশী রাজা ও সম্রাটদের কাছে পাঠানো এসব চিঠির অর্থ শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সনির্বন্ধ অনুরোধ নয়। চিঠির মূল ভাষ্য ছিলো: ইসলাম গ্রহণ কর নিরাপত্তা চাইলে। অন্যথায় মুহাম্মদের ঘোড় সওয়ার বাহিনীর নিষ্ঠুরতা নেমে আসবে তোমাদের উপর। এসব চিঠিতে স্পষ্টতঃই সহিংসতার হুমকী দেওয়া হয়, যদি ওসব শাসক ইসলাম গ্রহণে ও মুহাম্মদের কাছে নতি স্বীকারে অস্বীকৃতি

9. Ibn Ishaq, p. 655

জানায়। এটা অবশ্যই আজকের খ্রীষ্টান মিশনারিদের ধর্মপ্রচার কিংবা প্রাচীনকাল থেকে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার লাভের অনুরূপ ছিল না।
এখন চলুন আমরা আল- কারাদাউইর সাথে একমত হই যে, নবীর চিঠি বলেছে: 'যদি তারা এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তারা তাদের নাগরিকদের পথভ্রষ্ট বা বিভ্রান্ত করার জন্য দায়ী থাকবে।' কিন্তু ইসলামের কাছে বশ্যতা দাবীকারী মুহাম্মদের চিঠি ওসব শাসকরা প্রত্যাখ্যান করলে কীভাবে তা তাদের নাগরিকদের বিভ্রান্ত বা পথভ্রষ্ট করে? ইসলামের আহ্বান সম্বলিত চিঠি প্রত্যাখ্যাত হলেই নবী বা পরবর্তী খলীফাগণ সে বিদেশী ভূখণ্ড আক্রমণ করবেন, এটা কী ধরনের যুক্তি? ইসলাম বিস্তারের জন্য মুহাম্মদের পন্থা যদি শান্তিপূর্ণই হতো, তাহলে প্রথমে হুমকী এবং পরে আক্রমণের পরিবর্তে ওসব দেশের জনসাধারণকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলামে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য তিনি মিশনারি পাঠাতে পারতেন। পারস্য, মিসর ও বাইজেন্টাইনে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলাম প্রচারের জন্য মুহাম্মদ বা তাঁর খলীফাদের উদ্যোগ গ্রহণের কোনই নজির ইসলামী সাহিত্যে বা ইতিহাসে নেই। এখানে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ওমর আল- খাত্তাব ইরানের সার্বভৌম শাসক ৩য় ইয়াজদগার্দ- এর নিকট তাঁর আনুগত্য দাবী অথবা মুসলিম কর্তৃক ধ্বংস মোকাবেলা করার কথা বলে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তা তুলে ধরা হলো:
প্রাচ্যের শাহকে: আমার বশ্যতা স্বীকার ও আমার শর্তগ্রহণ ছাড়া তোমার ও তোমার জাতির জন্য ভাল কোনো ভবিষ্যৎ আমি দেখছি না। এক সময় ছিল যখন তোমার দেশ অর্ধপৃথিবী শাসন করেছে, কিন্তু দেখ কিভাবে এখন তোমার সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সমস্ত সীমান্তে তোমার বাহিনী পরাজিত। তোমার জাতি বিলুপ্তির পথে। আমি তোমাকে পথ দেখাতে পারি, যা দ্বারা তুমি এ দুর্ভাগ্যের হাত থেকে বাঁচতে পার। যেমন তুমি এক ঈশ্বরের পূজা কর, একমাত্র দেবতা, একমাত্র ঈশ্বর যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। আমি তোমার কাছে তাঁর বার্তা আনছি। তোমার জাতিকে আদেশ কর মিথ্যা অগ্নিপূজা বন্ধ করতে ও আমাদের সাথে যোগ দিতে, যা হবে সত্যের পথে যোগদান।
বিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহর উপাসনা কর... এবং মুক্তির পথ হিসেবে ইসলাম গ্রহণ কর। এখন তোমার বহুঈশ্বরবাদী পথ বন্ধ কর ও মুসলিম হয়ে যাও, যাতে তুমি মহান আল্লাহকে ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করতে পার।

তোমার নিজের অস্তিত্বের ও পারস্যবাসীর শান্তির জন্য এটাই একমাত্র পথ। কোনটা তোমার ও পারস্যবাসীর জন্য ভাল সেটি বুঝলে তুমি এটাই করবে। বশ্যতা স্বীকারই তোমার একমাত্র পথ।[10]

আল- কারাদাউই আমাদেরকে বলতে চান যে, ধরুন সৌদীর বাদশাহ কিংবা ইরানের প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে সর্বজনীন ইসলামের কাছে বশ্যতা স্বীকার বা আনুগত্য প্রদর্শনের আহ্বান সম্বলিত একটি চিঠি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট প্রত্যাখ্যান করল। তাহলে আমেরিকাকে আক্রমণ মুসলিমদের জন্য বৈধ হয়ে গেল। বাস্তবিক পক্ষে, ২০০৬ সালে মানবজাতির ত্রাণকর্তাস্বরূপ ইরানের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমদিনেজাদ প্রেসিডেন্ট বুশ ও আমেরিকার জনগণকে ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার আহ্বান জানান। একইভাবে আল- কায়েদার নেতারা বারংবার অবিশ্বাসী বা নাস্তিক বিশ্ব, বিশেষ করে আমেরিকাকে, ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়েছে। সুতরাং আমেরিকাবাসীদের মাঝে ইসলামের সর্বজনীন বার্তাপ্রচারে প্রেসিডেন্ট বুশ বাধা দান করেছেন এবং সে কারণে আমেরিকা ইতিমধ্যেই মুসলিমদের দ্বারা সহিংস আক্রমণ ও বিজয়ের জন্য একটা বৈধ টার্গেট বা লক্ষ্য হয়ে গেছে। আল- কায়েদা ইতিমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ করেছে এবং সুযোগ পেলেই আরো আক্রমণের প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে তাকে ইসলামের নিকট নতি স্বীকার করানোর প্রত্যয়ে। আমেরিকাকে পরাজিত করার ক্ষমতা থাকলে, প্রেসিডেন্ট আহমদিনেজাদ খুব সম্ভব 'বড় শয়তান'কে আক্রমণ করে বসত, ঠিক যেমন করে সপ্তম শতাব্দীতে আরব মুসলিমরা তার বিধর্মী পারস্যের পূর্বপুরুষদেরকে আক্রমণ করেছিল।

উৎপীড়ক শাসকদের হাত থেকে দুর্বল দেশকে মুক্ত করা

তৃতীয় যুক্তিটিতে আল- কারাদাউই বলেন:

যেহেতু ইসলাম মানুষের দ্বারা মানুষের দাসত্ব মোচনের সংগ্রাম, সুতরাং শক্তিশালী দখলদারের হাত থেকে নির্যাতিত দুর্বল জনগণকে উদ্ধার ছিল ইসলামের একটা লক্ষ্য। কাজেই আল্লাহর নির্দেশে মুসলিমরা অত্যাচারী বিদেশী শক্তির হাত থেকে দুর্বল জনগণকে উদ্ধারের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেয়। বাইজেন্টাইন শাসকরা

---

[10]. Letter of Omar, *Khalifat of Arabs to Shahanshah of Persia*; http;//www.youtube.com/watch/v=fwnKblyx96s; accessed 10 Sept, 2008.

মিসরের সমৃদ্ধি শোষণ করতো ও জনগণকে এতটাই নিপীড়ন করতো যে, মিসরীয়রা ইসলামকে স্বাগত জানায়। ফলে মুসলিমরা মাত্র ৮, ০০০ যোদ্ধা নিয়ে মিশরে প্রবেশ করে বাইজেন্টাইনের শাসন থেকে মিসরকে মুক্ত করতে সফল হয়।

আল কারাদাউইর একথা বলা একেবারেই হাস্যকর যে, 'ইসলাম মানুষ কর্তৃক মানুষের দাসত্ব মোচনের সংগ্রাম', বিশেষ করে যখন কুরআন প্রকাশ্যরূপে দাসত্বকে অনুমোদন দেয়। মুসলিমরা মুক্ত মানুষ, নারী- পুরুষ ও শিশুকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে রাখার গুরুরূপে নবী মুহাম্মদের সময় থেকে আজ পর্যন্ত বহাল রয়েছে (৭ম অধ্যায় দেখুন)। পরন' তিনি পুনরায় এখানে তাঁর আগের দাবীর স্ববিরোধিতা করেছেন যে, পারস্য ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মুসলিমদের যুদ্ধ উদীয়মান মুসলিম রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য আত্মরক্ষামূলক ছিল। এখানে তিনি স্পষ্টই স্বীকার করেন যে, মুসলিমরা নিজে থেকেই 'আক্রমণাত্মক' যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল, কিন্তু তা ছিল এক তথাকথিত মহৎ উদ্দেশ্যে, তথা নিষ্ঠুর পারস্য ও বাইজেন্টাইন শাসকদের হাত থেকে নির্যাতিত জনগণকে মুক্ত করার জন্য।

নবী ও পরবর্তী মুসলিম শাসকরা কি ওসব উৎপীড়ক শাসকদের কবল থেকে জনগণকে মুক্ত করতেই বিদেশী রাষ্ট্র দখলের অভিযানে নিযুক্ত হয়েছিলেন? এমন দাবীর পক্ষে আদৌ কোন প্রমাণ নেই। ইসলামের ইতিহাস বা সাহিত্যে নবী মুহাম্মদ কিংবা পরবর্তী মুসলিম শাসকদের কাছে বাইজেন্টাইন সম্রাটের স্বেচ্ছাচারিতা ও উৎপীড়ন থেকে রক্ষার জন্য মিসরের গভর্নর বা জনগণের নিকট থেকে কোন রকম অনুরোধের কোনোই উল্লেখ নেই। পারস্য ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের জনগণের নিকট থেকেও তাদের উৎপীড়ক ও স্বেচ্ছাচারী শাসকদের হাত থেকে তাদেরকে মুক্ত করার জন্য নবী মুহাম্মদ বা পরবর্তী মুসলিম শাসকদের কাছে পাঠানো অনুরোধের কোনই নজীর নেই। বরঞ্চ ৬২৮ সালে নবী মুহাম্মদ মিসরের গভর্নরের নিকট যখন চিঠি পাঠান, তাতে তিনি সরাসরি গভর্নরকে হুমকী দেন যে, 'ইসলাম গ্রহণ করো, তুমি নিরাপদ থাকবে।' মুহাম্মদ তাতে মিসর ও তার জনগণকে বাইজেন্টাইন নিপীড়ন থেকে মুক্ত করার মহৎ উদ্দেশ্যের কোন কথাই উল্লেখ করেননি।

সহিংসতার মধ্য দিয়ে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটার অভিযোগ খণ্ডনের লক্ষ্যে আল- কারাদাউইর উপস্থাপিত যুক্তিই প্রমাণ করে যে, মুসলিমরা বিনা উস্কানিতে আক্রমণাত্মকভাবেই বিদেশী ভূখণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধগুলো করেছিল ওসব জনগণের মাঝে ইসলামের সর্বজনীন বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। অর্থাৎ তিনি নিজে স্বীকার করেন যে মুসলিমরা বিদেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তলোয়ার উত্তোলন করেছিল কেবলমাত্র ইসলাম বিস্তারের জন্যই, তাঁর নিজের ভাষায়, 'ইসলামের সর্বজনীন বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য।' নিজস্ব যুক্তিতেই বিজ্ঞ শেখ এ সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করেন যে, ইসলাম বস্তুতঃ তলোয়ারের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অথচ এ অভিযোগটি খণ্ডন করতে তিনি কলম ধরেছিলেন।

স্বেচ্ছাচারিতা ও নিপীড়ন দূর করা

আল- কারাদাউই আরও দাবী করেন যে, মুসলিম পরিচালিত ওসব যুদ্ধ মূলত পারস্য ও বাইজেন্টাইন শাসক কর্তৃক তাদের জনগণের উপর চাপানো স্বেচ্ছাচারিতা ও উৎপীড়ন নির্মূল করার জন্য করা হয়েছিল। এখন সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা যাক ওসব শাসকদের দ্বারা উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত জনগণের জন্য মুসলিমরা কী প্রকারের ন্যায়বিচার ও শান্তি আনয়ন করেছিল।

মদীনার ইহুদীরা যখন ইসলামের সর্বজনীন বার্তা প্রচারে বাধা দেয়, নবী তাদের উপর আক্রমণ করেন, বানু কাইনুকা ও বানু নাদির গোত্রকে নির্বাসিত করেন এবং বানু কুরাইজার লোকদেরকে হত্যা ও তাদের নারী- শিশুদেরকে দাস বানান। ৬৩৮ সালে খলীফা ওমরের জেরুযালেম দখলকালে মুসলিমরা এমন ব্যাপক ধ্বংস ও লুণ্ঠন কার্যে লিপ্ত হয় যে, এর ফলশ্রুতিতে পরের বছর 'হাজার হাজার লোক দুর্ভিক্ষ ও প্লেগরোগে মৃত্যুবরণ করে।' ৬৩৪ সালে মুসলিমদের অভিযানে গাজা ও কাইসারিয়ার মাঝখানের গোটা অঞ্চলটা ধ্বংস করে ফেলা হয়। চার হাজার খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ ও সামারিতান কৃষক তাদের ঘরবাড়ী ও দেশ রক্ষার চেষ্টা করতে গিয়ে মুসলিম যোদ্ধাদের হাতে প্রাণ হারায়। ৬৩৫ ও ৬৪২ সালের মধ্যে মেসোপটেমিয়া অভিযানের সময় খ্রীষ্টান মঠগুলো লুণ্ঠন ও সন্ন্যাসীদেরকে হত্যা করা হয়। মনোফিসাইট

আরবদেরকে হত্যা বা জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়। ইলাম-এর জনগণ তরবারীর তলায় প্রাণ হারায়।[11]

আল-বিলাদুরী ও মোহাম্মদ আল-কাফী (চাচনামায়)-র বর্ণনায় ভারতে মুহাম্মদ বিন কাসিমের প্রথম সফল আক্রমণে: দেবালে মন্দিরগুলো ধ্বংস করা হয়; তিন দিনব্যাপী চলে হত্যাযজ্ঞ; কয়েদীদের বন্দী করা হয়। নিরুনে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ সত্ত্বেও তাদের মন্দিরগুলো ভেঙ্গে ফেলা হয় ও সে স্থানে মসজিদ স্থাপন করা হয়। রাওয়ার ও আসকালান্দায় অস্ত্রধারী সমস্ত লোককে হত্যা করে তাদের নারী ও শিশুদেরকে দাস হিসেবে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়। মুলতানে অস্ত্র ধরতে সক্ষম এমন সমস্ত লোককে হত্যা করা হয়। নারী ও শিশুর পাশাপাশি মন্দিরের ছয় হাজার ধর্মযাজককে বন্দী বা দাস করা হয়।[12]

ইসলামের অভিযানে বিজয়ী মুসলিমদের তিনদিনব্যাপী সাধারণ হত্যাযজ্ঞ চালানোর একটা রেওয়াজ প্রতিষ্ঠিত হয়, যার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যান খলীফা ওমর। ৬৪১ সালে আলেক্সান্দ্রিয়া নগরী দখলের পর খলীফা ওমরের নির্দেশে সেখানে তিনদিনব্যাপী ধ্বংসযজ্ঞ, লুণ্ঠন ও ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড চলে। ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপল পতনের পর সুলতান মাহমুদ তার সেনাদেরকে তিন দিনব্যাপী বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড ও অবাধ লুটতরাজের সুযোগ দেন। তারা নগরীতে প্রবেশ করে নগরীর রাস্তায় নারী-পুরুষ-শিশু যাকে পায় তাকেই বেপরোয়াভাবে হত্যা করে। রাস্তা দিয়ে রক্তের বন্যা বয়ে যায়।[13] আমীর তিমুর বা তৈমুর লং ভারত আক্রমণ করেছিলেন অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার দায়িত্ব পূরণে এবং ১৩৯৯ সালের ডিসেম্বরে একদিনে তিনি দিল্লীতে ১০০, ০০০ (এক লাখ) বন্দীকে হত্যা করেন।[14]

আল-কারাদাউই আমাদেরকে বলেন যে, মিসর বিজয় সেখানকার নির্যাতিত জনগণের কাছে এতই কাঙ্ক্ষিত ছিল যে, মাত্র ৮, ০০০ যোদ্ধার প্রয়োজন হয়েছিল মিসরকে দখল করতে। এখানে ইসলামের শান্তির সে অগ্রদূতদের নিকট থেকে মিসরের নাগরিকরা যে পুরস্কার

---

11. Ibn Warraq, p. 219

12. Eliot HM and Dawson J, *The History of India As Told by the Historians*, Low Price Publications, New Delhi, Vol. 1, p. 469

13. Runciman S (1990) *The Fall of Constantinople, 1453*, Cambridge, p. 145; Bostom AG (2005) *The Legacy of Jihad*, Prometheus Books, New York, p. 616-18

14. Lal KS (1999) *Theory and Practice of Muslim State in India*, Aditya Prakashan, New Delhi, p. 18

পেয়েছিল তার একটা নমুনা উল্লেখ করা যাক। খলীফা ওমরের বাহিনী আলেক্সান্দ্রিয়া দখলের পর সেখানে যে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনে ওয়ারাক লিখেছেন, আমর মিসরে প্রবেশ করে ফাইয়ূমএর নিকটবর্তি বেহ্নেসা শহর দখল করেন; তারপর তিনি সেখানকার সমস- বাসিন্দাকে নির্মূল করেন - আটক বা আত্মসমর্পিত নারী- পুরুষ, যুবা- বৃদ্ধ নির্বিশেষে। একই ভাগ্য বরণ করতে হয় ফাইয়ূম ও অ্যাবয়েতের জনগণকে। ইব্নে ওয়ারাক আরো জানান:[15]

'নিকিউতে সমস্ত জনগণকে তরবারীর তলে জীবন দিতে হয়। আরবরা সেখানকার বাসিন্দাদের বন্দী করে। আর্মেনিয়ায় ইউচেইতার সব মানুষকে মুছে ফেলা হয়। সপ্তম শতকে আর্মেনীয় ইতিহাসপঞ্জী থেকে জানা যায়, কীভাবে আরবরা আসিরিয়ার জনগণকে হত্যা করেছিল ও কিছু লোককে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছিল। এবং অতঃপর কিভাবে তারা লেক ভ্যান'এর দক্ষিণ- পূর্বে অবস্থিত দারন এলাকায় কী ভয়ঙ্কর ধ্বংসকাণ্ড করেছিল। ৬৪২ সালে আসে ডিভিন শহরের মানুষের কপালে দুর্ভাগ্যের পালা। ৬৪৩ সালে আরবরা আবার ফিরে আসে ধ্বংসযজ্ঞ, নির্মূল অভিযান ও দাসত্বের শিকল নিয়ে।'

এটাই ছিল শান্তি ও ন্যায় বিচারের ধরন, যা মুসলিম যোদ্ধারা বিজিত জনগণকে এনে দিয়েছিল কথিত পূর্ববর্তী অবিশ্বাসী শাসকদের 'স্বেচ্ছাচারিতা, উৎপীড়ন ও অন্যায়' নির্মূল করে। বিজয়কালে মুসলিম হানাদারদের দ্বারা সংঘটিত এসব বর্বর নিষ্ঠুরতার পরও মুসলিম শাসনাধীনে পরাভূত প্রজাদের উপর নিপীড়ন ও শোষণের আদৌ কোন উপশম হয় নি। উদাহরণস্বরূপ, খলীফা ওমরের শাসনকালের প্রথম দিকেই বিজিত জনগণের উপর আরোপিত করের বোঝা বহন তাদের পক্ষে সাধ্যাতীত হয়ে উঠেছিল। মুসলিম ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ফজল আহমদের মতে, আবু লুলু ফিরোজ নামে এক পারস্যদেশীয় দাস অতিরিক্ত করের বোঝায় অতিষ্ঠ হয়ে একদিন খলীফা ওমরের কাছে গিয়ে অনুনয় করে: 'আমার মনিব আমাকে অতিরিক্ত করের মাধ্যমে ভীষণভাবে শুষে ফেলছেন, অনুগ্রহ

---

15. Ibn Warraq, p. 220

করে তা হ্রাস করা হোক।’[16] ওমর তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। এরই আক্রোশে ক্রোধান্বিত আবু লুলু পরদিন খলীফাকে ছোরাবিদ্ধ করে হত্যা করে।

মুসলিম শাসকদের আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার বিষয়ে আল-কারাদাউইর সঙ্গে একমত পোষণ করেন জাকির নায়েকও। তিনি লিখেছেন: ‘কোন কোন সময় নিপীড়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। ইসলামে কেবল শান্তি ও ন্যায়বিচারকে এগিয়ে নিতে শক্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে।’ [17] আমরা দেখবো কীভাবে ভারতে ইসলামের শান্তি ও ন্যায়বিচারের শাসন অতি অল্পদিনের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ দেশের অমুসলিমদেরকে মুসলিমদের দরজায় ভিক্ষুকে পরিণত করেছিল। তাদের উপরে চাপানো করের বোঝা পরিশোধের নিমিত্তে তাদেরকে স্ত্রী-সন্তানকে বিক্রি করে দিতে হয়েছিল। তাদের মধ্যে সবচেয়ে অসহায় ও বিপদগ্রস্তদের জঙ্গলে হিংস্র জন্তুর মধ্যে বসবাসের জন্য আশ্রয় নিতে হয়েছিল, যাদের রাস্তায় ডাকাতি করে কিংবা জনহীন জঙ্গলে যা পেত তার উপর নির্ভর করেই বাঁচতে হত (পরে আলোচিত)।

তদুপরি আল-কারাদাউই দাবী করেছেন: জনগণ বিজয়ী মুসলিম হানাদারদেরকে উল্লসিত অভিনন্দন জানিয়েছিল। পূর্ববর্তী স্বেচ্ছাচারী ও উৎপীড়ক শাসকদের হাত থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় জনগণ দ্বারা বিজয়ী মুসলিমদের অভিনন্দন জানানোর এ দাবীও ভিত্তিহীন। আগেই বলা হয়েছে যে, সাধারণ কৃষকরাও মুসলিম আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল। ৬৩৪ সালে গাজা ও কায়সারিয়ার মধ্যখানে প্রায় ৪,০০০ হাজার কৃষক মুসলিম হানাদারদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে রুখে দাঁড়ালে তাদের সবাইকে হত্যা করা হয়। দেবল বন্দরে মোহাম্মদ বিন কাসিম তিনদিন ধরে সেখানকার নাগরিকদের হত্যা করে। এ হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছিল কি হিন্দুরা মুহাম্মদ বিন কাসিমের বাহিনীকে হস্ত প্রসারিত করে স্বাগত জানিয়েছিল বলে? ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপলে মুসলিম যোদ্ধারা তিনদিন ধরে সেখানকার মানুষ হত্যার কাজে লিপ্ত হয়ে রাস্তা-ঘাটে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল।

---

16. Ahmad F, Hazrat Omar bin Khattab -- The Second Caliph of Islam; http://path-to-peace.com/omer.html

17. Naik Z (1999) *Was Islam Spread by the Sword?* Islamic Voice, Vol. 13-08, No. 152

১৫৬৮ সালে চিত্তোরে প্রায় ৩০, ০০০ কৃষক তাদের রাজার পাশে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়েছিল উদার ও মহান 'আকবর দ্য গ্রেট'- এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে। তারা আত্মসমর্পণ করলে আকবর তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দেন।[18] আক্রান্ত রাষ্ট্রের তথাকথিত নির্যাতিত জনগণের নিকট থেকে মুসলিম সেনাদের প্রাপ্ত উল্লসিত অভিনন্দন এ রকমই ছিল।

অধিকাংশ মুসলিম ঐতিহাসিকের লেখায়, মুসলিম হানাদাররা আক্রান্ত জনগণের দ্বারা কঠোর প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। আক্রান্ত দেশের জনগণ যদি আক্রমণকারী বিজয়ী মুসলিমদেরকে স্বাগতই জানাবে, তাহলে মোহাম্মদ বিন কাসিমকে দেবলের জনগণের উপর তিনদিন ধরে হত্যাকাণ্ড চালানোর প্রয়োজন পড়ত না। আল- কাফী তার 'চাচ্‌নামায়' লিখেছেন: 'দেবলের অবিশ্বাসীরা আরবদের উপর চতুর্দিক থেকে এমন ঝটিকা বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং অত্যন্ত সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করে যে, ইসলামের বাহিনী দিশেহারা হয়ে যায় ও তাদের লাইন ভেঙ্গে পড়ে।'[19] মুসলিমদের ভারত বিজয়ে ইসলামের মর্মস্পর্শী বার্তার কারণে স্বেচ্ছায় খুব কম মানুষই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। সামগ্রিকভাবে বয়স্ক লোকেরা ইসলামী যোদ্ধাদের তরবারীর তলে প্রাণ হারায় এবং অসহায় নারী ও শিশুরা দাসরূপে গৃহীত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলিম আক্রমণকারীরা বিনা বাধায় ভূখণ্ড দখল করেছে, কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে, জনগণ তাদেরকে উষ্ণ অভিনন্দনে বুকে তুলে নিয়েছিল; বরং অনিবার্য পরাজয়ের মুখে সেসব যুদ্ধে অর্থহীন প্রতিরোধ তুলে তারা চিহ্নিহ্ন হয়ে যাক, এটা তারা চায় নি।

১০২৪ সালে সুলতান মাহমুদের সোমনাথ মন্দির আক্রমণ সম্পর্কে ইব্‌নে আসির লিখেছেন: 'হিন্দু প্রতিরোধকারীরা দলে দলে সোমনাথ মন্দিরে প্রবেশ করে ও তাদের হাত দ্বারা গলা জড়িয়ে ধরে ক্রন্দন করে আবেগের সঙ্গে আক্রমণ না করার জন্য তাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানায়। তারপর তারা পুনরায় মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ করার শপথ নেয়। সবশেষে তাদের সামান্য সংখ্যক লোক বেঁচে থাকে। মৃতের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার ছাড়িয়ে যায়।[20] এরা ছিল সাধারণ মানুষ, যারা তাদের

---

18. Smith VA (1958) *The Oxford History of India*, Oxford University Press, London, p. 342
19. Sharma, p. 95-96
20. Elliot & Dawson, Vol. II, p. 470-71

পবিত্র মন্দির রক্ষা করতে চেয়েছিল। মুসলিম হানাদাররা বারবার এ মন্দিরটিকে ধ্বংস করায় ধর্মপ্রাণ হিন্দুদেরকে তাদের পবিত্র মন্দিরটি তিন্ততিনবার পুনঃনির্মাণ করতে হয়েছিল। এগুলো নিশ্চয়ই জনগণের দ্বারা বিজয়ী মুসলিম বাহিনীকে উল্লসিত অভিনন্দন জানানোর নজীর নয়, বরং তাদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধেরই নমুনা। বিখ্যাত ইসলামী পণ্ডিত ও ইতিহাসবিদ আল- বেরুনী সুলতান মাহমুদের বারংবার ভারত আক্রমণ ও তাঁর কীর্তি সম্পর্কে যা লিখেছেন তা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, বিজয়ী মুসলিম শাসকরা বিজিতদের উপর কিরূপ আচরণ করেছিল। ১০১৭ সালে সুলতান মাহমুদের মধ্য এশিয়ার খোয়ারিজম রাজ্য দখলকালে পারস্যের স্বনামধন্য পণ্ডিত আল- বেরুনী (৯৭৩-১০৫০) তার হস্তে ধৃত হন। মাহমুদ তাঁকে রাজধানী গজনীতে এনে দরবারের একজন কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত করেন। ভারত অভিযানকালে মাহমুদ আল- বেরুনীকে তার সঙ্গে ভারতে আনেন। তিনি ভারতের সর্বত্র দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে ঘুরে ঘুরে হিন্দু পণ্ডিতদের কাছে দর্শন, অঙ্ক, ভূগোল ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি মুসলিমদের ভারত বিজয় সম্বন্ধে লিখেছেন: ‘মাহমুদ দেশের সমৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও বিস্ময়কররূপে লুটপাট করেন। যার ফলে হিন্দুরা পরমাণু- ধুলার মতো বিচ্ছুরিত হয়ে যত্র- তত্র ছড়িয়ে পড়ে, অনেকটা জনগণের মুখে প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনীর মতো। আর বিচ্ছুরিত জনগণের অবশিষ্টাংশ সমস্ত মুসলিমের প্রতি চরম ঘৃণা পোষণ করে।’[21]

স্পেনে অভিনন্দন

কোন কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনায় বিজিত জনগণের কিছু অংশ মুসলিম হানাদারদের স্বাগত জানিয়ে থাকতে পারে। মুসলিমদের স্পেন আক্রমণে ইহুদীদের দ্বারা অভিনন্দিত হবার দৃষ্টান্ত মুসলিমরা প্রায়শঃই তুলে ধরে। কিন্তু এ দাবীটির ঐতিহাসিক কোন ভিত্তি নেই। স্টিফেন ও’শিয়া উল্লেখ করেন: ‘অনেকে ধারণা করে যে, আইবেরিয়ার ইহুদীরা মুসলিমদেরকে তাদের মুক্তিদাতারূপে স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু এ ধারণার পিছনে কোনও লিখিত প্রমাণ নেই।’[22] যাহোক

---

[21]. Sachau EC (2002) *Alberuni's India*, Rupa & Co., New Delhi, p. 5-6 (first print 1888)

[22]. O'Shea S (2006) Sea of Faith: Islam and Christianity in the Medieval Mediterranean World, Walker & company, New York, p. 69

স্পেনীয় ইহুদীদের দ্বারা মুসলিম হানাদারদেরকে স্বাগত জানানোর ফলাফল তাদের জন্য খুব একটা ভাল ছিল না।

স্পেন তখন ছিল ভিসিগথিক শাসনের অধীনে। ভিসিগথরা ছিল উত্তর ইউরোপ থেকে আসা জার্মান জনগোষ্ঠী, সাধারণভাবে যাদেরকে বার্বারিয়ান বা বর্বর বলা হয়। এরা পঞ্চম শতকের প্রথম দিকে স্পেন দখল করে। মুসলিমরা যেরূপ পরাজিতদেরকে মুসলিম বানাতো দাস বানানোর মাধ্যমে কিংবা তলোয়ারের ডগায় মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে, ভিসিগথ শাসকরা স্পেনের খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের উপর সেরূপ জবরদস্তি করে নি। শুরুতে পৌত্তলিক ভিসিগথিক শাসকরা ইহুদী, খ্রীষ্টান বা পৌত্তলিক নির্বিশেষে সব নাগরিকদের প্রতি ছিল সহনশীল। কিন্তু পরবর্তীতে তারা ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করলে ইহুদী ও পৌত্তলিক প্রজাদের প্রতি তাদের সহনশীলতা হ্রাস পায়। ৬৩৩ সালে ক্যাথলিক বিশপ বা যাজকরা, রাজাকে নির্বাচিত করার ক্ষমতা যাদের হাতে ছিল, তারা সব ইহুদীকে বাধ্যতামূলক খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের নির্দেশ ঘোষণা করে। এরপর থেকে ইহুদীদের প্রতি খ্রীষ্টান ভিসিগথিকদের ব্যবহার ও সম্পর্কে হানি ঘটে।

ভিসিগথিক রাজারাও ছিল মুসলিমদের মতই বিদেশী হামলাকারী। তারাও কৃষকদেরকে প্রবলভাবে শোষণ করতো। স্পেনের স্থানীয় আইবেরীয় জনগণ ছিল অনেকটা দাসের মত। তারা ভিসিগথিক শাসক পরিবারের জন্য মজুরীতে ক্ষেত- মজুরের কাজ করতো মাত্র। এর ফলে উত্তর আফ্রিকায় খলীফার গভর্নর মূসা বিন নুসায়ের যখন স্পেন আক্রমণ করেন, তখন কৃষকরা, যারা ছিল ভিসিগথ বাহিনীর মূল শক্তি, শাসকদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণার কারণে লাঠি- বল্লম হাতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে।[23] যদিও প্রথম দিকে স্পেনের ইহুদী ও কৃষকরা মুসলিম অভিযানে হয়ত অখুশী ছিল না, কিন্তু শীঘ্রই তাদেরকে অনাকাঙ্খিত অভিজ্ঞতার স্বাদ নিতে হয়। অচিরেই মুসলিম হানাদাররা শুরু করে দেয় লুণ্ঠন, হত্যাকাণ্ড, জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ এবং নারী- শিশুদেরকে ক্রীতদাসকরণ। কেবলমাত্র মর্যাদাসম্পন্ন ভিসিগথিক পরিবার থেকেই ৩০ হাজার শ্বেতাঙ্গ কুমারী নারী ছিল দাস হিসেবে কব্জাকৃতদের মধ্যে।[24] এ. এস.

---

[23]. Fregosi P (1998) *Jihad in the West*, Prometheus Books, New York, p. 91
[24]. Lal (1999), p. 103

ট্রিটনের মতে, এক অভিযানে মূসা প্রতিটি চার্চ ধ্বংস করে ও সেগুলোর ঘণ্টা ভেঙ্গে ফেলে। তারা আত্মসমর্পণ করলে মুসলিমরা যুদ্ধে নিহতদের ধনসম্পদ, গ্যালিসিয়ায় পলাতকদের ধনসম্পদ এবং চার্চের ধনসম্পদ ও সোনা- দানা, হীরা- জহরত করায়ত্ত করে।[25]

৭১১ সালে ইসলামের স্পেন বিজয় শুরুর পর চার দশকেরও বেশী সময় ধরে সেখানে সাংঘাতিক বিশৃঙ্খলা ও নিষ্ঠুরতা চলে। অবশেষে উমাইয়া রাজপুত্র আবদ আল- রহমান দামেস্ক থেকে পিছু ধাওয়াকারী আব্বাসীয় ঘাতকদের সামনে পালিয়ে যখন স্পেনে পৌঁছেন, তারপর সেখানে দৃশ্যত একটা সি' তিশীলতা ফিরে আসে। আবদ আল- রহমান স্পেনে উমাইয়া রাজবংশ (৭৫৬- ১০৭১) প্রতিষ্ঠা করেন। ইহুদী ও খ্রীষ্টান জিম্মি প্রজাদের বিরুদ্ধে গোঁড়া মুসলিম ও ‘উলেমা’দের বৈষম্যমূলক ইসলামী আইন প্রয়োগে উদাসীনতা দেখানোর কারণে উমাইয়া শাসকরা ঐতিহাসিকভাবে ‘গডলেস’ বা ‘ঈশ্বরহীন’ হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে (কারণ হিসেবে ৫ম অধ্যায়ে ‘কিভাবে মুসলিমবিশ্ব বুদ্ধিবৃত্তিক ও বস্তুগত উৎকর্ষ সাধন করে?’ উপশিরোনাম দেখুন)। উমাইয়া শাসকরা অনেকটা সহনশীলতার সঙ্গে দেশ শাসন করতেন। তারা সাধারণত মুহাম্মদের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ছিলেন এবং অমুসলিমদেরকে ধর্মান্তরিত করার জন্য কখনো চাপ দেন নি; কর প্রদানের মাধ্যমে তারা রাজকোষ পূর্ণ করলেই খুশী ছিলেন।

স্পেনের যেসব ইহুদী মুসলিম হানাদারদেরকে মুক্তিদাতারূপে গণ্য করেছিল বলে বলা হয়, তারা অল্পদিনের মধ্যেই তাদের তথাকথিত মুক্তিদাতার স্বরূপ দেখতে পায়। শীঘ্রই তারা মুসলিম কর্তৃক নানারকম অসম্মান ও শোষণের শিকার হয়। মুসলিম শাসকরা তাদের উপর ইসলামী আইনে নির্দেশিত জিম্মিদের উপর আরোপযোগ্য অবমাননাজনক জিজিয়া, দুর্বহ খারাজ (বশ্যতা ও ভূমিকর) ও অন্যান্য কর আরোপ করেন। চার্চ ও সিনাগগ নির্মাণ নিষিদ্ধ করা হয়। ক্রীতদাসরূপে কব্জাকৃত ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে শ্রমিকরূপে ব্যবহার করে ধ্বংসপ্রাপ্ত চার্চ সিনাগগের ইট, কড়ি- বর্গা, খুঁটি, দরজা- জানালা দিয়ে সে স্থানে মসজিদ গড়া হয়। ওমরের চুক্তি (নীচে দেখুন) অনুযায়ী তাদের জন্য অস্ত্র বহন, ঘোড়ায় চড়া, জুতা পরা, চার্চের

---

25. Triton AS (1970) *The Caliphs and Their Non-Muslim Subjects*, Frank Cass & Co. Ltd., London, p. 45

ঘন্টা বাজানো, সবুজ কিছু পরিধান করা ও মুসলিম হামলাকারীদেরকে প্রতিহত করা নিষিদ্ধ হয়। যীশুকে স্বর্গীয় ঘোষণা ও ইসলাম থেকে কাউকে অন্য ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা বরাবরই মারাত্মক অপরাধ ছিল। ১০১০ ও ১০১৩ সালের মধ্যে কর্ডোভার নিকটবর্তী অঞ্চল ও স্পেনের অন্যান্য অঞ্চলে হাজার হাজার ইহুদীকে হত্যা করা হয়। অমুসলিমদেরকে সরকারি চাকরিতে অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদে ১০৬৬ সালে ব্যাপক দাঙ্গা শুরু হয়, যার ফলে গ্রানাডার ৪,০০০ ইহুদীর একটা গোটা সমপ্রদায়কে গণহত্যার মাধ্যমে নির্মূল করা হয়। স্পেনের ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মোজারবদের (আরবীয়কৃত খ্রীষ্টান ক্রীতদাস) উপর চরম দুঃস্বপ্ন নেমে আসে যখন উত্তর আফ্রিকার গোঁড়া আলমোরাভিদ (১০৮৫-১১৪৭) ও আলমোহাদরা (১১৩৩-১২৭০) স্পেন আক্রমণ করে উমাইয়াদের তাড়িয়ে দেয়। এসব গোঁড়া ধর্মীয় শাসকরা যেখানেই গেছে সেখানেই অবিশ্বাসীদের উপর সন্ত্রাস ছড়িয়েছে। ১১৪৩ সালে আলমোহাদ খলীফা আল-মুমিন ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতিকারী ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করার আদেশ দেন।[26] আলমোহাদ খলীফা আল-মুমিন (১১৩৩-৬৩), আবু ইয়াকুব (১১৬৩-৮৪) এবং আল-মনসুর (১১৮৪-৯৯) কর্তৃক মৃত্যু ও দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার ভয়ে ইহুদীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আলমোরাভিদ শাসকরা ১১২৬ সালে গ্রানাডার খ্রীষ্টানদেরকে মরক্কোয় নির্বাসিত করেন।[27]

১১৪৮ সালে আলমোহাদরা কর্ডোভা বিজয়ের পর ইহুদীদের হয় ইসলাম গ্রহণ নয় মৃত্যু, কিংবা নির্বাসন - এ তিনটির একটি বেছে নেয়ার নির্দেশ দেয়। এসময় বিখ্যাত ইহুদী ধর্ম শাস্ত্রবিদ, দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদ মোজেস মাইমোনিদ (১১৩৫-১২০৪)-এর পরিবারসহ অন্যান্য অনেক ইহুদী নির্বাসন বেছে নেয়। অধিকাংশ মুসলিম অধিকৃত দেশে ইহুদীদের উপর একই রকম নিপীড়ন চলায় মাইমোনিদের পরিবার প্রথমে মরক্কোয় স্থায়ী হতে ব্যর্থ হয়ে পরে প্যালেস্টাইনে চলে যায়। মুসলিম ছদ্মবেশে প্রায় দুই দশক ইসলামী দেশে ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত তাঁরা মিসরের ফুস্তাত-এ স্থায়ী হয়। মাইমোনিদ তাঁর লেখা ‘দ্য

---

26. Walker, p. 247
27. Ibn Warraq, p. 226,236

এপিসল টু দ্যা জুজ অব ইয়েমেন' গ্রন্থে মুসলিম দেশে ইহুদীদের উপর নেমে আসা নির্যাতন সম্পর্কে সম্যক ইঙ্গিত দিয়েছেন।[28]
তিনি ইয়েমেন, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে ইহুদীদের উপর নিপীড়ন ও জোরপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তরকরণ সম্পর্কে লিখেন: 'অবিরাম নির্যাতন্তনিপীড়নের ফলে অনেকের মনে আমাদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে দৃঢ়তা হারাবে ও সন্দেহ সৃষ্টি করবে অথবা বিপথে পরিচালিত হবে। কারণ তারা আমাদের দুর্বলতা দেখতে পাচ্ছে। তারা আমাদের উপর শত্রুপক্ষের বিজয় ও কর্তৃত্ব দর্শন করছে।' তিনি আরও লিখেছেন :
ঈশ্বর আমাদেরকে আরবদের মাঝে ছুঁড়ে দিয়েছেন, যারা আমাদেরকে ভয়ঙ্করভাবে নির্যাতন করছে এবং আমাদের বিরুদ্ধে বিষাক্ত ও বৈষম্যমূলক আইন পাস করছে, যা আমাদেরকে ধর্মগ্রন্থ পূর্বেই সতর্ক করেছিল, 'আমাদের শত্রুরাই আমাদের বিচার করবে' (ডিউটেরোনমি ৩২:৩১)। তারা আমাদেরকে যতটা উৎপীড়ন, মর্যাদাহানি ও ঘৃণা করেছে ততটা কখনো কোন জাতি করেনি।
'আমরা তাদের দ্বারা মানুষের সহ্যের অতীত অসম্মানিত হয়েছি' - এ কথার উপর জোর দিয়ে মাইমোনিদ আরও লিখেছেন:
ইসাইয়া'র শিক্ষায় দীক্ষিত হয়ে আমরা আবাল- বৃদ্ধ সবাই অবমানিত হতে অভ্যস্ত হওয়ার সম্মতি দিয়েছি। ইসাইয়া আমাদেরকে বলেছেন: 'আমি প্রহারকারীকে আমার পিঠ ও গাল এগিয়ে দিয়েছি, যারা আমার চুল উপড়ে ফেলেছে' (৫০:৬)। তথাপি আমরা তাদের দুর্ব্যবহার থেকে মুক্তি পাই না, যা প্রায় নিঃশেষ করে দিচ্ছে আমাদেরকে। আমরা যতই ভোগান্তির শিকার হই বা তাদের সাথে শান্তিতে বাস করতে চাই না কেন, তারা আমাদের প্রতি সংগ্রাম ও বিক্ষোভ জাগ্রত করে। ডেভিড (নবী দাউয়ুদ) যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করেন, 'আমি শান্তি চাই, কিন্তু আমি কথা বললে তারা যুদ্ধ করতে আসে' (সাল্ম ১২০:৭)। সুতরাং আমরা যদি হাস্যকর ও অযৌক্তিকভাবে তাদের কাছ থেকে ক্ষমতা দাবী করি বা তাদের জন্য অসুবিধা সৃষ্টি করি, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিব।
ভারতে এতগুলো হিন্দু কীভাবে টিকে থাকলো?

---

[28]. Maimonides M (1952) *Moses Maimonides' Epistle to Yemen: The Arabic Original and the Three Hebrew Versions*, ed. AS Halkin, Trans. B. Cohen, American Academy for Jewish Research, New York

সহিংসতার মাধ্যমে ইসলামের বিস্তার ঘটানোর অভিযোগ খণ্ডনে ড. নায়েক ভিন্ন একটা যুক্তি খাড়া করেছেন। তিনি অভিযোগটির প্রতিবাদ করে বলেন: ইসলাম যদি তরবারীর দ্বারাই বিস্তার লাভ করত, তাহলে ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যে এতগুলো অমুসলিম টিকে থাকতো না। নায়েক লিখেছেন:

মুসলিমরা মোট ১, ৪০০ বছর ধরে আরব দেশ শাসন করছে। আজও সেখানে ১৪ মিলিয়ন কপটিক খ্রীষ্টান বসবাস করছে। যদি মুসলিমরা তরবারীই ব্যবহার করতো, তাহলে সেখানে একজন আরবও খ্রীষ্টান থাকত না।

ভারতেও মুসলিমরা প্রায় হাজার বছর শাসন করেছে। চাইলে ভারতের প্রত্যেক অমুসলিমকে মুসলিমে ধর্মান্তরিত করার ক্ষমতা তাদের ছিল। আজ সেখানে শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী অমুসলিম। ভারতে আজকের অমুসলিমরাই প্রমাণ করছে যে, ইসলাম তরবারীর দ্বারা বিস্তৃত হয় নি।

অথচ আল-কারাদাউই নায়েকের এ যুক্তির বিরোধিতা বা তা প্রত্যাখ্যান করেন এটা বলে যে, ইসলামের সর্বজনীন বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে মুসলিমদেরকে তরবারী ব্যবহার করতে হয়েছিল:

তরবারী ভূগুন্ড জয় করতে পারে, রাষ্ট্র দখল করতে পারে, কিন্তু কখনো মানুষের অন্তর খুলতে ও তার ভিতরে বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিতে পারে না। ওসব দেশে সাধারণ মানুষ ও ইসলামের মধ্যকার বাঁধাটা (অর্থাৎ অমুসলিম শাসন) সরে যাবার পরই কেবল সেখানে ইসলাম বিস্তার লাভ করেছিল। কারণ এরপর তারা যুদ্ধ ও যুদ্ধক্ষেত্রের গণ্ডগোল থেকে দূরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ইসলামকে বিবেচনা করতে সক্ষম হয়েছিল। এভাবে অমুসলিমরা মুসলিমদের চমৎকার নৈতিকতার সাথে পরিচিত হতে পেরেছিল।

বিশিষ্ট ইসলামীক পণ্ডিত ডঃ ফজলুর রহমান, যাকে ইসলাম সম্পর্কে তার উদার ধারণার কারণে পাকিস্তান থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পালাতে হয়েছিল, তিনি কারাদাউইর মতকে সমর্থন করেন। রহমান মনে করেন যে, কুরআনে বর্ণিত ধর্মীয়-সামাজিক বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জিহাদের (তরবারীর দ্বারা) অনিবার্য প্রয়োজন হয়েছিল। তিনি প্রশ্ন করেন: সেটি ছাড়া কিভাবে একটা আদর্শিক বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? অতঃপর সকলকে অনেকটা স্তম্ভিত করার মত

তিনি বলেন: 'ইসলাম তরবারীর দ্বারা বিস্তৃত' কিংবা 'ইসলাম তরবারীর ধর্ম'- এ স্লোগান 'খ্রীষ্টানদের প্রচারণা' মাত্র। তারপর তিনি সরলভাবে স্বীকার করেন যে, 'ইসলাম বিস্তার ঘটার আগে একটা সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে তরবারী প্রথমেই চলে আসে।' রহমান আরও লিখেছেন: 'তরবারী দিয়ে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা ইসলাম নয়, ইসলামের রাজনৈতিক প্রভাব মাত্র, যাতে করে ইসলাম পৃথিবীতে কুরআন নির্ণীত সামাজিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু কেউ কখনো বলতে পারে না যে, ইসলাম তরবারী দ্বারা বিস্তৃত।'[29]

জিহাদের প্রশ্নে আরব লীগের সেক্রেটারী জেনারেল (১৯৫২- ৭১) আব্দুল খালেক হাসৌনা এক সাক্ষাৎকারে (১৯৬৮) একইভাবে বলেন: 'ইসলাম তলোয়ার দ্বারা আরোপিত নয়, শত্রুরা যেমনটা দাবী করে। জনগণ নিজেদের পছন্দেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কারণ ইসলাম তাদেরকে যে জীবনধারার প্রতিশ্রুতি দেয়, তা তাদের আগের জীবনধারার চেয়ে উন্নত ছিল। মুসলিমরা অন্যান্য দেশ আক্রমণ করেছিল ইসলামের আহ্বান সর্বত্র জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া নিশ্চিত করতে মাত্র।' [30]

এসব ইসলামী চিন্তাবিদরা - ইসলাম তরবারীর দ্বারা বিস্তৃত - এ অভিযোগটি খণ্ডন করতে চেয়েছিলেন। অথচ সেটি করতে গিয়ে তারা হয়ত অন্যমনস্কতার কারণে তাদের নিজস্ব বক্তব্যেই বলেন যে, ইসলাম প্রচারে বাস্তবিকই তরবারী মূল ভূমিকা পালন করেছে। তাদের বিবৃতিগুলোর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে তারা নিজেরাই সুস্পষ্ট স্বীকার করেন যে: ইসলামের বিস্তারে তলোয়ারই ছিল প্রাথমিক অস্ত্র: প্রথমে তলোয়ারের ব্যবহার হয়েছিল; তারপরে ঘটেছিল ইসলামের বিস্তার। অতঃপর তারা দাবী করেন ইসলাম শান্তিপূর্ণ উপায়ে এসেছে। এক্ষেত্রে কিছু প্রশ্ন করতে হয়:

১) বিজয়- পরবর্তী ইসলামের বিস্তার পর্বটা কতটা শান্তিপূর্ণ ছিল?

২) ইসলামের ভৌগলিক সম্প্রসারণের প্রাথমিক 'তলোয়ার পর্বটি' কি কোনই ভূমিকা রাখেনি ইসলাম বিস্তারে বা ধর্মান্তরে?

এসব প্রশ্নের উত্তর পাঠকগণ পাবেন একটু পরে। মুসলিম ইতিহাসবিদ লিখিত তথ্যের ভিত্তিতেই দেখানো হবে যে, পরাজিতদের ইসলামে

---

[29]. Sharma, p. 125

[30]. Waddy C (1976) *The Muslim Mind*, Longman Group Ltd., London, p. 187

ধর্মান্তরকরণ ব্যাপকহারে শুরু হয়েছিল যুদ্ধ ক্ষেত্রেই। উপরোক্ত আধুনিক মুসলিম পণ্ডিতগণের দাবীর ব্যাপারে নিম্নোক্ত বিষয় দুটি নিয়ে এখন আলোচনা করা যাক:

১) প্রথমতঃ 'ইসলামের শান্তি ও ন্যায় বিচারের বার্তা' উপলব্ধির কারণেই কি অমুসলিমরা ইসলামের ছায়াতলে এসেছিল?

২) দ্বিতীয়তঃ ইসলাম যদি তলোয়ারের দ্বারা বিস্তৃত হবে, তাহলে কেন যথাক্রমে ১৪ শত এবং ১ হাজার বছর মুসলিম শাসনের পরও মধ্যপ্রাচ্যে ১৪ মিলিয়ন ও ভারতে ৮০ শতাংশ লোক অমুসলিম রয়ে গেছে?

মধ্যপ্রাচ্যে ও ভারতে মুসলিম আক্রমণের প্রাথমিক চিত্রটি ইতিমধ্যেই সংক্ষিপ্ত বর্ণিত হয়েছে। ১০০০ থেকে ১০২৭ সাল পর্যন্ত সুলতান মাহমুদ সতের বার উত্তর ভারতে ধ্বংসাত্মক আক্রমণ ও হত্যাযজ্ঞ চালান। সুলতান মাহমুদের প্রথম আক্রমণের তিন দশক পর আল-বেরুনী তার 'আল- বেরুনীর ইন্ডিয়া' (১০৩০ খ্রীঃ) গ্রন্থে লিখেছেন: মুসলিম অধিকৃত ভূখণ্ডের হিন্দুরা 'ধূলিকণায়' পরিণত হয়; আর 'যারা টিকে ছিল, তাদের মনে মুসলিমদের প্রতি চরম ঘৃণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে।' আল- বেরুনী আরও লিখেছেন: 'হিন্দুরা তাদের সন্তানদেরকে আমাদের (মুসলিম) সম্পর্কে, আমাদের পোশাক ও আমাদের আচার- আচরণ সম্পর্কে ভয় দেখায়। তারা আমাদেরকে 'শয়তানের বাচ্চা' বলে ঘোষণা করে ও আমরা যা কিছু করি তার সব কিছুকেই ভাল ও ন্যায়ের বিপরীত বিবেচনা করে।' [31]

আরব মুসলিমদের প্রতি হিন্দুদের এ বিরাগের কারণ ছিল খোরাসান, পারস্য, ইরাক, মসুল ও সিরিয়া থেকে বৌদ্ধদেরকে নির্মূল করা - প্রথমে জরথুষ্ট্রবাদী, পরে মুসলিমদের দ্বারা। অতঃপর মুহাম্মদ বিন কাসিম ভারতে আকস্মিক হানা দিয়ে ব্রাহ্মণাবাদ ও মুলতান শহর দখল করে নেয় ও কানৌজ পর্যন্ত গমন করে। আল- বেরুনী লিখেছেন: এ সকল ঘটনা তাদের অন্তরে গভীর ঘৃণা রোপণ করেছে। ইব্‌নে বতুতা অনেক হিন্দু বিদ্রোহী ও বীর যোদ্ধাকে মুসলিম শাসকদের কাছে নতি স্বীকার বা ইসলাম গ্রহণ না করে মুলতান ও আলিগড়ের নিকটবর্তী অগম্য পাহাড়- পর্বতে আশ্রয় নিতে দেখেছেন। মুসলিম সম্রাট বাবর

---

[31]. Sachau EC (1993) *Alberuni's India,* Low Price Publications, New Delhi, p. 20-21

ভারতে মুসলিম শাসনের শেষ দিকে একই পরিস্থিতি লক্ষ্য করেন (নীচে দেখুন)। তথাকথিত দয়ালু হৃদয়ের জাহাঙ্গীরের (মৃত্যু ১৬২৭) শাসনকালে হাজার হাজার, এমনকি লাখ লাখ, হিন্দু ভারতের জঙ্গলগুলোতে আশ্রয় নিয়ে বিদ্রোহে যোগ দেয়। জাহাঙ্গীর ১৬১৯-২০ সালে তাদের দুই লোককে ধরে ইরানে বিক্রির জন্য পাঠান।[32]

আল-বেরুনী প্রমাণ করেন যে, সুলতান মাহমুদের প্রথম ভারত আক্রমণের প্রায় তিন দশক পরও ভারতের হিন্দুরা ইসলামের মধ্যে ন্যায় ও শান্তির বার্তা দর্শনে ব্যর্থ হয়। যদি তারা তা দেখতে পেতো, তাহলে মুসলিমদের প্রতি 'বদ্ধমূল বিতৃষ্ণা' ও 'গভীর ঘৃণা' প্রদর্শনের পরিবর্তে তারা ইসলামের পতাকাতলে ভিড় জমাতো। অন্যান্য মুসলিম পণ্ডিত ও বণিক, যারা ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দীগুলোতে ভারত সফর করেন, তারাও অনুরূপ হতাশা প্রকাশ করেছেন। ৭১২ সালে ভারতে ইসলামী শাসন আসলেও দেখা যায় যে, শত শত বছর পরও ভারতীয় হিন্দুরা ইসলামের শান্তি ও ন্যায়ের অমিয় বার্তা গ্রহণ করেনি, বরং তার প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করেছে। অধ্যাপক হাবিবুল্লাহ লিখেছেন: 'শুরুতে সরাসরি ধর্মান্তরকরণ অত্যন্ত কম ছিল। দশম শতাব্দীর এক আরবীয় ভূগোলবিদ এক লেখায় অভিযোগ করেন যে, ভারতে ইসলাম একজনকেও টানতে পারে নি।'[33] ভারত ও চীন সফরকারী পর্যটক মার্চেন্ট সোলায়মান (৮৫১) উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর সময়ে ভারতীয় বা চীনের কাউকেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করতে দেখেন নি, কিংবা আরবী বলতে শুনেন নি।[34] ভারতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ছয়শ' বছর পর ইবনে বতুতা ও আটশ' বছরের বেশী সময় পর সম্রাট বাবর ইসলামের প্রতি হিন্দুদের প্রচণ্ড শত্রুভাব লক্ষ্য করেন; সম্রাট জাহাঙ্গীরও একই রকম লক্ষ্য করেন নয়শ' বছর পরে।

এসব বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, ভারতে মুসলিম শাসনের অন্তিম দিনগুলোতেও হিন্দুরা ইসলামের সৌন্দর্য ও ন্যায়পরায়ণতায় আকৃষ্ট হতে সুস্পষ্ট ব্যর্থ হয়। পরিবর্তে তারা ইসলামের প্রতি ছিল

---

[32]. Elliot & Downson, Vol. VI, p. 516; Levi (2002) *Hindus Beyond the Hindu Kush: Indian in the Central Asian Slave Trades*, Journal of the Royal Asiatic Society, 12(3), p. 283-84

[33]. Habibullah ABM (1976) The Foundations of Muslim Rule in India, Central Book Depot, Allahabad, p.1

[34]. Sharma, p. 110

শত্রুভাবাপন্ন। আমরা পাই যে, ১২০৬ সালে দিল্লীতে মুসলিম সুলতানাত প্রতিষ্ঠার এক শতকের মধ্যে হিন্দুরা তাদের উপর আরোপিত জিজিয়া, খারাজ ও অন্যান্য গুরুভার করের বোঝায় নিঃস্ব হয়ে মুসলিমদের দ্বারে- দ্বারে ভিক্ষা করেছে (বিস্তারিত জানতে দেখুন এ লেখকের ইসলামী সাম্রাজ্যবাদ" বইটি)। অথচ তারা শুধুমাত্র ইসলাম গ্রহণ করে এ কঠোর পরিস্থিতির হাত থেকে রক্ষা পেতে পারত, কিন্তু তারা তা করছিল না। আমরা মুসলিম ইতিহাসবিদ ও ইউরোপীয় পর্যটকদের ভাষ্যমতে দেখতে পাই যে, সপ্তদশ শতকেও হিন্দুরা স্ত্রী ও সন্তানদেরকে দাসবাজারে নিয়ে যাচ্ছিল বিক্রি করার জন্য, যাতে তারা মুসলিম শাসক আরোপিত গুরুভার কর প্রদান করতে পারে। মুসলিম কর আদায়কারী কর্মকর্তারাও নিঃস্ব হিন্দুদের সন্তানদেরকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল কর আদায়ের উদ্দেশ্যে বাজারে তাদেরকে বিক্রি করতে (দেখুন এ লেখকের "ইসলামী দাসত্ব" বইটি)। তথাপি তারা ইসলাম গ্রহণ করছিল না।

ভারত সম্পর্কিত মুসলিম লেখকদের তথ্য থেকে জানা যায় যে, সমগ্র ভারতজুড়ে দুর্ভেদ্য জঙ্গলও হিন্দুদের টিকে থাকার জন্য প্রতিরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বা আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। ইব্‌নে বতুতা সুলতান মুহাম্মদ শাহ তুগলকের শাসনকালে (১৩২৫- ৫১) ভারত ভ্রমণে মুলতানের নিকট দেখতে পান যে, '(হিন্দু) বিদ্রোহী ও যোদ্ধারা দুর্ভেদ্য দুর্গম জঙ্গলের মাঝে অবস্থান নিয়েছে।' চীন সম্রাটের উদ্দেশ্যে দিল্লীর সুলতানের তরফ থেকে পাঠানো এক কাফেলার সাথে গমনকালে কল (আলীগড়)- এর নিকট তিনি দেখতে পান যে, হিন্দুরা 'দুর্ভেদ্য পাহাড়ে' অবস্থান নিয়েছে, যেখান থেকে নেমে এসে তারা মুসলিম শাসিত এলাকায় আক্রমণ চালাত। তার কাফেলাটি এক মুসলিম শহরে এমন একটি আক্রমণ প্রতিহতকরণে লিপ্ত হয়, যাতে বিদ্রোহীরা পরাজিত ও শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত নিহত হয়।[35] বিখ্যাত সূফী পণ্ডিত আমির খসরু তার 'সুহ নিফার' পুস্তকেও এরূপ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। বর্বর হানাদার আমীর তিমুর (তৈমুর লং) তার মালফুজাত-ই- তিমুরী স্মৃতিলিপিতে উল্লেখ করেন যে, তার অফিসাররা তাকে ভারতীয়দের প্রতিরক্ষা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলে যে, তা দুর্গম

---

[35]. Gibb HAR (2004) *Ibn Battutah: Travels in Asia and Africa,* D.K. Publishers, New Delhi, p. 190,215

জঙ্গল ও গাছপালার সমন্বয়ে গঠিত, যাদের কাণ্ড ও ডালপালা জড়ো হয়ে তা দুর্ভেদ্য করে তুলে... ওদেশের যোদ্ধা, জমিদার, রাজপুত্র ও রাজারা সে দুর্ভেদ্য জঙ্গলে একসাথে বসবাস করে বন্য প্রাণীদের মত।[36]

প্রথম মুঘল সম্রাট বাবর ১৫২০-এর দশকে ভারত আক্রমণকালে ভারতীয় অধিবাসীদের জীবন বাঁচানোর আত্মরক্ষা কৌশল সম্পর্কে উল্লেখ করেন: 'অনেক অঞ্চলে জন্মেছে কণ্টকময় দুর্ভেদ্য জঙ্গল' যা তাদের জন্য ভাল প্রতিরক্ষার কাজ করে এবং তার পিছনে আশ্রয় নিয়ে তারা 'চরম বিদ্রোহী হয়ে উঠে'। বাবর আগ্রা পৌঁছে জঙ্গলে পালানোর এ সফল কৌশলটি লক্ষ্য করে সে সম্পর্কে লিখেন: 'আমরা না পাই আমাদের জন্য খাদ্য, না আমাদের ঘোড়ার জন্য ঘাস। গ্রামবাসীরা আমাদের প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণায় চুরি-ডাকাতি ও লুটপাটে জড়িত হয়েছে। রাস্তায় কোনকিছুই নড়াচড়া করছিল না... সব লোকেরা ভয়ে (জঙ্গলে) পালিয়েছে।'[37]

এ দৃষ্টান্তগুলো মুসলিম হানাদার ও শাসকদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের সর্বদা চলমান দৃঢ় প্রতিরোধের যথেষ্ট ধারণা দেয়। এবং এগুলো আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করবে যে, বহু শতক মুসলিম শাসনের পরও কিভাবে ভারতে এতগুলো হিন্দু টিকে থাকতে সক্ষম হয়। প্রকৃতপক্ষে, মুসলিম লিখিত ভারতের ঐতিহাসিক উপাখ্যানগুলো মুসলিম হানাদার ও শাসকদের আক্রমণের মুখে জীবন রক্ষার জন্য হিন্দু রাজা ও তাদের সৈন্যদের এবং বিদ্রোহী ও সাধারণ জনগণের জঙ্গলে পলায়নের ঘন ঘন দৃষ্টান্তে পূর্ণ।

স্পষ্টতঃ হিন্দুদের মধ্যে ইসলামের প্রতি চরম প্রতিরোধ ও বিরোধিতা ছিল। তারা জীবন বাঁচাতে কিংবা ধরা পড়ে ক্রীতদাস হওয়ার মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য হওয়ার ভয়ে দুর্ভেদ্য পাহাড়-পর্বত ও জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে বন্য পশুদের সঙ্গে বসবাস করেছে। বহু কৃষক দুর্বহ করের বোঝা বহনে অস্বীকৃতি জানিয়ে নিজস্ব পৈতৃক খামার ও ভিটে-মাটি ছেড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। এরপরও অন্যরা সে নিষ্ঠুর ও দুর্বহ জিম্মি করের বোঝা বয়ে বেড়িয়েছে; তথাপি তা থেকে মুক্তি পেতে ইসলাম গ্রহণ করেনি। ১৬৭৯ সালে আওরঙ্গজেব অবমাননামূলক জিজিয়া কর

---

36. Elliot & Downson, Vol. III, p. 395
37. Lal (1999), p. 62-63

পুনঃপ্রবর্তন করলে (তার আগে সহৃদয় আকবর তা বিলুপ্ত করে, রা. ১৫৫৬- ১৬০৫) সর্বস্তরের অগণিত মানুষ দিল্লীতে এসে জড়ো হয় ও রাজপ্রাসাদের বাইরে অবস্থান ধর্মঘট করে প্রতিবাদ জানায়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সে প্রতিবাদকারীদেরকে ছত্রভঙ্গ করতে আওরঙ্গজেব তাদের উপর হাতি ও ঘোড়া চালিয়ে দেয়। কফি খান লিখেছেন: 'হাতী ও ঘোড়ার পায়ের তলে পিষ্ঠ হয়ে অনেক প্রতিবাদকারী নিহত হয়' এবং অবশেষে 'তারা জিজিয়া কর প্রদান করতে বাধ্য হয়'।[38]

এটা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, ভারতে মুসলিম আক্রমণের এক সহস্র বছর পরও হিন্দুরা ইসলামের মাঝে তেমন আবেদনময়ী ও অর্থপূর্ণ কিছু খুঁজে না পেয়ে ইসলাম গ্রহণের বহুরকম প্রলোভন ও সুযোগ- সুবিধা উপেক্ষা করেছিল। পরিবর্তে তারা এরকম ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিবাদে অংশ নিচ্ছিল এবং তারপরও পূর্বপুরুষের ধর্ম ও সংস্কৃতি আঁকড়ে ধরে থেকে অপমানকর জিজিয়া, দুর্বহ খারাজ ও অন্যান্য নিষ্ঠুর কর প্রদান করে যাচ্ছিল।

অধিকন্তু, তলোয়ারের মুখে কিংবা অন্য কোন পরিসি' তিতে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাদের অনেকে প্রথম সুযোগেই পূর্বপুরুষের আদি ধর্মে ফিরে যেতে চেষ্টা করেছে। যেমন সুলতান মোহাম্মদ শাহ তুঘলক ১৩২৬ সালে দক্ষিণাত্যের দুই ভাই হরিহর ও বুক্কা'কে ক্রীতদাস বানিয়ে ইসলামে ধর্মান্তরিত করেন। দশ বছর পর সুলতান দক্ষিণাত্যের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি ঠাণ্ডা করতে সে দু'ভাইয়ের নেতৃত্বে এক বাহিনী প্রেরণ করেন। দিল্লি থেকে বহুদূরে অবস্থিত দক্ষিণাত্যে পৌঁছেই তারা বাপ- দাদার ধর্ম হিন্দুত্বে ফিরে যায়। উপরন্তু দক্ষিণ ভারতে তারা বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে সেখান থেকে ইসলামের চিহ্ন দূরীভূত করে।[39] বিজয়নগর ক্রমে একটা শক্তিশালী রাজ্য ও ভারতীয় সভ্যতার এক সমৃদ্ধ কেন্দ্রে পরিণত হয়। রাজ্যটি ২০০ বছরেরও অধিক সময়ব্যাপী দক্ষিণ ভারতকে ইসলামীকরণের সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

ব্যতিক্রমধর্মী সম্রাট আকবর যখন ধর্মের ব্যাপারে নিজস্ব পছন্দের স্বাধীনতা প্রদান করেন, তখন পূর্বে যাদেরকে জবরদস্তিমূলকভাবে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছিল এমন অনেক হিন্দু তাদের

---

[38]. Lal (1999), p. 118

[39]. Smith, p. 303-04

পূর্বপুরুষের ধর্মে ফিরে যায়। অনেক মুসলিম মহিলা হিন্দু পুরুষকে বিয়ে করে হিন্দু ধর্মমতে জীবনযাপন শুরু করে। উদাহরণস্বরূপ, সম্রাট শাহজাহান (আকবরের নাতী) কাশ্মীর অভিযান শেষে রাজধানীতে ফিরার পথে দেখতে পান যে, ভাদাউরী ও ভীমবরের হিন্দু পুরুষরা মুসলিম মেয়েদের বিয়ে করছে সামাজিক প্রথা বা আচারের অংশরূপে এবং কিছু মহিলা তাদের হিন্দু স্বামীর ধর্ম হিন্দুত্ব গ্রহণ করে নিয়েছে। শাহজাহান এধরনের বাছবিচারহীন বিবাহ বেআইনী ঘোষণা করে তাঁর কর্মচারীদেরকে হুকুম করেন হিন্দু স্বামীর কাছ থেকে মুসলিম স্ত্রীদেরকে পৃথক করতে।[40] কাজেই আশ্চর্য হবার কোন কারণ নেই যে, স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সম্রাট আকবরের সহনশীল শাসনকে 'ভারতীয় ইসলামের প্রায় আত্মহত্যার সামিল' বলে আখ্যায়িত করে আকবরের নিন্দা করেন ও তার বিরোধীতাকারী তৎকালীন গোড়া সূফী সাধক শেখ আহমদ সিরহিন্দির প্রশংসা করেন। সিরহিন্দি হিন্দুদের উপর নিপীড়নমূলক রাষ্ট্রীয় নীতি চালু করার দাবীতে আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন (পরে আলোচিত)।[41]

কাশ্মীরের উপর লিখিত পার্শিয়ান ইতিহাসপঞ্জি 'বাহারিস্তান্তই-শাহী' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে: চরম প্রতিমা-পূজা বিরোধী সুলতান সিকান্দারের আমলে বেপরোয়াভাবে হিন্দু মন্দিরগুলোর ব্যাপক ধ্বংস ও তলোয়ারের মুখে গণহারে ধর্মান্তরিতকরণের মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদ নিষ্পেষিত হয়।[42] হায়দার মালিক চাদুরা লিখেছেন: সুলতান সিকান্দার (১৩৮৯-১৪১৩) 'অবিশ্বাসীদের বিলুপ্তি সাধনে সর্বদা ব্যস্ত থাকেন ও অধিকাংশ মন্দির ধ্বংস করেন।'[43] সিকান্দারের উত্তরসূরী অপর এক হৃদয়বান মুসলিম শাসক সুলতান জয়নুল আবেদীন (বা শাহী খান, রা. ১৪১৭-৬৭) ধর্মান্তরিত হিন্দুদেরকে নিজ ধর্মে ফিরে যাবার অনুমতি দেন। সিডনি ওয়েন লিখেছেন: 'অনেক হিন্দু (অর্থাৎ জোরপূর্বক

---

[40]. Sharma, p. 211
[41]. Elst K (1993) *Negationism in India*, Voice of India, New Delhi, p, 41
[42]. Pundit KN (1991) *A Chronicle of Medieval Kashmir*, (Translation), Firma KLM Pvt Ltd, Calcutta, p. 74 (This authoritive seventeenth-century Persian chronicle, entitled *Baharistan-i-Shahi*, was written anonymously. It has been translated.)
[43]. Chadurah MH (1991) *Tarikh-i-Kashmir*, ed. & trans. Razia Bano, New Delhi, p. 55

ইসলামীকরণকৃত) পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরে যায়।'[44] বাহারিস্তান্তই-শাহী'র (১৬১৪) বেনামী মুসলিম লেখক সুলতান জয়নুল আবেদীনের অধীনে হিন্দুদের উত্থান ও ইসলামের পতন সম্পর্কে খেদ করে লিখেছেন:

. . . অবিশ্বাসীরা ও তাদের কলুষিত ও অনৈতিক চর্চা এমন জনপ্রিয় হয়ে উঠে যে, এমনকি এদেশের উলেমা, বিজ্ঞ (সূফী), সৈয়দ (মহৎব্যক্তি) এবং কাজী (বিচারক)- রাও সামান্যতম বিদ্বেষ পোষণ না করে সেগুলোতে মগ্ন হয়। এসব কাজে বাঁধা দেওয়ার কেউ ছিল না। এর ফলে ইসলাম ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে ও এর আইন্তকানুন ক্ষয় পেতে থাকে। প্রতিমাপূজা এবং কলুষিত ও অনৈতিক চর্চা দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়।[45]

এর পরে মালিক রায়নার শাসনে দলে দলে হিন্দুদেরকে পুনরায় শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়। পরবর্তী শিথিল সময়ে তারা আবার হিন্দুধর্মে ফিরে আসে। কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠ সূফী সাধক আমীর শামসুদ্দিন মোহাম্মদ ইরাকীর প্ররোচনায় জেনারেল কাজী চক ওসব ধর্মত্যাগীদেরকে পবিত্র আশুরার দিনে (মুহর্‌রম, ১৫১৮ সাল) পাইকারী হারে হত্যা করে। তারা ঐদিন নেতৃস্থানীয় ৭০০-৮০০ হিন্দুকে হত্যা করে। সমাজতান্ত্রিক ইতিহাসবিদ ও স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু - ভারতে ইসলামী স্বেচ্ছাচারিতার কালো ইতিহাস সাদা করতে যিনি অতিশয় আগ্রহী ছিলেন - এর চার শতাব্দী পরে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা কাশ্মীরী মুসলিমদের মাঝে পূর্বপুরুষের ধর্মে ফিরে যাওয়ার আগ্রহের কথা উল্লেখ করেন। 'ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া' তে তিনি লিখেছেন:

কাশ্মীরে ইসলামে ধর্মান্তরিত করার এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ সেখানে জনসংখ্যার ৯৫ ভাগই মুসলিম হয়ে যায়, যদিও তারা তাদের পুরনো হিন্দু আচার ও প্রথার অধিকাংশই ধরে রাখে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজ্যের হিন্দু শাসক দেখতে পান যে, বিপুল

---

[44]. Owen S (1987) *From Mahmud Ghazni to the Disintegration of Mughal Empire*, Kanishka Publishing House, New Delhi, p. 127

[45]. Pundit, p. 74

সংখ্যক ওসব মানুষ গণহারে তাদের আদি হিন্দু ধর্মে ফিরে যেতে উদগ্রীব।[46]

ভারতে এখনও এত মানুষ হিন্দু কেন?

উপরোক্ত ঐতিহাসিক প্রমাণসমূহ সুস্পষ্ট করে যে, হিন্দুরা কখনোই ইসলামের দ্বারা আকৃষ্ট হয় নি। বরঞ্চ প্রবণতাটি ছিল এর বিপরীত: ইসলাম থেকে পুনরায় হিন্দুত্বে ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষা। বিরল ক্ষেত্রে যখন কোন উদার মুসলিম শাসক ক্ষমতায় আসেন ও জনগণকে ধর্মীয় স্বাধীনতার সুযোগ দেন, তখন ইসলামের অবনতি ঘটে এবং পাশাপাশি হিন্দু ও অন্যান্য ধর্ম বিকশিত ও বিস্তৃত হয়। এ কথা মুসলিম ইতিহাসবিদ ও পণ্ডিতগণই লিখে গেছেন।

বহু শতাব্দী ধরে মুসলিম শাসনের পরও ভারতবর্ষে কেন প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ অমুসলিম রয়ে গেছে, উপরোক্ত আলোচনায় তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নে বর্ণিত হবে যে, ভারতীয় বিধর্মীরা সহস্রাব্দব্যাপী নিষ্ঠুর মুসলিম শাসনাধীনে দৃঢ়তার সাথে চরম সামাজিক- সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয়ভাবে মর্যাদাহানি, অবমাননা ও বঞ্চনা এবং উৎপীড়ণ মূলক কঠোর করের বোঝা সহ্য বা বহন করেছে; এরপরও তারা পৈতৃক ধর্মকে আঁকড়ে ধরে থেকেছে।

এখানে আরও একটি বিষয় বিবেচনাযোগ্য যে, তাত্ত্বিকভাবে যদিও মুসলিমরা ১১শ বছর ভারতবর্ষ শাসন করেছে, কিন্তু বাস্তবে তারা কখনোই গোটা দেশের উপর অধিকার বা শাসন বিস্তার করতে পারে নি। মুহাম্মদ বিন কাসিম ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধু আক্রমণের পর প্রথম তিন শতাব্দে মুসলিম শাসন বিশাল ভারতের উত্তর- পশ্চিমের সামান্য অংশে সীমাবদ্ধ থাকে। ওসব অঞ্চলে মুসলিমদের এখনকার ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা এটাই প্রমাণ করে যে, দীর্ঘকালব্যাপী যে যে অঞ্চলে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা শক্তভাবে বিরাজ করেছে, সেসব অঞ্চলে মুসলিম শাসকরা কার্যকরভাবে জনগণের উপর ইসলাম চাপাতে সক্ষম হন।

কেবলমাত্র সম্রাট আকবরের বলিষ্ঠ নেতৃত্বকালে (১৫৫৬- ১৬০৫) ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল মুসলিম শাসনাধীনে আসে। কিন্তু আকবর ছিলেন ইসলামের সবচেয়ে বড় ধর্মত্যাগী; তিনি ইসলাম ধর্ম বিস্তারে

---

[46]. Nehru J (1946) *The Discovery of India*, The John Day Company, New York, p. 264

কোনো সহযোগিতা করেননি। তার সুদীর্ঘ পাঁচ দশকের শাসনামলে মুসলিম জনসংখ্যা বিস্তৃত হওয়ার পরিবর্তে সম্ভবত ক্রমশঃ হ্রাস পায়। আকবরকে অনুসরণ করে পরবর্তী পঞ্চাশ বছর তার ছেলে জাহাঙ্গীর ও নাতি শাহজাহানের শাসনামলে ইসলামীকরণ রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে শক্তিশালী হতে পারে নি।

আকবরের প্রপৌত্র গোড়া আওরঙ্গজেব (রা. ১৬৫৮-১৭০৭) যখন ক্ষমতা দখল করেন, তখন ইসলামীকরণ ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ রাষ্ট্রের মূল নীতির অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু তার শাসনামলে আবার দেশের সর্বত্র বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। বার্নিয়ার-এর মতে, আওরঙ্গজেবের বর্বর নিষ্ঠুর শাসনামলে উদ্ধত রাজপুত ও মারাঠা যুবরাজগণ সবসময় ঘোড়ায় চড়ে সম্রাটের প্রাসাদ প্রাঙ্গনে যেত। তারা তাদের দেহরক্ষীদের সহযোগে সশস্ত্র অবস্থাতেই প্রাসাদে প্রবেশ করত।[47]

আওরঙ্গজেব যখন 'ওমরের চুক্তি' ও শরীয়া আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অমুসলিমদের জন্য অস্ত্র বহন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন, তখন উদ্ধত ও ভয়ঙ্কর রাজপুতদেরকে এ আইনের আওতাবহির্ভূত রাখা হয়। অমুসলিমদের প্রতি আওরঙ্গজেবের ভয়ঙ্কর ও স্বেচ্ছাচারী নীতি সত্ত্বেও তিনি যখন জিজিয়া কর পুনরায় আরোপ করেন, তার প্রতিবাদে শিবাজী ও রানা রাজসিংহের মতো বিদ্রোহীরা সম্রাটের কাছে পত্র পাঠায়। সম্রাটের কর্মচারীরা (আমিন) কর আদায় করতে গেলে উদ্ধত প্রজারা তাদের একজনকে হত্যা করে ও অপর একজনকে হিন্দুরা চুল-দাড়ি কেটে অপমানিত করে খালি হাতে ফেরৎ পাঠায়।[48]

এমন কি আকবর ও জাহাঙ্গীরের সুপ্রতিষ্ঠিত মুঘল শাসনামলেও দেশব্যাপী তাদের প্রভাব ছিল অনেকটাই ভঙ্গুর। জাহাঙ্গীর তাঁর স্মৃতিকথা 'তারিখ-ই-সেলিম শাহী'তে লিখেছেন: '. . . অবাধ্য ও আনুগত্যহীনদের সংখ্যা মনে হয় কোনদিনও হ্রাস পাবে না। আমার পিতার ও পরবর্তীতে আমার শাসনামলে যেসব নজীর দেখা গেছে, তাতে মনে হয় সাম্রাজ্যে এমন কোনই প্রদেশ নেই, যার কোন না কোন অংশে অভিশপ্ত দুর্বৃত্তরা উঠে এসে বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরছে

---

47. Bernier F (1934) *Travels in the Mogul Empire (1656-1668)*, Revised Smith VA, Oxford, p. 40,210

48. Lal (1999), p. 118-119

না; যার কারণে হিন্দুস্থানে কখনোই সম্পূর্ণ শান্তির সময় দেখা যায়নি।' হিন্দুদের ঔদ্ধত্য সম্পর্কে ডার্ক হ. কল্‌ফ লিখেছেন: 'লক্ষ লক্ষ সশস্ত্র মানুষ, চাষী অথবা অন্যরা, সরকারের প্রজা না হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল।' আকবরের রাজ্যসভার সদস্য বাদায়ূনির জানান, হিন্দুরা জঙ্গলে তাদের গোপন আশ্রয়স' ল থেকে মাঝে মাঝেই মুসলিম বাহিনীর উপর হামলা করতো। যারা জঙ্গলে পালিয়েছিল, তারা জঙ্গলের জংলা ফলমূল ও নানারকম শস্য- দানা যেখানে যতটুকু পেত তা খেয়েই জীবনধারণ করতো।[49] কেন ও কীভাবে ভারতবর্ষে দীর্ঘকালের ইসলামী শাসনের পরও শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী মানুষ হিন্দু রয়ে গেছে, এসব উদাহরণ সে সম্পর্কে পাঠককে যথেষ্ট ধারণা দিবে।

ভারতে ইসলামে ধর্মান্তর ঘটে কিভাবে?

উপরোক্ত প্রমাণের আলোকে - দীর্ঘকাল মুসলিম শাসনের পরও কিভাবে ভারতের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ অমুসলিম রয়ে গেছে? - সেটি প্রশ্ন না করে, প্রশ্ন করা উচিত: ইসলামের বিরুদ্ধে হিন্দুদের প্রবল বিদ্বেষ ও প্রতিরোধ সত্ত্বেও কেন বা কীভাবে প্রায় ২০ ভাগ ভারতীয় মুসলিম হয়? অর্থাৎ বহু মুসলিম লেখক ও শাসকদের সত্যায়ন অনুযায়ী ইসলামের প্রতি হিন্দুদের বিরূপতা সত্ত্বেও কিভাবে মুসলিম জনসংখ্যা স্ফীত হয়?

তলোয়ার দ্বারা ধর্মান্তর

কুরআনের ৯:৫ আয়াতে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী নবী মুহাম্মদ বহুঈশ্বরবাদীদেরকে হয় ইসলাম গ্রহণ অথবা মৃত্যু - এ দুটো উপায়ের একটি বেছে নেয়ার মধ্য দিয়ে তরবারীর দ্বারা ইসলামে ধর্মান্তরিত করা শুরু করেন। সুতরাং মূর্তিপূজক হিন্দুদেরও ইসলাম কিংবা মৃত্যু - এ দুটোর একটি বেছে নেওয়ার কথা। মুহাম্মদ বিন কাসিম যখন সিন্ধু বিজয় শুরু করেন, তিনি বিজিত এলাকার লোকদেরকে মৃত্যুর যন্ত্রণায় ইসলামে ধর্মান্তরিতের নীতি প্রয়োগ শুরু করেন। যারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, মৃত্যু হয় তাদের বিধিলিপি; বাকী নারী ও শিশুরা দাসত্ব বরণের মাধ্যমে মুসলিম হয়ে যাবে। তবে তিনি সুযোগ দেন যে, কোন অঞ্চল যদি বিনা যুদ্ধে তার কাছে নতি স্বীকার করে, তাহলে তাদেরকে

---

[49]. Lal (1994), p. 64

তিনি গণহারে হত্যা বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত করবেন না। তার কিছুটা নমনীয় নীতির খবর বাগদাদে তার পৃষ্ঠপোষক হাজ্জাজের কাছে পৌঁছালে তিনি কাসিমকে লিখেন:

“. . . আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি যে উপায়ে ও নিয়মে এগোচ্ছো তা (ইসলামের) আইনসম্মত। তবে তুমি শত্রু-মিত্রের ভেদাভেদ না করে, ছোট-বড় নির্বিশেষে সবাইকে সুরক্ষা দিচ্ছ। ঈশ্বর বলেন: ‘অবিশ্বাসী পৌত্তলিকদেরকে কোনো সুযোগ না দিয়ে গলা কেটে ফেল।’ জেনে রাখো, এটা মহান আল্লাহর নির্দেশ। তাদেরকে রক্ষার জন্য তোমার এতটা উদগ্রীব হওয়া উচিত নয়। এরপর থেকে ইসলাম গ্রহণকারী ছাড়া কাউকে বাচিয়ে রেখো না। এটা একটা মূল্যবান প্রচেষ্টা ও তা মেনে চললে তোমার উপর মর্যাদাহানির কোন অভিযোগ আরোপিত হবে না।”[50]

হাজ্জাজের নিকট থেকে এ হুমকীপূর্ণ নির্দেশ পেয়ে কাসিম তার পরবর্তি ব্রাহ্মণাবাদ বিজয়ে আগাগোড়া তা অনুসরণ করে যারা ইসলাম-প্রত্যাখ্যানকারী কাউকে জীবিত রাখে নি। আল-বিলাদুরীর জানান: ব্রাহ্মণাবাদ বিজয়ে ‘আট কিংবা কারো কারো মতে ছাব্বিশ হাজার মানুষকে তরবারীর তলায় হত্যা করা হয়।’[51] যাহোক, হিন্দুরা অগণিত সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে এতগুলো মানুষকে তলোয়ারের তলায় ফেলা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তৎপরিবর্তে তাদেরকে বাচিয়ে রেখে কর আদায় করা ছিল অত্যন্ত লাভজনক বিকল্প। এ পরামর্শে কাসিম হাজ্জাজকে চিঠি লিখলে হাজ্জাজ উত্তর করেন:

‘আমার ভাতিজা মুহাম্মদ কাসিমের পত্র পেয়ে প্রকৃত ঘটনা অবগত হলাম। এতে জানা যাচ্ছে যে, ব্রাহ্মণাবাদের বিশিষ্ট নাগরিকরা তাদের বৌদ্ধ মন্দির মেরামত ও তাদের ধর্মানুসরণের সুযোগের জন্য আবেদন করেছে। যেহেতু তারা আনুগত্য স্বীকার করেছে ও খলীফাকে কর দিতে সম্মত হয়েছে, সুতরাং তাদের কাছ থেকে আর কিছুই সঠিকভাবে আশা করা যায় না। তারা আমাদের সুরক্ষায় (ধিম্মি/জিম্মি হিসেবে) এসেছে, এবং আমরা কোনভাবেই তাদের জীবন বা সম্পদের উপর হস্ত প্রসারিত করতে পারি না।’ [52]

---

[50]. Elliot & Dawson, Vol I., p. 173-74
[51]. Ibid, Vol. I, p. 122
[52]. Sharma, p. 109

এভাবে হিন্দুরা 'জিম্মি' প্রজা হিসেবে গৃহীত হয় এবং তরবারীর দ্বারা ধর্মান্তর করা থেকে অব্যাহতি পায়।

উমাইয়া শাসকদের ধর্মান্তরকরণে অনীহা: আগেই বলা হয়েছে যে, ধার্মিক মুসলিমরা বরাবরই উমাইয়া শাসকদেরকে ঈশ্বরহীন বা ধর্মহীন বলে নিন্দা করেছে। তার একটা কারণ, উমাইয়া শাসকরা অমুসলিমদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরকরণে কখনো আগ্রহী ছিল না। তৎপরিবর্তে তাদের কাছ থেকে উচ্চহারে কর আদায়ের মাধ্যমে রাজকোষ পূর্ণ করার দিকেই তাদের অধিকতর ঝোঁক ছিল। উদাহরণস্বরূপ, হাজ্জাজ ইসলাম গ্রহণকারীদের সাথে রুক্ষ ব্যবহার করতেন।[53] যখন একদল প্রজা তাকে জানাতে আসে যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, হাজ্জাজ তাদের ধর্মান্তর প্রত্যাখ্যান করেন ও তার বাহিনীকে হুকুম দেন ওসব নব্য মুসলিমদের তাদের গ্রামে ফেরত পাঠানোর জন্য।[54] মিসর বিজয়ের সময় মুয়াবিয়া (পরে প্রথম উমাইয়া খলীফা) মিসরীয় কপ্টরা (খ্রীষ্টান) গণহারে মুসলিম হয়ে যায় কিনা, সে চিন্তায় উদগ্রীব হয়ে উঠেন। কেননা তিনি মনে করেন: 'সবাই ইসলাম গ্রহণ করলে জিজিয়া কর দেওয়া থেকে মুক্ত হয়ে তারা অর্থভাণ্ডারের বড় একটা লোকসান ঘটাবে।' [55]

হিন্দুদের প্রতি ধর্মহীন উমাইয়া শাসকগণ প্রদর্শিত এ নমনীয়তা ছিল স্পষ্টতঃই কুরআন ও হাদীস নির্দেশিত ইসলামের আদর্শ আইনের অমান্যকরণ। ইসলামের অবমাননাকারী এ দৃষ্টান্ত বা ছাড় পরবর্তীতে হানাফী আইনে অঙ্গীভূত হয়, যদিও ইসলামের অন্যান্য সব আইনশাস্ত্রগুলো পৌত্তলিকদেরকে ইসলাম গ্রহণ কিংবা মৃত্যুর রায় বহাল রেখেছে। কাজেই, জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণের ক্ষেত্রে ভারতীয় হিন্দুরা নমনীয় উৎপীড়নের সম্মুখীন হয়।

৭৫০ সালে ঈশ্বরহীন উমাইয়া রাজবংশকে নিশ্চিহ্ন করে অধিকতর গোড়া ইসলামী আব্বাসী শাসকরা ক্ষমতায় এলে অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুদেরকে মৃত্যুর ভয়ে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়। সাফারাইদ শাসক ইয়াকুব লাইস ৮৭০ সালে কাবুল দখল করে কাবুলের

---

[53]. Bulliet RW (1979) *Conversion to Islam and the Emergence of a Muslim Society in Iran,* In N. Levtzion ed., *Conversion to Islam,* Holmes and Meier Publishers Inc., New York, p. 33

[54]. Pipes (1983), p. 52

[55]. Tagher, p. 19

রাজকুমারকে বন্দী করেন। তিনি আর- রাখাজ- এর রাজাকে হত্যা করে মন্দিরসমূহ ধ্বংস ও লুণ্ঠন করেন। এছাড়াও ইয়াকুব লেইস আর- রাখাজের বাসিন্দাদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেন। তিনি লুণ্ঠনের মালামাল বোঝাই করে রাজধানীতে ফিরে যান, যার মধ্যে ছিল তিন রাজার মস্তক ও ভারতীয় পূজার্চনার অনেক মূর্তি।[56]

সুলতান মাহমুদের মন্ত্রী আবু নাসের আল- উত্‌বী লিখেছেন, সুলতান মাহমুদের কনৌজ বিজয়কালে 'নাগরিকরা হয় ইসলাম গ্রহণ করে অথবা তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে ইসলামের তরবারীর খাবারে পরিণত হয়।' [57] উত্‌বী আরও লিখেছেন, বারান দখলের সময় 'আল্লাহর তরবারী খাপমুক্ত করে শাস্তির চাবুক তোলা হলে ১০ হাজার মানুষ ধর্মান্তরিত হতে ও মূর্তিপূজা প্রত্যাখ্যান করতে উদগ্রীব হয়ে উঠে।' [58]

শিক্ষিত, মার্জিত ও ইসলামী আইনশাস্ত্রের (ফিকাহ্) পণ্ডিত হিসেবে পরিচিত সুলতান মাহমুদ এক একটি শহর জয়ের পর সাধারণত পরাজিত পক্ষের যুদ্ধ করতে বা অস্ত্র ধরতে সক্ষমদের গণহারে হত্যা করতেন, তাদের নারী ও শিশুদেরকে ক্রীতদাস হিসেবে কব্জা করতেন এবং অবশিষ্টদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতেন। তিনি প্রায়শই এভাবে ধর্মান্তরিত এক রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসাতেন, যে অবশ্যই ইসলামী আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করবে এবং ইসলামের বিস্তার ও প্রতিমা- পূঁজা প্রতিরোধের তদারকী করবে। এরূপ এক ধর্মান্তরিত যুবরাজ ছিলেন নওশা শাহ। আল উত্‌বী লিখেছেন, 'সুলতান মাহমুদের ভারত ত্যাগের পর নওশা শাহ'র উপর শয়তান ভর করে, কারণ তিনি পুনরায় মূর্তি- পূঁজার দিকে ঝুঁকে পড়েন। সুতরাং সুলতান ঝড়ের বেগে সেখানে গিয়ে শত্রুর রক্তে তরবারী রঞ্জিত করেন।'[59] এর অর্থ দাঁড়ায় যে, সুলতান মাহমুদ তার ভারত অভিযানের সময় শুধুমাত্র তলোয়ার দিয়ে জনগণকে ধর্মান্তরিতই করেন নি; তিনি গজনী ফিরে যাবার পর নব্য মুসলিমরা যাতে তাদের পিতৃপুরুষের ধর্মে ফিরে না যায়, সেটিও নিশ্চিত করতেন। এমনকি ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগের সময়ও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েক মিলিয়ন

---

[56]. Elliot & Dawson, Vol. II, p. 419
[57]. Ibid, p. 26
[58]. Ibid, p. 42-43
[59]. Ibid, p. 33

অমুসলিমকে মৃত্যুর মুখে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয় (দেখুন এ লেখকের “ইসলামী সাম্রাজবাদ” বইটি)।

ক্রীতদাসকরণের মাধ্যমে ধর্মান্তর

ভারতে ইসলামের প্রথম সফল অনুপ্রবেশেই মুহাম্মদ বিন কাসিম দেবল, ব্রাহ্মণাবাদ ও মুলতানে বিপুল সংখ্যক মানুষকে হত্যা করেন। সাধারণত অস্ত্র বহনে সক্ষম এমন বয়সের যুবা- বৃদ্ধ যারাই মুসলিমদের আক্রমণের সময় তার বাহিনীর সামনে পড়ে, তাদের সবাইকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। নিঃসন্দেহে এ অবস্থায় তারা জীবন বাঁচাতে প্রিয়জন স্ত্রী- সন্তানকে বিপন্ন অবস্থায় রেখে যে যেদিকে পেরেছে পালিয়েছে। তাদের নারী ও শিশুদেরকে বিজয়ী বীরেরা ক্রীতদাস হিসেবে ধরে নিয়ে যেত। “চাচনামা”য় লিখিত হয়েছে যে, কাসিমের রাওয়ার আক্রমণে ৬০,০০০ লোক ক্রীতদাস হয়, এবং সিন্ধু বিজয়ের চূড়ান্ত পর্বে ১০০,০০০ নারী ও শিশু ক্রীতদাসে পরিণত হয়।[60]

সবগুলো মুসলিম অভিযানে ক্রীতদাস হিসেবে ধৃত নারী ও শিশুদের সংখ্যা পদ্ধতিগতভাবে লিখিত হয় নি। ধারণা করা যেতে পারে যে, সেহওয়ান, ধালিলা, ব্রাহ্মণাবাদ ও মুলতানের মত প্রধান প্রধান আক্রমণে প্রায় সম সংখ্যক মানুষ বন্দী হয়। কাজেই ভারতের সিন্ধু সীমান্তে কাসিমের তিন বছরের (৭১২- ১৫) সংক্ষিপ্ত, অথচ কৃতিত্বপূর্ণ, অভিযানে সম্ভবত কয়েক লাখ লোক ক্রীতদাস হিসেবে ধৃত হয়। কাসিম সব সময় কুরআন, নবীর দৃষ্টান্ত ও শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী (কোরান ৮:৪১) বন্দী ও অন্যান্য লুণ্ঠিত সামগ্রীর এক- পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রের হিস্যারূপে দামেস্কে খলীফার নিকট প্রেরণ করে অবশিষ্টাংশ তাঁর সৈনিকদের মাঝে বিতরণ করে দিতেন। এভাবে ক্রীতদাস নারী ও শিশুরা মুসলিমদের সম্পদে পরিণত হয় ও ইসলামে প্রবেশ করে। কয়েক বছরের মধ্যেই এসব ক্রীতদাস শিশুরা যখন পরিণত বয়সী মুসলিম হয়ে উঠে, তখন তারা হিন্দুদের বিরুদ্ধে আয়োজিত নতুন পবিত্র যুদ্ধে লিপ্ত হতে মুসলিম সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। অথচ যে হিন্দুদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হতো, তারা কয়েক বছর আগে ছিল তাদেরই আত্মীয়- স্বজন, একই ধর্মের

---

60. Lal (1994), p. 18-19

অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ অল্প সময়ের ব্যবধানে দাস হিসেবে কব্জাকৃত এসব শিশুরা মুসলিম রাষ্ট্রের হাতিয়ারে পরিণত হয় - ইসলামের পরিধি বিস্তারে জিহাদে লিপ্ত হয়ে পরাজিত অবিশ্বাসীদেরকে তলোয়ারের হুমকিতে ধর্মান্তরকরণ, তাদের নারী ও শিশুদেরকে ক্রীতদাস বানানো এবং তাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠনের জন্য। এমনকি ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারত ভাগের আন্দোলনকালেও প্রায় ১০০,০০০ হিন্দু ও শিখ নারীদের দাসী বানানো হয়। তাদেরকে বাড়ী থেকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে মুসলিমের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় (দেখুন "ইসলামী সাম্রাজবাদ")।

বংশবৃদ্ধির যন্ত্ররূপে ক্রীতদাস নারী

কুরআন ও নবীর প্রথা বা হাদীস অনুযায়ী নারী-বন্দীরা তাদের মুসলিম মালিক বা প্রভুদের দ্বারা যৌনদাসীরূপে ব্যবহৃত হতো (ইসলামে চর্চিত দাসপ্রথা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন এ লেখকের "ইসলামী দাসত্ব" বইটি)। সুতরাং তারা দাসীরূপে ধৃত মুসলিম হয়ে সরাসরি মুসলিম জনসংখ্যা তো বৃদ্ধি করেই, পরন্তু মুসলিমদের জন্য সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েও তারা মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে মূল্যবান ভূমিকা রাখে। বিশেষত সন্তান উৎপাদনে সক্ষম হিন্দু নারীদেরকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর ভয়ে পালিয়ে যাওয়া হিন্দুরা ফিরে এসে দেখতো যে, তাদের নারী ও সন্তানরা আর নেই। এর ফলে হিন্দুরা সন্তানাদি জন্ম দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সঙ্গী থেকে বঞ্চিত হয়। অর্থাৎ যেখানেই মুসলিমরা সফল আক্রমণ করেছে সেখানেই হিন্দুদের বংশবৃদ্ধি থমকে যায় বা দ্রুত হ্রাস পায়। অপরদিকে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সঙ্গে যে কয়েক হাজার মুসলিম যোদ্ধা ভারতে এসেছিল, তারা পর্যাপ্ত বা উপচে-পড়া সংখ্যায় যৌনসঙ্গী পাওয়ায় সর্বোচ্চ হারে বংশ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। আকবর তার হারেমে ৫,০০০ সুন্দরী রমণীর সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। মরক্কোর সুলতান মাউলে ইসমাইল (১৬৭২-১৭২৭) তার ২,০০০-৪,০০০ হাজার স্ত্রী ও উপপত্নীর মাধ্যমে প্রায় ১,২০০ সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন।[61] পরাজিত হিন্দুদেরকে ব্যাপকহারে ক্রীতদাসকরণ - বিশেষ করে নারীদেরকে,

[61]. Milton G (2004) *White Gold*, Hodder & Stoughton, London, p. 120

যারা মুসলিম সন্তান উৎপাদনে সম্পৃক্ত হয় - তা মুসলিম জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

সুতরাং মুসলিমরা ভারতের যেখানেই সার্থকভাবে আক্রমণ করেছে, সেখানেই হিন্দু পুরুষদেরকে গণহারে হত্যা ও তাদের নারী-শিশুদেরকে বন্দী করে হিন্দু জনসংখ্যা সরাসরি হ্রাস করেছে। পরোক্ষভাবে, সন্তান উৎপাদনক্ষম নারীদেরকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে হিন্দু পুরুষদেরকে যৌনসঙ্গী থেকে বঞ্চিত করে হিন্‌দুদের বংশবৃদ্ধিতে অন্তরায় সৃষ্টিও হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস করেছে। যেহেতু হিন্দু পরিবারগুলোর নারীরা পরবর্তীকালে মুসলিম সন্তান জন্মদানের যন্ত্রে পরিণত হয়, সেহেতু গণহারে ক্রীতদাসকরণের চূড়ান্ত ফলাফল দাঁড়ায়: হিন্দু জনসংখ্যার দ্রুত হ্রাস ও মুসলিম জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি। আর দ্রুত বর্ধিত এ মুসলিম জনসংখ্যার রক্ষণাবেক্ষণ হতো পরাজিত হিন্দু বা অমুসলিমদেরকে নিষ্পেষিত করা করের মাধ্যমে। এটা মূলত সে একই আচরণ- বিধি, যা নবী মুহাম্মদ বানু কুরাইজা ও খাইবারের ইহুদীদের উপর প্রয়োগ করেছিলেন।

সুতরাং মুহাম্মদ বিন কাসিমের তিন বছরব্যাপী ভারত আক্রমণ ও শাসনকালে শুধুমাত্র ক্রীতদাস হিসেবেই সরাসরি কয়েক লাখ হিন্দু ইসলামে যুক্ত হয় নি, বন্দী নারীরাও মুসলিম সন্তান উৎপাদনের যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়ে মুসলিম জনসংখ্যার দ্রুত বিস্তার ঘটায়। নবীর শুরু করা এ প্রক্রিয়া পরবর্তী মুসলিমরা সর্বত্র প্রয়োগ করেছে। ভারতে ইসলাম- বর্জনকারী সম্রাট আকবর ১৫৬৪ সালে এ চর্চা সাময়িকের জন্য নিষিদ্ধ করলেও তা মূলত অকার্যকর হয়ে পড়ে। সুলতান মাহমুদ তার ভারতে অভিযানে ব্যাপকহারে হিন্দু নিধন করে অগণিত নারী ও শিশুকে দাসরূপে নিয়ে যান। আল উত্‌বি লিখেছেন যে, সুলতান মাহমুদ তার ১০০১- ১০০২ সালের ভারত অভিযানে ৫০০, ০০০ বন্দীকে গজ্‌নিতে নিয়ে যান; পাঞ্জাবের নিন্দুনা আক্রমণে তিনি বিপুল সংখ্যক ক্রীতদাস আটক করেন; হরিয়ানার থানেশ্বরে মাহমুদ ২০০, ০০০ লোককে ক্রীতদাস বানান এবং ১০১৯ সালে ৫৩, ০০০ ক্রীতদাসকে নিয়ে ফিরে যান।[62]

---

[62]. Lal (1994), p. 20

মুসলিম ইতিহাসবিদদের তথ্যের ভিত্তিতে অধ্যাপক কে. এস. লাল- এর হিসাব অনুযায়ী উত্তর ভারতে সুলতান মাহমুদের পুনঃপুনঃ আক্রমণের ফলে প্রায় ২০ লাখ হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস পায়।[63] এদের মধ্যে আক্রমণকালে অনেককে হত্যা করা হয়েছিল এবং অবশিষ্ট বিপুল সংখ্যককে তরবারীর মুখে ক্রীতদাসরূপে কব্জা করা হয়, যারা স্বভাবতই মুসলিম হয়ে যায়।

অতঃপর সুলতান মোহাম্মদ ঘোরী (মুইজুদ্দিন, মৃত্যু ১২০৬) ও তার সেনাপতি কুতুবুদ্দিন আইবক ভারতে মুসলিম শক্তি সুসংহত করার কাজে যোগ দিয়ে ১২০৬ সালে দিল্লীর সুলতানাত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতে প্রত্যক্ষ মুসলিম শাসন শুরু করেন। মোহাম্মদ ফেরিশতার তথ্যমতে, 'মুইজুদ্দিন কর্তৃক দুই থেকে তিন লাখ 'খোখার' (হিন্দু) ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছিল।' ফখর- ই- মুদাবী্বর মুইজুদ্দিন ও আইবকের নির্যাতন ও ক্রীতদাসকরণের চিত্রটি তুলে ধরেছে এভাবে: 'এমনকি গরিব (মুসলিম) বস্তিয়ালাও অসংখ্য ক্রীতদাসের মালিক বনে যায়।'[64]

ইসলামত্যাগী আকবরের শাসনকাল (১৫৫৬- ১৬০৫) পর্যন্ত যুদ্ধে বন্দীদেরকে দাসকরণ মুসলিম- শাসিত ভারতবর্ষে একটা সাধারণ নীতি হিসেবে বহাল থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে গণহারে ক্রীতদাস বানানোর প্রক্রিয়া আকবর নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু সে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তার আমলেই যুগ-যুগ ধরে চলে আসা এ ঐতিহ্য প্রবলভাবেই বহাল থাকে। তার মুক্তচিন্তক উপদেষ্টা আবুল ফজল হতাশার সাথে 'আকবর নামা'য় লিখেছেন: 'অনেক খারাপ মনের অবাধ্য অফিসার লুণ্ঠন করতে গ্রামে ও মহলে অগ্রসর হয়'। এসব লুণ্ঠনে সাধারণত নারী ও শিশুদের উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। মোরল্যান্ড উল্লেখ করেছেন যে, আকবরের রাজত্বকালেও 'স্পষ্ট কোনো যুক্তি ছাড়াই একটা বা অনেকগুলো গ্রাম একজোটে হানা দেওয়া ও (হিন্দু) বাসিন্দাদেরকে দাসরূপে নিয়ে যাওয়া একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।'[65] এ প্রেক্ষাপটে আকবরের

---

[63]. Lal KS (1973) *Growth of Muslim Population in Medieval India*, Aditya Prakashan, New Delhi, p. 211-17

[64]. Lal (1994), p. 43-44

[65]. Moreland WH (1995) *India at the Death of Akbar*, Low Price Publication, New Delhi, p. 92

এক সেনানায়ক আব্দুল্লাহ্ খান উজ্বেক যখন নিম্নোক্ত ঘোষণা দেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই থাকে না:

"আমি পাঁচ লাখ (৫০০, ০০০) নারী ও পুরুষকে বন্দী করে বিক্রি করেছি। তারা সবাই মোহাম্মদী হয়েছে। 'বিচারের দিন' তাদের বংশধররা এক কোটিতে পরিণত হবে।"[66]

আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর ও শাহ্জাহানের পরবর্তী শাসনকালে ইসলামীকরণ উত্তরোত্তর পুনরুজ্জীবিত হতে থাকে। 'শাহ্ ফাত-ই-কাংগ্রা' উদার ও দয়ালু শাসকরূপে পরিচিত জাহাঙ্গীর সম্বন্ধে লিখেছে: 'তিনি তার সমস্ত প্রচেষ্টা মোহাম্মদী ধর্ম প্রচারে উৎসর্গ করেন' এবং তার 'সমস্ত প্রয়াস সর্বদা পৌত্তলিকতার অগ্নি নির্বাপিত করার জন্য পরিচালিত হয়।'[67] 'ইনি-খাব-ই-জাহাঙ্গীর শাহী' কিতাব অনুসারে গুজরাটের জৈনরা যখন একটা সুন্দর মন্দির নির্মাণ করে, যা বিপুল সংখ্যক ভক্তের দৃষ্টি কাড়ে, সম্রাট জাহাঙ্গীর তাদেরকে দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন করতে ও তাদের মন্দিরটিকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে নির্দেশ দেন। তাদের মূর্তিগুলোকে মসজিদের সিঁড়ির সবচেয়ে উপরের ধাপে স্থাপনের হুকুম দেওয়া হয়, যাতে করে মুসলিম নামাজীরা মসজিদে প্রবেশের পথে সেগুলোকে পদদলিত করতে পারে।[68] ওদিকে সম্রাট শাহ্জাহান তার পিতা জাহাঙ্গীরের চেয়েও অনেক গোঁড়া ছিলেন। আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭) রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় দাসকরণ ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণকে আবার পূর্ণোদ্যমে ফিরিয়ে আনেন। এমনকি ১৭৫৭ সালে ব্রিটিশদের বাংলা দখলের পরও গোটা ভারতে মুসলিম শাসকদের দাসকরণ অব্যাহত থাকে। 'সিয়ার-উল-মুতাখিরিন' গ্রন্থ অনুযায়ী, ১৭৬১ সালে 'পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধে' আহ্মদ শাহ আবদালীর বিজয়ের পর খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে কাতর মৃতপ্রায় বন্দীদেরকে দীর্ঘ সারি বেধে কুচকাওয়াজে বাধ্য করে অবশেষে শিরশ্ছেদ করা হয়। এরপর বন্দীকৃত তাদের ২২ হাজার নারী ও সন্তানদেরকে দাসরূপে নিয়ে যাওয়া হয়, যাদের মধ্যে অনেকেই ছিল দেশের সর্বোচ্চ মর্যাদাশীল শ্রেণীর।[69] এর প্রায় দুই দশক আগে

---

66. Lal (1994), p. 73
67. Elliot & Dawson, Vol. VI, p. 528-29
68. Ibid, p. 451
69. Lal 91994), p. 155

(১৭৩৮) ইরানের নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেন। অবর্ণনীয় ভয়াবহ ধ্বংসলীলা, স্বেচ্ছাচারিতা ও লুটতরাজের পর হাজার হাজার লোককে দাস বানিয়ে বিপুল ধনসম্পদ নিয়ে তিনি দেশে ফিরেন। নাদির শাহ তার অভিযানে প্রায় ২০০, ০০০ ভারতীয়কে হত্যা করেন।

এখন এটা অনুধাবন করা কঠিন হবে না যে, ভারতে মুসলিম জনসংখ্যার স্ফীতিতে হিন্দুদেরকে দাসকরণ সম্ভবত অন্য যে কোন উৎসের তুলনায় বেশী ভূমিকা রাখে। জেনারেল আব্দুল্লাহ খান উজ্‌বেকের উপরোক্ত আত্মগর্বী উক্তিটি এ দাবীর সত্যতা প্রতিফলিত করে। মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে নারী- ক্রীতদাসদের অবদান সম্পর্কে আর্নল্ড বলেন: 'বিপুল সংখ্যক বন্দীকৃত নারীদাসীরা উপপত্নীরূপে ব্যবহৃত হয়ে দ্রুততার সঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারতো।'[70] এর সাথে সায় দিয়ে মোহাম্মদ আশরাফ মনে করেন: 'ক্রীতদাসরা ভারতের বর্ধিত মুসলিম জনসংখ্যার সাথে যুক্ত হয়েছে।'[71] এ ক্ষেত্রে আশরাফ কিছুটা বেঠিক এ জন্য যে, ক্রীতদাসরা শুধু বৃদ্ধিশীল মুসলিম জনসংখ্যার সঙ্গে যুক্তই হয়নি, বরং প্রাথমিক বছর ও দশকগুলোতে ক্রীতদাসরাই মুসলিম জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ ছিল। এবং পরবর্তি সময়ে একদিকে ক্রীতদাসরা অব্যাহতভাবে যুক্ত হতে থাকে, অন্যদিকে প্রধানত নারীদাস কর্তৃক উৎপাদিত সন্তানেরা মুসলিম জনসংখ্যাকে স্ফীত করে।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ এটা প্রতীয়মান করে যে, আধুনিক ইসলামী পণ্ডিত শেখ আল- কারাদাউই, ডঃ জাকির নায়েক ও ডঃ ফজলুর রহমান প্রমুখের মতামতের বিপরীতে, ঠিক বিজয়ের মুহূর্তে স্পষ্টতঃই ধর্মান্তর ও মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি শুরু হয়। সুলতান মাহমুদ ও ইয়াকুব লাইসের মত হানাদারদের দ্বারা বিজিতদেরকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরের মাধ্যমে এবং তরবারীর ফলার মুখে নারী- শিশুকে ব্যাপকহারে ক্রীতদাস বানিয়ে তাদেরকে মুসলিমকরণের মাধ্যমে তা শুরু হয়। নবী মুহাম্মদের সময় থেকেই নারী, বিশেষত তরুণীরা, মুসলিমদের ক্রীতদাসকরণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল। সেসব ক্রীতদাসকৃত নারীরা মুসলিম সন্তান জন্মদানের মাধ্যমে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হাতিয়ারে পরিণত হয়।

---

[70]. Arnold TW (1896) *The Preaching of Islam*, Westminster, p. 365

[71]. Ashraf KM (1935) Life and Conditions of the People of Hindustan, Calcutta, p. 151

ধর্মান্তরকরণে অমুসলিমদের উপর অবমাননা ও অর্থনৈতিক বোঝার প্রভাব

ইসলাম একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টান ও ইহুদীদেরকে 'জিম্মি' প্রজা রূপে গণ্য করে। যদিও আল্লাহ বহুঈশ্বরবাদী হিন্দু, বৌদ্ধ ও সর্বপ্রাণবাদী প্রভৃতি জনগোষ্ঠীকে হয় ধর্মান্তর কিংবা মৃত্যুবরণ বেছে নেওয়ার রায় দিয়েছে, কিন্তু ঈশ্বরহীন উমাইয়া শাসকরা ভারতের সিন্ধু বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণে অনিচ্ছুক বিপুল সংখ্যক বহুঈশ্বরবাদী লোককে হত্যা করার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। সাধারণত মুহাম্মদের ধর্ম বিস্তারের পরিবর্তে বিজিতদের উপর চড়া হারে কর আরোপের মাধ্যমে রাজকোষ পূর্ণ করতে অধিক আগ্রহী উমাইয়া শাসকরা ভারতের বিপুল সংখ্যক বহুঈশ্বরবাদীকে রাজস্ব যোগানদাতা হিসেবে গ্রহণ করে তাদেরকে মৃত্যু থেকে রেহাই দেয়। অতএব উমাইয়ারা কুরআনের নির্দেশ (কোরান ৯:৫) লঙ্ঘন করে এসব বহুঈশ্বরবাদীকে 'জিম্মি' শ্রেণীর প্রজায় উন্নীত করে। জিম্মিরা সাধারণতঃ সামাজিকভাবে চরম মর্যাদাহানি ও অবমাননা এবং অর্থনৈতিকভাবে শোষণের শিকার হয়, যা তাদেরকে প্রচণ্ড দুর্দশনার মধ্যে পতিত করে শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করে। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা 'ওমরের চুক্তি'তে (কোন কোন লেখকের মতে খলীফা দ্বিতীয় ওমর; রা. ৭১৭- ৭১৯) ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী মুসলিম রাষ্ট্রে 'জিম্মি' প্রজাদের প্রতি আচরণ নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

ওমরের চুক্তি: ইসলামের শাফী আইনশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম শাফীর 'কিতাব- উল- উম্ম' ('গ্রন্থের মাতা') গ্রন্থে এ চুক্তিটি উদ্ধৃত হয়েছে। আরবদের সিরিয়া দখলের পর খলীফা ওমরের নির্দেশে সিরিয়ার খ্রীষ্টানদের প্রধান ও খলীফার মাঝে এ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। এতে মুসলিম নিয়ম- কানুনের প্রতি 'জিম্মি'দের পূর্ণাঙ্গ ও অবমাননাকর অধীনতা দাবী করে বলা হয়েছে যে, তাদের আনুগত্যের প্রমাণস্বরূপ তারা বৈষম্যমূলক কর প্রদান করবে। এছাড়াও সামাজিক- রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের জন্য মর্যাদাহানিকর ও অমানবিক অক্ষমতার শর্ত যুক্ত হয়েছে এ চুক্তিতে। খলীফা ওমর সিরিয়ার খ্রীষ্টান প্রধানকে ইসলামের কাছে তাদের আনুগত্যের শর্ত নির্ধারণ করে একটা চুক্তিপত্র পাঠান। চুক্তিটির প্রধান শর্তগুলো হলো:[72]

---

72. Triton, p. 12-24

“আমি ও সমস্ত মুসলিম তোমার ও তোমার খ্রীষ্টান সদস্যদের নিরাপত্তার অঙ্গীকার করছি যতদিন তোমরা তোমাদের উপর আরোপিত শর্তসমূহ মেনে চলবে। শর্তগুলো হলো:

১) তোমরা শুধু মুসলিম আইনের অধীনস্ত হবে, অন্য কারো নয়। এবং আমরা তোমাদেরকে যা করতে বলব, তা অস্বীকার করতে পারবে না।

২) যদি তোমাদের মধ্যে কেউ নবী, তাঁর ধর্ম বা কুরআন সম্বন্ধে অশালীন কিছু বলে, সে আল্লাহর, বিশ্বাসীদের সেনাপতির ও সমস্ত মুসলিমের সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে। যে শর্তে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছিল, তা বাতিল হবে ও তোমাদের জীবন হবে আইনের সীমার বাইরে।

৩) যদি তোমাদের মধ্যে কেউ কোনও মুসলিম নারীর সঙ্গে যৌনকর্মে লিপ্ত হয় কিংবা কোনো মুসলিম নারীকে বিয়ে করে, বা পথে কোনো মুসলিমের উপর ডাকাতি করে, অথবা কোনো মুসলিমকে ইসলাম থেকে ধর্মচ্যুত করে, অথবা আমাদের শত্রুকে সাহায্য করে, অথবা কোনো গুপ্তচরকে আশ্রয় দেয়, তাহলে সে চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং তার জীবন ও সম্পদ আইনের বাইরে।

৪) কোনো মুসলিমের সম্পদ ও মর্যাদার প্রতি এর চেয়ে কম ক্ষতি যে করবে সে উপযুক্ত শাস্তি পাবে।

৫) মুসলিমদের সঙ্গে তোমাদের আচরণ আমরা পর্যবেক্ষণ করবো। এবং তোমরা মুসলিমদের প্রতি বেআইনী কিছু করলে আমরা এ চুক্তি বাতিল ঘোষণা করবো ও তোমাদেরকে শাস্তি দিব।

৬) যদি তোমরা কিংবা অন্য অবিশ্বাসীরা বিচার চায়, আমরা মুসলিম আইন অনুযায়ী বিচার করবো।

৭) কোনো মুসলিম শহরে ক্রুশ প্রদর্শন করবে না, অথবা (যীশুর) মূর্তি নিয়ে মিছিল করতে পারবে না, তোমাদের প্রার্থনার জন্য কোনো গির্জা নির্মাণ বা সমবেত হওয়ার স্থান সৃষ্টি করতে পারবে না; (চার্চের) ঘণ্টা বাজাতে পারবে না; বা কোনো মুসলিমের কাছে মেরীর পুত্র যীশু সম্বন্ধে কোনো পৌত্তলিক ভাষা (অর্থাৎ যীশু ঈশ্বরের পুত্র) ব্যবহার করতে পারবে না।

৮) তোমরা পোশাকের উপরে ‘জুন্নর’ (ফিতা, খ্রীস্টানের চিহ্ন স্বরূপ) পরিধান করবে, যা কখনোই লুকাতে পারবে না।

৯) ঘোড়ায় চড়তে তোমরা বিশেষ গদী ব্যবহার করবে ও ভিন্ন ভঙ্গি করবে এবং একটা চিহ্ন দ্বারা তোমাদের 'কালানুয়াস' (টুপি) মুসলিমদের টুপি থেকে আলাদা করবে।

১০) মুসলিমরা উপস্থিত থাকলে তোমরা রাস্তার অগ্রভাগে যাবে না বা সমাবেশের প্রধান আসনে বসবে না।

১১) প্রত্যেক সুস্থ সাবালককে 'জিজিয়া' বা বশ্যতা কর দিতে হবে, নতুন বছরে পূর্ণ মাপের এক 'দিনার' করে। কর না দেওয়া পর্যন্ত সে শহর ত্যাগ করতে পারবে না।

১২) কোন গরীব লোক নিজস্ব জিজিয়া পরিশোধ না করা পর্যন্ত দায়গ্রস্ত থাকবে। দারিদ্র্য 'জিজিয়া' প্রদানের দায়িত্ব বাতিল করবে না, যেমন করে না তোমাদেরকে প্রদত্ত সুরক্ষাকে বাতিল। তোমাদের যা আছে তাই আমরা নিয়ে নিব। বণিক হিসেবে ছাড়া যতদিন তোমরা মুসলিম ভূখণ্ডে বসবাস ও ভ্রমণ করবে, ততদিন জিজিয়াই তোমাদের একমাত্র বোঝা।

১৩) কোনো অবস্থাতেই তোমরা মক্কায় প্রবেশ করবে না। পণ্যদ্রব্যসহ যদি ভ্রমণ কর, তাহলে তার এক-দশমাংশ মুসলিমদেরকে দিতে হবে। মক্কা ব্যতীত তোমরা ইচ্ছামতো অন্য যে কোনো স্থানে যেতে পারো। হেজাজ ব্যতীত অন্য যে কোনো মুসলিম দেশে তোমরা থাকতে পারো। হেজাজে তিন দিনের বেশী অবস্থান করতে পারবে না।

এগুলো হলো আদর্শ শর্তাবলী, যা একটা আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রে খ্রীষ্টান ও ইহুদী প্রজাদের ('হানাফী'-আইনের অধীনস্থ রাষ্ট্রে পৌত্তলিকদের উপরও) উপর অবশ্যই আরোপিত হবে। জিম্মিদের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কিত 'ওমরের চুক্তি'টি সুস্পষ্টভাবেই আল্লাহর কুরআন (আয়াত ৯:২৯) ও নবীর দৃষ্টান্তের সঙ্গে সমন্বিত। অতএব অষ্টম শতাব্দীর বিখ্যাত 'হানাফী' আইনশাস্ত্রবিদ আবু ইউসুফ লিখেছেন: 'ওমরের চুক্তি পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত বৈধ ও চালু থাকবে।'[73] ইহুদী ও খ্রীষ্টান (ভারতে হিন্দুরাও), যারা ছিল তাদের স্ব-স্ব জন্মভূমিতে ন্যায্যভাবে মুক্ত ও সম্মানিত মানুষ, তাদেরকে হানাদার মুসলিম শাসকদের কাছে এরূপ অবমাননাকর আনুগত্য স্বীকার করতে হয়।

---

[73]. Ibid, p. 37

জিম্মিদের প্রতি এরূপ আচরণ তাদের মাঝে ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য কী প্রচণ্ড মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে সেটি কল্পনা করা আদৌ কঠিন নয়।

জিজিয়া ও অবমাননা: মুসলিম রাষ্ট্রে 'জিম্মি' প্রজাদেরকে কিরূপ অবমাননাকর পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয়েছে, তাদের উপর আরোপিত 'জিজিয়া' কর আদায়ের আনুষ্ঠানিকতা তার স্পষ্ট ধারণা দেবে। জিজিয়া কর প্রদান চট করে একটা চেক লিখে দেওয়া কিংবা কালেক্টরের অফিসে টাকা পাঠিয়ে দেওয়ার মত নয়। আল্লাহর দাবী অনুযায়ী, জিম্মিদেরকে জিজিয়া প্রদান করতে হবে এমনভাবে যে, তা তাদের মাঝে বশ্যতা স্বীকার ও স্বেচ্ছায় অবমানিত হওয়ার অনুভব সৃষ্টি করে (কুরআন ৯:২৯)। বিখ্যাত ইসলামী বিশ্লেষক আল-জামাকশারী (মৃত্যু ১১৪৪) জিজিয়া প্রদানের উপর কুরআনের ৯:২৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে:[74]

তাদের নিকট থেকে জিজিয়া নেয়া হবে অবমাননা ও মর্যাদাহানিকরভাবে। (জিম্মিকে) সশরীরে হেঁটে আসতে হবে, ঘোড়ায় চড়ে নয়। যখন সে জিজিয়া প্রদান করবে, তখন কর-আদায়কারী বসে থাকবে আর সে থাকবে দাঁড়িয়ে। আদায়কারী তার ঘাড় ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলবে: 'জিজিয়া পরিশোধ কর!' এবং জিজিয়া পরিশোধের পর আদায়কারী ঘাড়ের পিছনে একটা চাটি মেরে তাকে তাড়িয়ে দেবে।

ষষ্ঠদশ শতকে মিশরের বিখ্যাত সূফী পণ্ডিত আস-সারানী তার 'কিতাব আল-মিজান' গ্রন্থে জিজিয়া প্রদান সম্বন্ধে নিম্নরূপ বর্ণনা দেন:[75]

খ্রীষ্টান বা ইহুদী জিম্মি নির্দিষ্ট দিনে বশ্যতা কর (জিজিয়া) গ্রহণের জন্য নিয়োজিত আমিরের কাছে সশরীরে হাজির হবে। তিনি বসে থাকবেন একটি উঁচু আসনে। জিম্মি তার সম্মুখে হাজির হয়ে হস্ত প্রসারিত করে কর প্রদানের প্রস্তাব করবে। আমীর এমনভাবে সেটি গ্রহণ করবে যাতে তার হাত উপরে থাকে, জিম্মির হাত নিচে। অতঃপর আমীর তার ঘাড়ে একটা চাটি মারবে এবং আমীরের সামনে উপসি' ত লোকেরা (মুসলিম) তাকে রূঢ়ভাবে হটিয়ে দিবে। ...এ দৃশ্য দেখার জন্য সাধারণ জনগণের উপস্থিতির অনুমতি ছিল।

---

74. Ibn warraq, p. 228-29
75. Triton, p. 227

এখন আমরা দেখব ভারতে কিভাবে জিজিয়া কর আদায় করা হতো। সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৬৭৯ সালে ভারতে জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন (স্বধর্মত্যাগী আকবর কর্তৃক ইতিপূর্বে বাতিলকৃত) করে জিজিয়া প্রদানের নিম্নোক্ত পদ্ধতি ঘোষণা করেন:

মৃতব্যক্তি ও ইসলাম গ্রহণকারীর উপর জিজিয়া প্রযোজ্য হবে না। অমুসলিম ব্যক্তি নিজে জিজিয়া নিয়ে আসবে। সে তার কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে পাঠালে তা গৃহীত হবে না। জিজিয়া প্রদানের সময় অমুসলিম অবশ্যই দাঁড়িয়ে থাকবে এবং আদায়কারী উপবিষ্ট থাকবেন। অমুসলিমের হাত নীচে থাকবে এবং আদায়কারীর হাত থাকবে উপরে। এবং তিনি বলবেন, 'হে অমুসলিম, জিজিয়া প্রদান কর।'[76]

'খারাজ' বা ভূমিকর আদায়ের ব্যাপারে সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী বিজ্ঞ ইসলামী পণ্ডিত কাজী মুঘিসুদ্দিনের কাছে উপদেশ চাইলে, কাজী একই পদ্ধতির বর্ণনা দিয়ে তার সঙ্গে যোগ করেন যে:

'আদায়কারী যদি তার ('খারাজ' দাতার) মুখে থু-থু দিতে চান, তাহলে সে মুখ হা করবে। তার উপর এ চরম অপমান ও আদায়কারী কর্তৃক তার মুখের ভিতরে থু-থু দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো এ শ্রেণীর উপর আরোপিত চরম বশ্যতা, ইসলামের গৌরব ও বিশ্বাসের প্রতি মহিমান্যতা এবং মিথ্যা ধর্মের (হিন্দুত্ববাদ) প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন।'[77]

একইভাবে কাশ্মীরের সহনশীল সুলতান জয়নুল আবেদীনের (১৪১৭-৬৭) কাছে লেখা এক চিঠিতে পারস্যের ইসলামী পণ্ডিত মোল্লা আহমদ লেখেন:

'তাদের উপর জিজিয়া আরোপের প্রধান উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে অবমানিত করা। ঈশ্বর তাদেরকে অসম্মানিত করার জন্যই জিজিয়া প্রতিষ্ঠা করেছেন। এর উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে অপমানিত এবং মুসলিমদের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা।'[78]

জনপ্রিয় সূফী সাধক শেখ আহমদ সিরহিন্দী (১৫৬৪-১৬২৪) অমুসলিমদের প্রতি সম্রাট আকবরের উদার ও সহনশীল নীতিতে অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে ইসলামী আইনের লংঘন আখ্যায়িত করে তার দরবারে চিঠি পাঠান। চিঠিটিতে সিরহিন্দী লিখেন:

---

[76]. Lal (1999), p. 116
[77]. Ibid, p. 130
[78]. Ibid, p. 113

'ইসলামের সম্মান 'কুফরী' (অবিশ্বাস) ও 'কাফির' (অবিশ্বাসী) কে অপমান করার মধ্যে নিহিত। যে কাফিরকে সম্মান দেয় সে মুসলিমকে অমর্যাদা করে। তাদের উপর জিজিয়া আরোপের উদ্দেশ্য হলো, এমন করে তাদেরকে অবমানিত করা যাতে তারা ভাল পোশাক পরতে বা জাঁকজমকের সঙ্গে বাস না করতে পারে। তারা ভীতসন্ত্রস্ত ও কম্পমান থাকে।'

অমুসলিমদের উপর জিজিয়া আরোপ সম্পর্কে একই রকম মনোভাব ছিল সূফী সাধক শাহ ওয়ালিউল্লাহ (মৃত্যু ১৭৬২) ও ভারতে মুসলিম শাসনকালের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ইসলামী পণ্ডিত ও সূফী সাধকদের।[79]

জিম্মিদের প্রতি এরূপ চরম অবমাননাকর আচরণের অর্থ হলো, মুসলিম রাষ্ট্রে তাদের অত্যন্ত হীন আর্থ-রাজনৈতিক অবস্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। হিন্দুদের প্রতি এ চরম অবমাননা ও অমর্যাদাকর আচরণ তাদের উপর ইসলাম গ্রহণের জন্য কী ধরনের মানসিক চাপ সৃষ্টি করেছিল, সেটি অনুধাবন করতে আদৌ কারো কষ্ট হওয়ার কথা নয়। এ সকল অবমাননার সঙ্গে যুক্ত ছিল অতিরিক্ত ও অসহনীয় বৈষম্যমূলক জিজিয়া, খারাজ ও অন্যান্য করের অর্থনৈতিক ভার থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রলোভন। অর্থনৈতিক বোঝার মাত্রায় জিজিয়া ছিল অবমাননার পাশে তুলনামূলক কম গুরুভার। সবচেয়ে গুরুভার ছিল খারাজ বা ভূমিকর। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর শাসনামলে (১২৯৬-১৩১৬) কৃষকরা আক্ষরিক অর্থে সরকারের ক্রীতদাসে পরিণত হয়ে যায়, কারণ এ সময় খারাজ হিসেবে কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ৫০ থেকে ৭৫ শতাংশ সরকার নিয়ে যেতো। এমনকি আকবরের শাসনামলে 'খারাজ' উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর এক-তৃতীয়াংশ নির্ধারিত থাকলেও কাশ্মীরে খারাজ হিসেবে নেয়া হতো দুই-তৃতীয়াংশ। ১৬২৯ সালের দিকে সম্রাট শাহজাহানের আমলে গুজরাটে কৃষকদেরকে তাদের উৎপাদিত ফসলের তিনচতুর্থাংশ সরকারকে দিতে হতো।[80]

আগেই বলা হয়েছে যে, এরূপ অর্থনৈতিক শোষণের পরিণতিতে হিন্দুরা এমন এক অসহনীয় ও ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে পতিত হয় যে, কর আদায়কারীর অমানবিক নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পেতে তারা পালিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। শুধুমাত্র ইসলামের কালেমা –

---

[79]. Ibid, p. 113-14

[80]. Ibid, p. 132, 34

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ঈশ্বর নেই, এবং মুহাম্মদ আল্লাহর বার্তাবাহক' - এ কথাটি উচ্চারণ করেই হিন্দুরা ওসব গুরুভার অর্থনৈতিক বোঝা, কষ্ট ও অবমাননা থেকে মুক্ত হতে পারতো। এবং এরূপ জবরদস্তিমূলক প্রক্রিয়ায় ইসলামে ধর্মান্তরকরণ বেশ সুচারুভাবেই প্রয়োগ হয়েছে ভারতে, যার কিছুটা প্রমাণ মেলে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের (১৩৫১- ৮৮) স্মৃতিকথা 'ফতুয়া- ই- ফিরোজ শাহী'তে:

'আমি আমার অবিশ্বাসী প্রজাদেরকে নবীর ধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত করি। আমি ঘোষণা করি যে, যারা ধর্ম পরিবর্তন করে মুসলমান হবে তারা প্রত্যেকেই জিজিয়া কর থেকে মুক্তি পাবে। সর্বত্র জনগণের মাঝে এ সংবাদ পৌঁছে যায় ও বিপুল সংখ্যক হিন্দু নিজেদেরকে উপস্থাপন করে ইসলামের সম্মানকে স্বীকার করে নেয়। এরূপে তারা দিনের পর দিন সর্বত্র থেকে এগিয়ে আসে ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জিজিয়া থেকে মুক্ত হয়, এবং উপহার ও সম্মানের দ্বারা আনুকূল্য পায়।'[৪১]

সুতরাং ইসলামে ধর্মান্তরকরণ ও মুসলিম আক্রমণে বিজিত দেশগুলোতে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে এখন নিশ্চিত করে বলা যায় যে, ধর্মান্তরের প্রথম বড় জোয়ারটি এসেছিল তলোয়ারের মুখে দাস বানানোর মাধ্যমে। তারপরে তাদের সন্তানরা মুসলিম জনসংখ্যাকে উত্তরোত্তর স্ফীত করতে থাকে। সুলতান মাহমুদের মতো মুসলিম হানাদাররা এক একটি শহর দখলে নিয়ে তার নাগরিকদেরকে মৃত্যুর মুখে ইসলামে ধর্মান্তরিত করেন, যা মুসলিম জনসংখ্যা বিস্তারে বিশেষ অবদান রাখে। কোন কোন ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর ও অজেয় মুসলিম বাহিনীর আক্রমণের মুখে আক্রান্ত বাসিন্দারা অনিবার্য মৃত্যু ও ধ্বংসের কথা বিবেচনা করে প্রতিরোধ না করেই নতি স্বীকার করে নেয় এবং জীবন বাঁচানোর তাগিদে অনিচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে নিজেদেরকে যুক্ত করেছে। অবিশ্বাসী প্রজাদেরকে জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরকরণের সম্ভবত আরেকটি বড় অবদান আসে অবমাননাকর 'জিজিয়া', গুরুভার 'খারাজ' ও অন্যান্য বৈষম্যমূলক কর থেকে মুক্ত হওয়ার প্রত্যাশায় ইসলাম গ্রহণের মধ্য দিয়ে।

নির্মম আওরঙ্গজেবের অধীনে ধর্মান্তর

[81]. Elliot & Dawson, Vol. III, p. 386

মুসলিম শাসকরা অবিশ্বাসী বা বিধর্মীদেরকে ইসলামে ধর্মান্তর করতে আরও অনেকরকম অবৈধ প্ররোচনা ও জবরদস্তির আশ্রয় নেয়। ইব্নে আশ্কারী তার 'আল-তারিখ' গ্রন্থে লিখেছেন যে, সম্রাট আওরঙ্গজেব ধর্মান্তরের জন্য অন্যান্য প্রলোভনের মধ্যে তার সাম্রাজ্যে প্রশাসনিক পদ প্রদান, জেল থেকে অপরাধীদের মুক্তি, তাদের পক্ষে মামলার রায় নিষ্পত্তিকরণ ও রাজকীয় সম্মানে ভূষিতকরণের মতো সুবিধাদি প্রদানের প্রস্তাব করেছিলেন।[82] এর ফলে অবশ্যই বহু কুখ্যাত অপরাধী ইসলামে যোগ দিয়েছিল, যে প্রবণতা আজকের যুগেও সক্রিয় রয়েছে: যেমন পশ্চিমা দেশগুলোতে ভয়ঙ্কর অপরাধীরা জেলখানায় ইসলামে ধর্মান্তরিত হচ্ছে।

বর্তমানে উত্তর ভারতের মুসলিম জনসংখ্যার রূপরেখা বর্বর আওরঙ্গজেবের শাসনামলে বল প্রয়োগ ও অন্যান্য জবরদস্তিমূলক চাপের মাধ্যমে ব্যাপকহারে ধর্মান্তরিতকরণের মাধ্যমে সৃষ্ট। 'দ্য গেজেট অব নর্থ-ওয়েস্ট প্রভিন্সেস'-এ (নর্থ-ওয়েস্ট প্রভিন্সেস বা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ বর্তমানের উত্তর প্রদেশ ও দিল্লীর অন্তর্ভুক্ত) উল্লেখ রয়েছে যে: 'অধিকাংশ মুসলিম চাষি আওরঙ্গজেবের শাসনকালকে তাদের (পূর্বপুরুষদের) ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার সময় হিসাবে উল্লেখ করে এবং এ ধর্মান্তর ছিল কখনো নির্যাতন থেকে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে, আবার কখনো রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হয়ে সম্পত্তির অধিকার রক্ষা করতে।' (এ ব্যবস্থা আওরঙ্গজেবের আমলে নিশ্চয়ই সব প্রদেশেই বিস্তৃত হয়ে থাকবে)। ইউরোপীয় দূত নিকোলাও মানুক্সি, যিনি আওরঙ্গজেবের শাসনামলে ভারতবর্ষে কাটান, তিনি উল্লেখ করেন: 'কর প্রদানে অক্ষম অনেক হিন্দু কর-আদায়কারীর অপমানের হাত থেকে রেহাই পেতে মোহাম্মদী হয়ে যেতো', এবং আওরঙ্গজেব এতে উৎফুল্ল বোধ করতেন। সুরাটে ইংরেজ কারখানার প্রেসিডেন্ট টমাস রোল লিখেছেন: আওরঙ্গজেব কর্তৃক জোরপূর্বক জিজিয়া আদায় করা হতো দু'টো উদ্দেশ্যে: রাজকোষ বর্ধিত করতে ও গরীব শ্রেণীকে মুসলিম বানানোর জন্য চাপ প্রয়োগ করতে।[83]

---

[82]. Roy Choudhury ML (1951) *The State and Religion in Mughal India,* Indian Publictity Society, Calcutta, p. 227

[83]. Sharma, p. 219

১৬৬৬ সালের ১৫ ডিসেম্বর আওরঙ্গজেব রাজসভা ও প্রদেশের চাকরী থেকে হিন্দুদের বরখাস্ত এবং তদস্তলে মুসলিমদের নিয়োজিত করার জন্য এক আদেশ জারি করেন।[84] জীবনধারণের তাগিদে এটা হিন্দুদের উপর ইসলাম গ্রহণের জন্য আরেকটি প্রবল চাপ প্রয়োগ করে। তিনি হিন্দু জমিদারদেরকে মুসলিম হওয়ার জন্য চাপ দেন, অন্যথায় জমিদারী ছাড়তে হবে, এমনকি মৃত্যুবরণও করতে হতে পারে। মনোহরপুরের জমিদার দেবী চাঁদের জমিদারী কেড়ে নিয়ে তাকে জেলে পাঠানো হয়। আওরঙ্গজেব দেবী চাঁদের কাছে কোতওয়াল (ঘাতক) পাঠায় একথা বলে যে, দেবী চাঁদ মুসলমান হলে তাকে বাঁচিয়ে রাখবে, না হলে হত্যা করবে। দেবী চাঁদ ইসলাম গ্রহণে রাজী হয় তার জমিদারী পুনর্বহালের শর্তে।[85] পিতার জমিদারী থেকে উচ্ছেদকৃত রতন সিং মুসলিম হলে মালওয়ার রামপুরা অঞ্চলের জমিদারী ফেরত পান।[86]
অন্যান্য উদাহরণে মুসলিমরা হিন্দুদের উপর ইসলামকে অপমান করার মিথ্যা অভিযোগ এনে শাস্তিস্বরূপ ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে দেখা যায়। সুরাট পরিষদ ১৬৬৮ সালে ধর্মান্তরের এরূপ কৌশলের উল্লেখ করেছে। যখন কোনো মুসলমান হিন্দু লগ্নীদাতা (বানিয়া)'র ঋণ পরিশোধ করতে চাইতো না, তখন সে মুসলমানটি কাজীর (বিচারকের) কাছে গিয়ে নালিশ করতো যে, ঐ লগ্নীদাতা হিন্দু নবীকে গালি- গালাজ বা ইসলামের অবমাননা করেছে। এক্ষেত্রে সে এক বা দুই জন মিথ্যা সাক্ষী উপস্থাপন করতো। আর তারপরই হতভাগ্য হিন্দু বানিয়াকে লিঙ্গচ্ছেদন বা সুন্নত দিয়ে মুসলিম বানানো হতো।[87]
আওরঙ্গজেব ১৬৮৫ সালে তার প্রাদেশিক কর্মচারীদের প্রতি হিন্দুদেরকে মুসলমান হতে উৎসাহিত করার জন্য এক আদেশ জারী করেন। এতে প্রস্তাব দেওয়া হয় যে, যেসব হিন্দু পুরুষ মুসলমান হবে তারা প্রত্যেকে রাজভাণ্ডার থেকে চার রুপী পাবে, আর প্রত্যেক হিন্দু নারী মুসলমান হলে পাবে দুই রুপী।[88] চার রুপী সেসময়ে একজন পুরুষের এক মাসের আয়ের সমান ছিল। যেহেতু ধর্মান্তর হিন্দু বা

---

[84]. Exhibit No. 34, Bikaner Museum Archives, Rajasthan, India; Available at: http://according-to-mughal-records.blogspot.com/
[85]. Exhibit No. 41, Bikaner Museum Archives.
[86]. Sharma, p. 220
[87]. Ibid, p. 219-20
[88]. Bikaner Museum Archives, Exhibit No. 43

অমুসলিমদের কাঁধ থেকে পাহাড়- প্রমাণ জিজিয়া, খারাজ ও অন্যান্য গুরুভার করের বোঝা মুক্ত করা ছাড়াও অবর্ণনীয় নির্যাতন, অবমাননা ও অমর্যাদা থেকে তাদেরকে মুক্তি দিত, সুতরাং এ সামান্য প্রলোভন ধর্মান্তরে এর আর্থিক লাভের তুলনায় আরও বড় প্ররোচনার কাজ করে। এক মুঘল দলিলে আওরঙ্গজেবের আমলে বিথুর- এর ফৌজদার শেখ আব্দুল মোমিনের ১৫০ জন হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করার কথা উল্লিখিত হয়েছে। হিন্দুদেরকে ‘সারোপাস’ (সম্মানের পোশাক) ও নগদ অর্থ প্রদানের প্রস্তাব করে ধর্মান্তরিত করেন তিনি।[89]

কাশ্মীরের হিন্দু পণ্ডিতদেরকে আওরঙ্গজেব বল প্রয়োগে গণহারে ধর্মান্তরিত করেন। উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হিন্দু পণ্ডিতরা সাহায্যের জন্য পাঞ্জাবের শিখ গুরু তেগ বাহাদুর সিং- এর কাছে আসেন। গুরু যখন কাশ্মীরীদেরকে অবৈধভাবে ধর্মান্তর করার বিষয় জানতে সম্রাটের দরবারে আসেন, তখন তাকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়, এবং তাকেও ইসলাম গ্রহণের জন্য সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে নির্যাতন করা হয়। অবশেষে তাকে (দুই শিষ্যসহ) শিরশ্চেদের শিকার হতে হয়। এতে দেখা যায় যে, আওরঙ্গজেবের সময় পর্যন্ত কাশ্মীরী জনগণের একটা তাৎপর্যপূর্ণ অংশ বিধর্মী ছিল। আওরঙ্গজেবের কোপানলে পড়ে ভারতের হিমালয়ের রাণী কাশ্মীর রাজ্যটি ব্যাপকভাবে মুসলিম অধ্যুষিত রাজ্যে পরিণত হয়, যা অত্যন্ত গোঁড়া ধর্মান্ধও বটে। আওরঙ্গজেবের আমলে ভারতের অন্যত্র যেখানে মুসলিম নিয়ন্ত্রণ কার্যকর ছিল, সেখানেও একই নীতি কার্যকর হওয়ার কথা।

কাশ্মীরে বর্বর ধর্মান্তরকরণ

ভারতে হিন্দুদেরকে সহিংস ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ শুধুমাত্র মুসলিম ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল দিল্লীতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভারতের যেসব দূরবর্তী প্রদেশে মুসলিম শাসকরা প্রায়শঃই স্বাধীন থেকেছে, সেখানেও শাসকরা তাদের ধর্মীয় দায়িত্বরূপে প্রজাদের উপর ইসলামী আইন প্রয়োগ করেছে। এক্ষেত্রে কাশ্মীর এক যথার্থ উদাহরণ।

সিকান্দার বুত্‌শিকুনের রাজত্বকালে (১৩৮৯- ১৪১৩) তিনি ও তার প্রধানমন্ত্রী, যিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ থেকে ধর্মান্তরিত মুসলিম,

---

89. Ibid, Exhibit No. 40

যোগসাজশে কাশ্মীরী হিন্দুদের উপর নির্যাতনের অস্ত্র চালান। ফেরিশতা লিখেছেন, সিকান্দার এক আদেশ জারী করেন যা

'কাশ্মীরে মুসলিম ছাড়া অন্য কোন ধর্মাবলম্বীর বসবাস নিষিদ্ধ করে; আদেশটিতে তিনি কোনো মানুষের কপালে কোনো চিহ্ন আঁকা (যেমন হিন্দুরা আঁকে) নিষিদ্ধ করেন এবং পরিশেষে তিনি সমস্ত স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত দেব-দেবীর মূর্তি ভেঙ্গে তা দিয়ে ধাতুর মুদ্রা তৈরি করেন। অনেক হিন্দু ব্রাহ্মণ মুসলিম হওয়া কিংবা দেশত্যাগের পরিবর্তে বিষ খেয়ে জীবন বিসর্জন দেয়। কেউ কেউ জন্মস্থান ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যায়; আর অল্প সংখ্যক হিন্দু মুসলমান হয়ে বিতাড়িত হওয়া থেকে মুক্ত হয়। দেশ থেকে অধিকাংশ হিন্দু পালিয়ে গেলে সিকান্দার কাশ্মীরের সমস্ত মন্দির ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেন। ...কাশ্মীরের সমস্ত মূর্তি ভেঙ্গে ফেলার পর তিনি 'মূর্তি ধ্বংসকারী' উপাধিতে ভূষিত হন।[90]

বিজ্ঞ ও সুশিক্ষিত ফেরিশতার (মৃত্যু ১৬১৪) মতে এটিই ছিল সুলতান সিকান্দারের সবচেয়ে বড় সুকীর্তি।

ফেরিশতা আরও জানান, মূর্তি-ধ্বংসকারী পিতাকে অনুসরণ করে তার পুত্র আমীর খান (বা আলী খান) তার ধর্মান্ধ প্রধানমন্ত্রীর সহযোগে দেশে অবস্থানরত অবশিষ্ট হিন্দুদেরকে কচুকাটা করেন। যেসব ব্রাহ্মণ তখনও দৃঢ়ভাবে হিন্দুধর্ম আঁকড়ে ছিল, তাদের বুকের উপর আমীর খানের নির্যাতনের মই চলে। যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণে অস্বীকার করে, তাদেরকে হত্যা করা হয়। এরপরও যারা অমুসলিম থাকে, তাদেরকে কাশ্মীর রাজ্যের বাইরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।[90] পরে মালিক রাইনা ও কাজী চকের শাসনামলে তরবারীর মুখে হিন্দুদেরকে আবারো ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদেরকে গণহারে হত্যাও করা হয় (নীচে বর্ণিত)। এসব ঐতিহাসিক প্রমাণ নিঃসন্দেহে ভারতের হিন্দু ও অন্যান্য বিধর্মীদের ইসলাম গ্রহণে বল-প্রয়োগের মাত্রা উপলব্ধিতে সহায়ক হবে।

---

[90]. Ferishtah MQHS (1829) *History of the Rise of the Mahomedan Power in India*, translated by John Briggs, D.K. Publishers & Distributors (P) Ltd, New Dheli, Vol. IV (1997 imprint), p. 268

[90]. Ferishtah MQHS (1829) *History of the Rise of the Mahomedan Power in India*, translated by John Briggs, D.K. Publishers & Distributors (P) Ltd, New Dheli, Vol. IV (1997 imprint), p. 268

ধর্মান্তরের বিষয়ে প্রতারণামূলক প্রচারণা

স্বেচ্ছায় ধর্মান্তর

সিংহভাগ আধুনিক মুসলিম ও অমুসলিম পণ্ডিত ও ইতিহাসবিদ মধ্যযুগে ভারত ও অন্যত্র মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপায় সম্পর্কে নানা রকম মিথ্যের ধোঁয়াজাল সৃষ্টি করেছেন। সেটি হলো: বিধর্মী বা অবিশ্বাসীরা ইসলামের মাঝে শান্তি ও ন্যায় বিচারের বার্তা দেখতে পেয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু মধ্যযুগের ইসলামী ইতিহাসবিদ, পর্যটক, হানাদার ও শাসকগণের লেখায় সে যুক্তি একেবারেই ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়। ভারতে মুঘল আমলের ইউরোপীয় পর্যটক ও রাজকর্মচারীদের ইতিহাস পঞ্জীও মুসলিম ইতিহাসবিদদের বক্তব্যের সঙ্গে একমত। ওসব দলিলে তৎকালে মুসলিমদের প্রতি হিন্দুদের ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করা ছাড়া অন্যরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। ইসলামের ঐশীবার্তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিধর্মীদের মুসলিম বনে যাবার সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ নেই। মধ্যযুগে হিন্দুদেরকে মুসলিম বানানোর সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়টি ছিল দানবীয় খারাজ, জিজিয়া ও অন্যান্য গুরুভার করের ভয়ঙ্কর বোঝা এবং অমানবিক নির্যাতনঅপমান থেকে বাঁচার জন্য ধর্মান্তরের প্রলোভন। মুসলিমদেরই সৃষ্ট একটা ঘৃণ্য ও অসহনীয় বাস্তবতাকে পরিহার করার জন্য এরূপ ধর্মান্তর কখনোই শান্তিপূর্ণ ও স্বেচ্ছামূলক বলে আখ্যায়িত হতে পারে না। (ব্যাপক সহিংসতা ও জবরদস্তির আশঙ্কায় কেউ কেউ ধর্মান্তরিত হতে পারে, যদিও তার নজির খুবই কম এবং সেটি প্রকৃত অর্থে মোটেও স্বেচ্ছাকৃত নয়।)

নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের ধর্মান্তর

ভারতের মুসলিমরা জোরগলায় দাবী করে যে, প্রধানত সামাজিকভাবে বঞ্চিত ও নির্যাতিত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলামের সবার জন্য সমতার বার্তায় মুগ্ধ হয়ে বড় সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু মধ্যযুগের ইসলামী ইতিহাসপঞ্জী, যেগুলোতে ধর্মান্তর সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য ও সাক্ষ্য সংরক্ষিত হয়েছে, তাতে কোথাও এমন কোনো প্রমাণ নেই, যা বলে যে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অত্যাচার-নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা দলে দলে ইসলামের

পতাকাতলে আশ্রয় নেয়। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে ধর্মান্তরের মাত্রা উচ্চবর্ণের তুলনায় হয়তোবা বেশী হতে পারে, কিন্তু তা সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। তারা ছিল সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র অংশ; সুতরাং জিজিয়া, খারাজ ও অন্যান্য অসহনীয় করের বোঝা তাদেরকে সবচেয়ে বেশী নিষ্পেষিত করেছিল। এ উপমহাদেশের মুসলিম জনসংখ্যার দিকে একটু গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে, সমাজের সকল স-রেই ধর্মান্তর ঘটেছিল। বাস্তবতঃ ভারতের হিন্দুদের ৭০ শতাংশ এখনো নিম্নবর্ণভুক্ত - যা এ দাবী প্রত্যাখ্যান করে যে, ইসলামের উৎকৃষ্টতর বার্তায় আকৃষ্ট হয়ে তারা বিপুল সংখ্যায় ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছিল।
অন্ধ্র প্রদেশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত সামপ্রতিক এক গবেষণা অনুযায়ী সেখানে আজকের শতকরা ৮৫ ভাগ মুসলিমের আদি পুরুষরা ছিল নিম্নবর্ণের লোক।[92] তার অর্থ দাঁড়ায়: হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে জন্মহার যদি সমান থেকে থাকে, তাহলে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের তুলনায় দুই গুণ নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এখানে বিবেচনা করতে হবে যে, প্রত্যয় জাগানো বা উদ্বুদ্ধকারী প্রচারণার মাধ্যমে বহু নিম্নবর্ণের হিন্দু বৌদ্ধ এবং খ্রীষ্টান ধর্মেও ধর্মান্তরিত হয়েছে। ইসলামের ক্ষেত্রেও যদি সেরূপ ঘটে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে, মধ্যযুগে ইসলামে ধর্মান্তরকালে ভারতের মোট জনসংখ্যায় নিম্নবর্ণের হিন্দুদের হিস্যা আজকের তুলনায় অবশ্যই বেশী ছিল, সম্ভবত শতকরা ৮০ ভাগ। তার অর্থ দাঁড়ায়, নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মাঝে ইসলাম গ্রহণের হার উচ্চবর্ণের হিন্দুদের তুলনায় তেমন বেশী ছিল না। বস্তুত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মাঝে ধর্মান্তরের হার কিছুটা বেশী হওয়ার কারণ হলো, ইসলাম- আরোপিত নানা রকম নিষ্পেষণমূলক করের বোঝা নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরকে সবচেয়ে বেশী নিঃস্ব ও শ্বাসরুদ্ধ করে তুলেছিল।
বাস্তবে যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী, ধরে ইসলামী হানাদার ও শাসকদের অবিরাম অভিযানে যখন তরবারীর মুখে হিন্দুরা ব্যাপকহারে দাসত্বের শৃঙ্খল পরে বাধ্য হয়ে ইসলাম বরণ করে, তখন কে নিম্নবর্ণের আর কে উচ্চবর্ণের এ বৈষম্য চিন্তা করার সময় বা সুযোগ কারো আদৌ ছিল না।

---

[92]. 85% of Muslims in India were SC, backward Hindus: Report, Indian Express, 10 August

ঐতিহাসিকভাবে জনগণের কোন্অংশ বা স্তর ইসলামে ধর্মান্তরিত হচ্ছে, সে ব্যাপারে মুসলিমদের কখনোই কোনো আগ্রহ বা মাথাব্যথা ছিল না। কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা মুসলিম সমাজে প্রচলিত কাহিনী ও শোনা- কথার ভিত্তিতে কিছু ইউরোপীয় পণ্ডিত প্রথম বলেন যে, হিন্দু সমাজের নির্যাতন থেকে মুক্ত হতে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারপর থেকে জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরের অভিযোগে অভিযুক্ত মুসলিম পণ্ডিতরা ভারতে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বিপুল সংখ্যায় শান্তিপূর্ণভাবে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের প্রচারণায় জোর দিতে থাকে। মুর্শিদাবাদ নবাবের দেওয়ান খোন্দকার ফজল- ই- রাব্বী ১৮৯০- এর দশকে দাবী করেন যে, বাংলায় নিম্নবর্ণের হিন্দু, যেমন তাঁতি ও ধোপারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তবে তিনি জোর দিয়ে এটাও বলেন যে, সেসব ধর্মান্তরিতরা মুসলিম জনসংখ্যার খুবই সংখ্যালঘু একটা অংশ ছিল।[93]

উল্লেখ করা জরুরি যে, ভারতে মুসলিম শাসনের গোটা সময়কাল জুড়ে মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ ও বিদ্রোহে বিপুল সংখ্যক নিম্নবর্ণের হিন্দু ও শিখরা অংশগ্রহণ করেছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছে নিম্নবর্ণের হিন্দুরাই। এখানে তার কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হচ্ছে। ক্রীতদাসে পরিণত করে ধর্মান্তরিত ও খোজা করা জনৈক হিন্দু ছিল খসরু খান। তিনি তার মুনিব সুলতান কুতুবুদ্দিন খিলজীকে ১৩২০ সালে হত্যা করে সুলতানের নেতৃস্থানীয় মুসলিম কর্মকর্তাদেরকে নির্মূল করেন। খসরু খানের সহযোগিতায় ছিল গুজরাটের ২০,০০০ 'বেওয়ারী' হিন্দু (কোনো কোনো লেখক 'পারওয়ারী' বলে উল্লেখ করেছেন)।[94] দিল্লীর শাসন ক্ষমতা বা সিংহাসন থেকে ইসলামকে উচ্ছেদ করা ছিল তাদের লক্ষ্য। জিয়াউদ্দিন বারানীর মতে: 'তারা চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে প্রাসাদে মূর্তি পূজার প্রস্তুতি গ্রহণ করে', এবং 'পবিত্র গ্রন্থকে (কুরআনকে) আসন রূপে ব্যবহার করা হয় ও মসজিদের বেদীতে মূর্তি স্থাপন করা হয়।'[95] মধ্যযুগীয় লেখক জিয়াউদ্দিন বারানী, আমীর খসরু ও ইবনে বতুতাও

---

93. Rabbi KF (1895) *The Origins of the Musalmans of Bengal*, Calcutta, p. 113
94. Ferishtah, Vol. I, p. 224
95. Elliot & Dawson, Vol. III, p. 224

নিম্নবর্ণভূক্ত বেওয়ারী হিন্দুদের সাহস ও মালিকদের জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করতে দ্বিধাহীনতার কথা উল্লেখ করেছেন।[96]

এমনকি অপেক্ষাকৃত উদার ও ন্যায়বান শাসক আকবরের বিরুদ্ধেও বিপুল সংখ্যক নিম্নবর্ণের হিন্দু অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল। উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৫৬৮ সালে আকবরের চিতোর আক্রমণে নিম্নবর্ণভূক্ত ৪০, ০০০ কৃষক রাজপুত সেনাদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিল। তারা আকবরের বিরুদ্ধে এমন প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল যে, ক্রুদ্ধ আকবর বন্দীদের প্রতি তার আচরণগত সাধারণ নীতি পরিত্যাগ করে ৩০, ০০০ বন্দী কৃষককে হত্যার আদেশ দেন। একইভাবে আওরঙ্গজেবকে অগ্রাহ্য করে মারাঠা রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী শিবাজীও (মৃত্যু ১৬৮০) ছিলেন নিম্নবর্ণের হিন্দু (দেখুন অধ্যায় ৫; পর্ব: 'মুসলিম রাজত্বকালে হিন্দু শাসকদের সহনশীলতা ও বিনয়') । মারাঠীরা ছিল নিম্নবর্ণের হিন্দু কৃষক, যারা ১৭৬১ সাল পর্যন্ত মুসলিম বিরোধী প্রতিরোধ অব্যাহত রেখেছিল। তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য ভারতীয় মুসলিমদের আবেদনে সাড়া দিয়ে আফগানিস্তান থেকে চলে আসেন আহমদ শাহ আবদালী এবং 'পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধে' আবদালীর হাতে তারা নির্মূল হয়। সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী সব রকমের নিম্নবর্ণীয় হিন্দু - বেওয়ারী, মারাঠী, জাট, খোখার, গণ্ড, ভীল, সাতনামী, রেড্ডী ও অন্যরা - ভারতে ইসলামী আক্রমণ ও কর্তৃত্বের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুসলিম হানাদার ও শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। ফেরিশতার মতে, খোখার (বা গুক্ষুর) কৃষকরা ছিল হিংস্র বর্বর জাতি, যাদের কোনো ধর্ম বা নৈতিকতা ছিল না।[97] তারা সুলতান মোহাম্মদ ঘোরীর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, যেমন মুলতানে। ৭১৩ সালে মোহাম্মদ বিন কাশিম কর্তৃক মুলতান বিজিত হয়। মুলতানে ইসলামের আবির্ভাবের পাঁচশ' বছর পরও খোখার কৃষকরা ইসলামের বার্তায় মুগ্ধ হতে পারেনি, বরং প্রচণ্ড বিদ্বেষে মোহাম্মদ ঘোরীর বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে রুখে দাঁড়িয়েছে। ইবনে আসির লিখেছেন, সুলতান খোখারদেরকে নির্মূল করার জন্য মুলতানে ফিরে এসে তাদেরকে পরাজিত করে তাদের রক্তে রক্ত-গঙ্গা বইয়ে

---

96. Lal KS (1995) *Growth of Scheduled Tribes and Castes in Medieval India*, Aditrya Prakashan, New Delhi, p. 73

97. Ferishtah, Vol. I, p. 104

দেন।[98] যাহোক, খোখাররা অবশেষে ১২০৬ সালে এক যুদ্ধ শিবিরে মোহাম্মদ ঘোরীকে হত্যা করে। ২০ জন খোখার, যারা পূর্বে ঘোরীর আক্রমণে আত্মীয়-স্বজন হারিয়েছিল, আকস্মিক ঝড়ের বেগে সুলতানের শিবিরে প্রবেশ করে ছোরার আঘাতে তাকে পরপারে পাঠায়।[99] ইয়াহিয়া বিন আহমদের তারিখ-ই-মুবারক শাহী' গ্রন্থে এর দুই শত বছরেরও 'বেশী সময় পর (১৪২০/৩০-এর দশক) আমরা এক যশরথ শাইকা খোখারকে পাই, যে মুসলিম শাসকদের সবচেয়ে বড় বিধর্মী শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বস' ত অনেক সময় উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই মুসলিম পক্ষে যুদ্ধ করেছে আর নিম্নবর্ণের হিন্দুরা তুলে ধরেছে বিদ্রোহের ধ্বজা। উদাহরণস্বরূপ, আওরঙ্গজেব তার রাজধানী দক্ষিণে স্থানান্তরিত করার পর উত্তর ভারতে জাট কৃষকরা বিদ্রোহ করে। তারা বাণিজ্যবহর ও দক্ষিণের রাজদরবারে প্রেরিত রাজস্ব ও সরবরাহ বহনকারী কাফেলা আক্রমণ শুরু করে। আওরঙ্গজেব জাট বিদ্রোহীদেরকে নির্মূল করতে উচ্চবর্ণের রাজপুত ও মুসলিমদের নিয়ে গঠিত এক রাজকীয় বাহিনী প্রেরণ করেন। দীর্ঘ অবরোধের পর ১৬৯০ সালের জানুয়ারি মাসে রাজস্থানের সিনসানিতে জাট বিদ্রোহীদের দুর্গের পতন ঘটে। এ যুদ্ধে উভয় পক্ষেই ব্যাপক হতাহত ও জীবনহানি ঘটে। ১, ৫০০ জাট জীবন হারায় এবং রাজকীয় বাহিনীর ২০০ মুঘল ও ৭০০ রাজপুত যোদ্ধা হয় নিহত বা আহত হয়।[100] সুতরাং উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের অত্যাচার-নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তি পেতে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের উৎফুল্ল চিত্তে ইসলাম গ্রহণ করার দাবী সর্বৈব ভিত্তিহীন।

বৌদ্ধদের সবচেয়ে ব্যাপকহারে ইসলাম গ্রহণ: বৌদ্ধরাই সবচেয়ে ব্যাপকহারে ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। ভারতে মুসলিম আক্রমণের সময় বৌদ্ধরা উত্তর-পশ্চিম (বর্তমান পাকিস্তান, আফগানিস্তান প্রভৃতি) ও পূর্ব ভারতে (অর্থাৎ বেঙ্গল ইত্যাদি) জনসংখ্যার গুরুত্বপূর্ণ, সম্ভবত সংখ্যাগরিষ্ঠ, অংশ ছিল। অথচ ইসলামের আগমণ উভয় অঞ্চল থেকেই বৌদ্ধধর্ম প্রায় নিশ্চিহ্ন করেছে। মুসলিম শাসনামলে এক বাংলাতেই কমপক্ষে শতকরা ৬০ ভাগ মানুষ ইসলামে ধর্মান্তরিত

---

98. Elliot & Dawson, Vol. II, p. 297-98
99. Ibid, p. 233-36; Ferishtah, Vol. I, p. 105
100. Lal (1995), p. 90

হয়েছিল। আর ইসলাম- পূর্ব বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে থাকা ৪০ শতাংশের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বৌদ্ধ নয়, বরং ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হিন্দু এবং তাদের অধিকাংশই নিম্নবর্ণের। বৌদ্ধদের মধ্যে কোন রকম বর্ণবাদ বা শ্রেণীবিভেদ নেই। এবং এটা নিঃসন্দেহে ইসলামের চেয়ে অধিক সমতাবাদী ও শান্তিপূর্ণ ধর্ম। তাহলে তাদেরকে কোন জিনিসটি উদ্বুদ্ধ করেছিল ইসলামে ধর্মান্তরিত হতে? আর উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের দ্বারা তথাকথিত নিগৃহীত ও নির্যাতিত এসব অঞ্চলের ব্যাপক সংখ্যক নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরকে ইসলাম আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হলো কেন?

সূফীদের দ্বারা শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মান্তরকরণ

ইসলামে ধর্মান্তর সম্পর্কিত আরেকটি অবাস্তব দাবী চিরস্থায়ী হয়ে রয়েছে। সেটি হলো, সূফী (পীর- দরবেশ) হিসেবে পরিচিত ইসলামের ভ্রষ্ট মতবাদী একটি সম্প্রদায় শান্তিপূর্ণ প্রচার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইসলামের বিস্তার ঘটিয়েছে। ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ টমাস আর্নল্ড (১৮৬৪- ১৯৩০) - যিনি ইউরোপীয়দের মাঝে 'ইসলাম একটি সহিংস ধর্ম' বলে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত ধারণা পরিবর্তনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন - তিনি ১৮৯০ সালে উপরোক্ত প্রচারণা শুরু করেন, যা পরে অসংখ্য মুসলিম ও অমুসলিম ইতিহাসবিদ ও পণ্ডিতরা লুফে নেন। রিচার্ড হার্ডলি কর্তৃক সংক্ষেপিত নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তগুলোর ভিত্তিতে আর্নল্ড সূফী কর্তৃক ইসলামে ধর্মান্তরের বিষয়ে তার সিদ্ধান্তে পৌঁছেন:

১৮৭৮ সালে পাঞ্জাবের মন্টগোমারী জেলার এক সেটেলমেন্ট রিপোর্টে লেফটেনেন্ট এলফিস্টোন উদ্ধৃত করেন: 'এখানে (পাকপাত্তান শহর) প্রসিদ্ধ দরবেশ ও শহীদ বাবা ফরিদের মাজার রয়েছে, যিনি দক্ষিণ পাঞ্জাবের জনগণের বড় একটা অংশকে ইসলামে দীক্ষিত করেন এবং যার অলৌকিকত্ব তাকে ঐ ধর্মের পীর (সূফী দরবেশ)- দের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট স্থান দিয়েছে।' ঝাং জেলার সেটেলমেন্ট রিপোর্টেও শেখ ফরিদ আল- দীন সম্পর্কে একই দাবী করা হয়েছে। ১৮৮১ সালের 'পাঞ্জাব লোক গণনা রিপোর্ট'- এ ইবেস্টোন বাবা ফরিদের সাথে মুলতানের বাবা আল- হকের নাম যুক্ত করেন, যাদের দুজনকে পশ্চিমা সমতল ভূমির লোকেরা সে অঞ্চলের লোকদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করার কৃতিত্ব দেয়। ১৮৮০ সালে কুচের জন্য প্রকাশিত বোম্বাই গেজেটিয়ার বলে কুচের মেমোনরা ইসলামে ধর্মান্তরিত হয় সৈয়দ ইউসুফ আল- দীনের অলৌকিকত্ব দেখে, যিনি ছিলেন সৈয়দ

আবদ আল-কাদের জিলানীর বংশধর। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্যত্র সৈয়দ মোহাম্মদ গেসু দারাজ হিন্দু তাঁতিদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করেন বলা হয়। ১৮৬৮ সালে সংগৃহীত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশের 'আজমগড় সেটেলমেন্ট রিপোর্ট' ঐ জেলার মুসলিম জমিদারদের মধ্যে একটা প্রচলিত ধারণা উল্লেখ করে যে, তাদের পূর্বপুরুষদের ইসলামে ধর্মান্তরে এক মুসলিম দরবেশের শিক্ষা দায়ী ছিল। বাদাউনে শেখ জামাল আল-দীন তাবরিজী (যিনি পরে বাংলায় গমন করেন) সম্পর্কে বলা হয় যে এক হিন্দু গোয়ালার দিকে এক নজর তাকিয়েই তিনি তাকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। এসব ও অন্য টুকিটাকি তথ্য থেকে আর্নল্ড তার সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বিপুল সংখ্যক ভারতীয় মুসলিম এমনসব ধর্মান্তরিতদের বংশধর যাদের ধর্মান্তরকরণে বাহুশক্তি কোনো ভূমিকা রাখেনি, বরং কেবলমাত্র মিশনারিদের শিক্ষা ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে ধর্মপ্রচার কাজ করেছে।[101]

ইসলামে ধর্মান্তরের ক্ষেত্রে সূফী সাধকদের শান্তিপূর্ণ ধর্মান্তর প্রক্রিয়া প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল - এ সিদ্ধানে- উপনীত হতে আর্নল্ড যে প্রধান নজীরগুলো উপস্থাপন করেছেন, সেগুলো ১৮৮৪ সালের বোম্বাই গেজেটিয়ারে বর্ণীয় নজীর হিসেবে উদ্ধৃত হয়েছিল, যাতে বলা হয়েছে: সূফী সাধক মা'বারি খান্দায়াত (পীর মা'বারি) ১৩০৫ সালের দিকে দাক্ষিণাত্যে আসেন ধর্ম প্রচারক হিসেবে ও বিপুল সংখ্যক জৈনকে ইসলামে দীক্ষিত করেন।[102] এ দলিলে পীর মা'বারী ধর্মান্তরের কাজে কী উপায় প্রয়োগ করেছিলেন সে বিষয়ে বিশেষ কিছুই উল্লেখ করা হয় নি। উপরোল্লিখিত অন্যান্য দাবীর ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে (এসব দাবী অনেকটা মূলত অপ্রমাণিত ও রূপকথার মতো)।

যাহোক, পীর মা'বারী সম্বন্ধে মুসলিম লেখকদের প্রাচীন দলিলের উপর ইতিহাসবিদ রিচার্ড ইটন বিষদ গবেষণা করেছেন, যাতে পীর মা'বারী বিধর্মীদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তার সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। ইব্রাহীম জুবাইরী-র 'রাইজাত-উল-আউলিয়া (১৮২৫-২৬)' গ্রন্থ অনুযায়ী, পীর

---

101. Hardy P (1979) Modern European and Muslim Explanations of Conversion to Islam in Sourth Asia: A preliminary survey, In N. Levtzion ed., p. 85

102. Arnold, p. 271

মা'বারী খান্দায়াত দাক্ষিণাত্যে এসেছিলেন এক ধর্মযোদ্ধা বা জিহাদী রূপে:

দিল্লীর বাদশাহ আলা আল- দীন খালাজী (আলাউদ্দিন খিলজি, মৃত্যু ১৩১৬)'র শাসনামলে তিনি (পীর মা'বারি) ৭১০ হিজ্‌রী সালে (১৩১০ খ্রী:) ইসলামের বাহিনীর সঙ্গে দক্ষিণে আসেন, যখন সোনা ও রূপার গুপ্ত ভাণ্ডার মুসলিমদের হস- গত হয় এবং ইসলামের বিজয় ঘোষিত হয়।[103]

এক সাধুর জীবনপঞ্জীতে বলা হয়েছে:

পীর মা'বারী এখানে আসেন এবং রাজা ও বিদ্রোহীদের (বিজাপুরের) বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেন। এবং তার লৌহদণ্ডের দ্বারা অনেক রাজার মস্তক ও ধড় ভেঙ্গে তাদেরকে পরাজয়ের ধুলায় লুণ্ঠিত করেন। বহু মূর্তিপূজক, যারা ঈশ্বরের ইচ্ছায় পথনির্দেশ ও অনুকম্পা পায়, তারা তাদের অবিশ্বাস ও ভুল পথের জন্য অনুশোচিত হয় এবং পীর মা'বারীর মাধ্যমে ইসলামে আসে।[104]

অপর এক সূত্রে বলা হয়েছে যে, পীর মা'বারী একদল ব্রাহ্মণকে বিজাপুরে তাদের গ্রাম থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। মুসলিম লেখকরা পীর মা'বারীকে লৌহদণ্ড বা লোহার গদা হাতে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে এক ভয়ঙ্কর জিহাদী যোদ্ধা বলে চিত্রিত করেছেন। এ কারণে তাকে খান্দায়াত বলা হয়, যার অর্থ 'ভোঁতা দণ্ড।

ইসলাম যে সূফী সাধকদের দ্বারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিস্তার লাভ করেছিল - এ দাবীর এক প্রভাবশালী প্রচারক হলেন ডঃ ইটন। তিনি বলেন যে, যেসব স্থানে মুসলিম শক্তি পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়, সেসব স্থানে ইসলাম এসেছিল 'বেনামা ভ্রমণশীল পুণ্যবান সাধকদের দ্বারা, যাদের কোন অলৌকিক ক্ষমতার সাথে স্থানীয় জনগণ যুক্ত হতে পারতো।' ইটন অতঃপর বাংলায় প্রচলিত একটি জনপ্রিয় মুসলিম কাহিনীর অবতারণা করেছেন এভাবে: এক মুসলিম পীর তার ঐশ্বরিক বা ইন্দ্রিয়াতীত ক্ষমতা নিয়ে এক গ্রামে এসে তথায় একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন; তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার বলে রোগীর রোগ নিরাময় করেন; তার সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে; তাকে দর্শনের জন্য হাজার হাজার মানুষ ঐ গ্রামে হাজির হয় 'চাল, ফলমুল ও অন্যান্য উপাদেয় খাবার,

---

103. Eaton RM (1978) *Sufis of Bijapur 1300-1700*, Princeton University Press, p. 28

104. Ibid, p. 30

ছাগল, মুরগি, কবুতর’ প্রভৃতি উৎসর্গ- বস্তু নিয়ে, যা তিনি কখনো না ছুঁয়ে গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দেন। ইটন বলেন, সূফীদের এরূপ মানবীয় গুণাবলী তাদের মসজিদগুলোকে ইসলামের কেন্দ্ররূপে গড়ে তুলে ও সেখান থেকে ইসলাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।[105]

ইটন সম্পর্কে কৌতূহলের বিষয় হলো যে, তিনি তার পিএইচ.ডি. থিসিসের জন্য ভারতীয় সূফীদের উপর রচিত মধ্যযুগীয় সাহিত্যের উপর নিজস্ব গবেষণা, যা তিনি ‘সূফীস অব বিজাপুর ১৩০০- ১৭০০’ গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন, তাতে তিনি সূফীদের মতামত ও কার্যকলাপ কিংবা তাদের ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়ায় শান্তির কোনো রকম চিহ্ন দেখাতে ব্যর্থ হন। তার গবেষণায় বিজাপুরে আগত সমস্ত সূফী, বিশেষত প্রথম যুগের সূফীরা, ভয়ানক জিহাদী ও হিন্দুদের উপর নির্যাতনকারী রূপে প্রতীয়মান হয়; ইতিমধ্যে উদ্ধৃত পীর মা’বারী তাদের মধ্যে একজন। ইটনের গবেষণার ফলাফল সূফীদের প্রতি তার নিজস্ব ভালবাসা- ঘেঁষা উদ্দেশ্যমূলক মতামতের এতটাই বিরূপ যে, ভারতের মুসলমানরা বিজাপুরের সূফীদের উপর লিখিত তার বইটির বিরুদ্ধে কড়া প্রতিবাদ করলে ভারতে বইটি নিষিদ্ধ করা হয়। তবুও সূফীদের ব্যাপারে তার অপ্রতিষ্ঠিত ও ভ্রান্ত মতামত প্রচারণা তিনি বন্ধ করবেন না।

যুক্তি- সম্পন্ন মানুষের কাছে সূফীদের তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতার কাহিনী কেবলমাত্র কাল্পনিক অতিকথা ছাড়া কিছুই নয়। অধ্যাপক মুহাম্মদ হাবিবের মতে, এসব কল্পকথা পরবর্তীতে যথাযথ গবেষণায় মিথ্যা উদ্ভাবন হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে (নিচে দেখুন)। বিধর্মীদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরকরণে সূফীদের শান্তিপূর্ণ প্রয়াস যে ব্যাপক অবদান রেখেছিল, এমন দাবীর পক্ষে কোনো ঐতিহাসিক বা অবস্থানগত সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। ভারতে কোনো ঐতিহাসিক দলিলে উল্লেখ নেই যে, সূফীরা ‘শান্তিপূর্ণ উপায়ে’ বিপুল সংখ্যক বিধর্মীকে ইসলামে দীক্ষিত করেছিল। সুবিখ্যাত উদারনীতিক সূফী পণ্ডিত আমীর খসরু (চতুর্দশ শতক) তার লেখায় মুসলিম শাসকদের দ্বারা বিপুল সংখ্যক অবিশ্বাসীকে দাসত্বের শিকলে বেঁধে ধর্মান্তরকরণের বহু ঘটনা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোথাও তিনি সূফী সাধকদের দ্বারা শান্তিপূর্ণ প্রচারণার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হিন্দুকে ইসলামে ধর্মান্তরের একটি ঘটনার

---

[105]. Eaton RM (2000) *Essays on Islam and Indian History*, Oxford University Press, New Delhi, p. 32

কথাও উল্লেখ করেন নি। এখানে ভারতীয় সূফীদের আদর্শ ও অবিশ্বাসীদেরকে ধর্মান্তরকরণে তাদের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হবে।

সূফীবাদের উৎস

আল্লাহ জিহাদকে মুসলিমদের জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য করেছেন, যার জন্য তারা যুদ্ধ করতে থাকবে যতদিন না সমগ্র পৃথিবীতে মানব জীবনের সর্বজনীন ও সর্বোৎকৃষ্ট দিক-নির্দেশক ইসলাম একমাত্র ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে (কুরআন ২:১৯৩, ৮:৩৯)। আল্লাহ বিশ্বাসীদের জীবন কিনে নিয়েছেন; স্বর্গলাভের জন্য তারা কেবলমাত্র নিজেদেরকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করতঃ জিহাদে শরিক হয়ে হত্যা করবে বা নিহত হবে (কুরআন ৯:১১১)। যারা জিহাদে প্রাণ হারাবে আল্লাহ তাদেরকে স্বর্গসুখে সুখী করবেন শহীদ হিসেবে সরাসরি স্বর্গে অবতরণের সুযোগ দিয়ে। সুতরাং আল্লাহ বলেন: 'আল্লাহর পথে যারা নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা 'মৃত' বলো না। না, তারা বেঁচে আছে, যদিও তোমরা সেটি অনুধাবন করতে পারছো না' (কুরআন ২:১৫৪)। আল্লাহ মুসলিমদেরকে একান্তভাবে তাঁর পথে সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করতে তাদেরকে পিতা-পুত্র, স্ত্রী-ভ্রাতা ও গোত্রের লোকদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং ইহলৌকিক আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দের প্রলোভন ত্যাগ করতে উৎসাহিত করেছেন (কুরআন ৯:২৪)। নবী মুহাম্মদ তাঁর নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠাকালে আল্লাহর এসব নির্দেশ মোতাবেক কাজ করেন। পৃথিবীতে ইসলামকে একমাত্র ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর অনুসারীরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে নামাজ, রোজা ও বিশেষত জিহাদে তাদের জীবন উৎসর্গ করে। মদীনায় - যেখানে প্রথম আল্লাহ কর্তৃক জিহাদের মতবাদ প্রদর্শিত হয় - পুনর্বাসিত হবার পর নবী ও তাঁর ভক্তরা বিধর্মীদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ও সহিংস জিহাদে লিপ্ত হয়ে লুণ্ঠনমূলক অভিযান ও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, যার উদ্দেশ্য ও প্রতিফল ছিল ইসলামের বিস্তার ও নব্য জয়মান ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, এবং মূলতঃ লুণ্ঠিত মালামালের উপর নির্ভর করে জীবনযাপন। জিহাদে নিহতরা শহীদত্ব পাবে (কুরআন ২:১৫৪) - আল্লাহর এই রায় স্বর্গলাভের জন্য সবচেয়ে নিশ্চিত উপায় হিসেবে নির্ণিত হয়, যেটা মুসলিমদের পার্থিব জীবনের প্রতিটি কাজের মূল লক্ষ্য। সুতরাং সেসব পবিত্র যুদ্ধে যারা মারা গেছেন, তারা মহাসৌভাগ্যবান ছিলেন: অর্থাৎ

শহীদ হয়ে ইসলামের স্বর্গে গমনের জন্য তারা 'সরাসরি টিকিট' পেয়ে যায়।

ইসলামের প্রারম্ভিক বছর ও দশকগুলোতে শহীদ বরণের অনুপ্রেরণায় বিপুল সংখ্যক নতুন ভক্ত জিহাদী কার্যক্রমে নিয়োজিত হয়। ইসলামের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্বর্গে (বেহেস্তে) নিজস্ব স্থান নিশ্চিত করতে - যেখানে স্ফীত স্তনের কৃষ্ণনয়না পরমা সুন্দরী ও সদা-কুমারী হুরীদের নিয়ে অনুগ্রহ প্রাপ্তরা যৌনতৃপ্তি মেটাতে পারবে (কুরআন ৪৪:৫১, ৭৮:৩১-৩৩) - শহীদত্ব লাভের জন্য এসব জিহাদীরা একান্তভাবে আল্লাহর রাহে জীবন দিতে নিজস্ব জ্ঞাতি ও সামাজিক বন্ধন এবং ইহলৌকিক কামনা-বাসনা ত্যাগ করে। সামাজিক বন্ধন ও মেলামেশা থেকে মুক্ত এবং সদা উপাসনায় ও বিশেষত শহীদের দরজা লাভের আশায় জিহাদে যোগদানের সুযোগ সন্ধানে মগ্ন তাদের জীবনধারা কিছুটা তপস্যামূলক হয়ে উঠে। মোটামুটি এটাই ছিল প্রাথমিক যুগে ইসলামের জীবন্তদর্শন, যা নবী মুহাম্মদ আল্লাহর অনুমোদনে তাঁর ধার্মিক শিষ্যদের মনে প্রবিষ্ট করে যান।

ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে, বিশেষত নবীর জীবদ্দশায়, যুদ্ধ করার মতো বয়সী ও স্বাস্থ্যবান সকল মুসলিম পুরুষকে জিহাদী অভিযানে অংশগ্রহণ করতে হতো। ইসলামী রাষ্ট্র দ্রুত বিস্তৃতি লাভ ও সুসংগঠিত হলে, রাষ্ট্র নিয়মিত বাহিনীরূপে জিহাদীদেরকে নিযুক্ত করে তাদেরকে রাষ্ট্রের বেতনভুক্ত কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসে। এর বাইরে অন্য মুসলিমরা তখনও স্বর্গলাভের জন্য শহীদত্বের গৌরব অর্জনে জিহাদী প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে স্বেচ্ছাসেবক জিহাদী হিসেবে আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করে। এসব স্বেচ্ছাসেবক জিহাদীদেরকে 'আগ্রহী বা অভিযানকারী' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যখন অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সুযোগ আসতো, তখন তারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তো। তাদেরকেও পারিশ্রমিক দেওয়া হতো, কিন্তু রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে নয়, জাকাতের তহবিল থেকে, যা ব্যয় করা হত শুধুমাত্র ধর্মীয় উদ্দেশ্যে। তারা এসব পবিত্র যুদ্ধে লুণ্ঠিত দ্রব্যসামগ্রীর (মালে গণিমত) একটা অংশ পেত, যা তাদের জীবনাধারণের পাথেয় হয়ে দাঁড়ায়।

মুহাম্মদ বিন কাসিম যখন ৬,০০০ আবর যোদ্ধা নিয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতে জিহাদী অভিযানের নতুন সীমান্ত খোলেন, তখন মুসলিম ভূখণ্ডগুলো থেকে বিপুল সংখ্যক এরূপ আগ্রহী অভিযানকারী লুণ্ঠিত

মালামালের আশায় এবং ইসলামের প্রসারে আকৃষ্ট হয়ে স্রোতের মতো এসে কাসিমের বাহিনীকে স্ফীত করে তোলে।[106] ধার্মিক মুসলিমদের মাঝে তখন শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এতই প্রবল ছিল যে, তারা জিহাদী যুদ্ধে যোগ দিতে শত শত মাইল পথ পাড়ি দিতেও ইচ্ছুক ছিল। ড্যানিয়েল পাইপ্স জানান: 'এ কারণেই ৯৬৫ সালে বাইজেন্টিয়ানের বিরুদ্ধে জিহাদের সুযোগ গ্রহণ করতে প্রায় ২০, ০০০ 'সেচ্ছাসেবক' ইরান থেকে সিরিয়া পর্যন্ত ১, ০০০ মাইল পথ পাড়ি দিয়েছিল।' বলকান অঞ্চলে খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশ নিতে তুর্কীর অটোমান হানাদাররা দূর-দূরান্তের মুসলিম দেশ থেকে হাজার হাজার যোদ্ধা আকৃষ্ট করে।[107]

প্রাথমিক জোয়ারের পর জিহাদ অভিযান ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে ও কদাচিৎ ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। 'গাজী' বলে আখ্যায়িত জীবিত থাকা স্বেচ্ছাসেবক জিহাদীরা, যারা আল্লাহর প্রতি নিবেদিত প্রাণ ও তাপস জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল, তারা 'রিবাত' (চৌকি) হিসেবে পরিচিত সীমান্তের দুর্গ বা সুরক্ষিত রেখায় বসবাস করতে থাকে। তারা আশা করে থাকতো যে সীমান্তের বাইরে কোনও এক সময় বিধর্মী ভূখণ্ডের বিরুদ্ধে শহীদ-বরণের সুযোগ সৃষ্টিকারী জিহাদের সুযোগ আসবে। শহীদ-বরণে উদ্বুদ্ধ নতুন স্বেচ্ছাসেবক জিহাদীরাও গাজীদের এরূপ আলস্য জীবনে আকৃষ্ট হয়ে যোগ দিতে থাকে। তারা চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত স্পেনের আন্দালুসিয়ায় সীমান্ত বরাবর রিবাতসহ বহাল থাকে।[108] এসব গাজীরা 'মুরাবিত' নামেও পরিচিত ছিল, যার মোটামুটি অর্থ 'পাহাড়ী সীমান্তের মানুষ'। জিহাদের আহ্বানে সাড়া দিতে কোনো কোনো সময় তারা সেসব নির্জন রিবাতে দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করতো। সমাজ ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন এবং কদাচিৎ জিহাদের সুযোগ পাওয়া এসব মানুষ নিঃসঙ্গ, বলা চলে, কিছুটা সন্ন্যাসী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তাদের কারো কারো জীবন হয়ে পড়ে অলস, দীর্ঘকাল অকেজো বসে থাকায় অভ্যস্ত ও অহিংস।

পার্থিব ভোগ-লালসা ত্যাগী আল্লাহর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ তাদের জীবনাচরণ ক্রমান্বয়ে ইন্দ্রিয় লালসাবর্জিত অথচ অহিংস হয়ে উঠে,

---

106. Elliot & Dawson, Vol. I, p. 435
107. Pipes (1983), p. 69
108. Gibb, p. 33

ঠিক যেন বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের মত। এক সময় সীমান্তের নির্জন বা গুহাবাসী জিহাদীদের আশ্রয়স্থল বা রিবাতগুলো ধ্যান বা তপস্যার 'আশ্রম' হয়ে উঠে। স্যার হ্যামিল্টন গীব্স লিখেছেন: 'এ রিবাতগুলোই ইসলামে ধ্যান বা তপস্যা ও আধ্যাত্মিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয় (অর্থাৎ সূফীবাদ)। পরে জিহাদকে সকল ইহলৌকিক বা পার্থিব প্রলোভনের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ বা আধ্যাত্মিক সংগ্রামরূপে ব্যাখ্যা করা হয়।'[109]

এসব রিবাতের ভেতর থেকে কেউ কেউ শান্ত ও অহিংস জীবনদর্শনের শিক্ষা দিতে শুরু করে, যাতে তারা ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তারা সমাজ থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নিতে এবং জাঁকজমক ও বিলাসী জীবন পরিহার করার প্রচারণা শুরু করে। উমর উদ্দিন লিখেছেন: 'তাদের লক্ষ্য ছিল আত্মাকে আবিষ্টকারী ও উন্নতিতে বাঁধাদানকারী প্রত্যেক ভোগ- লালসা পরিহার করে চলা।'[110] এসব শান্ত মতবাদীরা 'সূফী' সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত হয় ও তারা যুদ্ধবিগ্রহ থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নেয়। এ সময় রিবাতগুলো পরিণত হয় সন্ন্যাসী আশ্রম, মঠ বা ধর্মশালায়, যেখানে নিবেদিতপ্রাণ সন্ন্যাসীরা ধর্মীয় জীবনে সমাবিষ্ট হয়।[111] বেঞ্জামিন ওয়াকারের মতে:

সন্ন্যাসের নীতিতে অনেক সূফী ধারা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিশিষ্ট সূফীরা দারিদ্র্য, 'ফকির' বা ভিক্ষুক ও দরবেশী জীবনধারার স্তুতিতে লেখালেখি করেন। খুব অল্প সংখ্যক সূফী ইহলৌকিক আনন্দ, যেমন ধনসম্পদ, খ্যাতি, ভোজ, নারী সম্ভোগ ও সঙ্গী- সাথী পরিত্যাগ করে নিদারুণ দারিদ্র্য, নাম- নিশানাহীনতা, ক্ষুধা, চিরকুমারত্ব ও নিঃসঙ্গ জীবন গ্রহণ করে; এমনকি তারা তাদের আধ্যাত্মিকতাকে আরো শক্তিশালী করতে গালিগালাজ ও ঠাট্টা- বিদ্রূপে উদাসীন থাকার মাধ্যমে দুর্ব্যবহার ও অসম্মানকে স্বাগত জানায়।[112]

সুতরাং সূফীবাদের পূর্বসূরী বা ভিত্তি জঙ্গী ইসলামী ধর্মান্ধতা বা গোঁড়ামির মধ্যে প্রোথিত। উমর উদ্দিন উল্লেখ করেছেন: সূফীবাদের উদ্ভব হয়েছিল 'দার্শনিক ও যুক্তিবাদীদের বুদ্ধিমত্তাবাদ এবং

---

[109]. Ibid
[110]. Umaruddin, p. 61
[111]. Gibb, p. 33-34
[112]. Walker, p. 305

শাসকশ্রেণীর ঈশ্বরহীন চালচলনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে।'[113] আব্বাসীয় শাসকরা তখন আরব বা ইসলামী সংস্কৃতিকে ঠেলে পিছনে ফেলে দেয় এবং ইসলাম- পূর্ব পারস্য সভ্যতার 'জাহিলিয়া' আচার-আচরণ (যা ইসলাম কর্তৃক অতিক্রান্ত) প্রবর্তন করেছিল, যা নৈতিক শিথিলতা উৎসাহিত করে। অপরদিকে দার্শনিকরা ছিল 'প্লেটো ও এরিস্টোটলের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী', নবীদের উপর নয়। উমর উদ্দিন আরো বলেন, এ প্রবণতার বিরোধিতা করার জন্যই 'সূফীবাদের উদ্ভব এবং কুরআন ও নবী বা তাঁর সাহাবাদের জীবন হলো এর আচরণবিধির ভিত্তি।'

উমর উদ্দিনের মতে, 'অগ্রগতির প্রাথমিক স্তরে সূফীবাদ ইসলাম (অর্থাৎ গোঁড়া ইসলাম) থেকে খুব বেশী পৃথক ছিল না। তাদের মতবাদে ইসলামের কিছু সত্যের উপর বেশী জোর ছিল', [114] অন্যগুলোর উপর ছিল কম নজর। পরে কিছু কিছু সূফী ধারা নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়ে পড়ে এবং গোড়া বা মৌলবাদী ইসলামের কট্টর আচারনিষ্ঠা - যা আত্মার আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তা মেটাতে অক্ষম নিতান্তই বাহ্যিক আচার- আনুষ্ঠানিকতায় রূপান্তরিত হয়ে উঠেছিল - তার বিরোধী হয়ে উঠে। অর্থাৎ তারা ইসলামের মূল গোঁড়া পথ থেকে বিচ্যুত হয় ও শরীয়া বিধিবিধানের বাহ্যিক আচারকে 'ব্যক্তির আধ্যাত্মিক বিবর্তনের সর্বনিম্ন মাত্রা হিসেবে বিবেচনা করে। একজন সূফীর জীবন ও শিক্ষা এভাবে পরিকল্পিত যে, অগ্রগতির বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে গমনকালে ক্রমান্বয়ে (শরীয়া) আইনের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি বা স্বাধীনতা, গোঁড়ামি থেকে জ্যোতিতে বা আলোয়, ও আল্লাহর দিকে অভিযাত্রায় আত্মজ্ঞান থেকে স্রষ্টায় আত্মবিলুপ্তি (ফানা) অর্জন করবে।'[115] ধীরে ধীরে সূফী মতবাদে অসংখ্য পরিবর্তনের দরজা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে, যার কিছু কিছু মূল ইসলামের রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাহীন বা বিরোধী ও ভঙ্গকারী হয়ে দাঁড়ায়। এক পর্যায়ে কিছু পথভ্রষ্ট সূফী অনইসলামিক সর্বেশ্বরবাদে পৌঁছে, যা সৃষ্টিকর্তার সাথে ব্যক্তি ও সমগ্র সৃষ্টিকে একটা একক সত্তায় ঐক্যবদ্ধ করে। আত্মমগ্নতা, আত্মলোপ ও আত্মধ্বংস ঘোষণাকারী সর্বেশ্বরবাদ, যা ব্যক্তিকে

---

[113]. Umaruddin, p. 58-59
[114]. Ibid, p. 62
[115]. Walker, p. 304

ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের দিকে নিয়ে যায়, সেটি ইসলামের মূল ধারণায় একটা অপবিত্র মতবাদ। অগ্রগতির এ স্তরে তাদের কোনো পথ-নির্দেশক (অর্থাৎ নবী) অথবা আইন গ্রন্থের (অর্থাৎ কুরআন) প্রয়োজন পড়ে না। তারা শরীয়া আইনের প্রয়োজনীয় প্রায় সব আচার-আনুষ্ঠানিকতা - যেমন রোজা, নামাজ, হজ্ব, জাকাত প্রভৃতি - পরিত্যাগ করে। ইসলামী সমাজে তারা 'বেশরীয়া' অর্থাৎ শরীয়া বা ইসলাম বহির্ভূত বলে পরিচিতি পায়।

ইমাম গাজ্জালী (মৃত্যু ১১১১) মূলধারার ইসলামী সমাজে সূফীবাদকে গ্রহণীয় করে তুলেছিলেন। সূফীদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন:

সূফীরা নবীর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমকক্ষ হতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। প্রতি বছর কোনো একটা সময়ের জন্য হিরা পর্বতের গুহায় নবীর ধ্যানমগ্ন হওয়ার দৃষ্টান্ত সূফীদেরকে সমাজ থেকে অবসর গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। নবীর নামাজে আত্মবিলুপ্তির অভ্যাসের ভিত্তিতে সূফীরা উন্মত্ত ও আত্মবিলয়ের প্রথা সৃষ্টি করে। সূফীদের জীবনে সন্ন্যাস বা তপশ্চর্যার রীতি নবীর জীবনের অত্যন্ত সহজ- সরলতার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট... নবী নিজে তাঁর পোশাক- পরিচ্ছদ ধৌত করতেন, জুতা মেরামত করতেন, ছাগল দুয়াতেন এবং কখনই আকণ্ঠ ভোজন করেন নি।[116]

ভারতীয় সূফীগণ

কিছু কিছু সূফী সম্পূর্ণরূপে ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুত হলেও অধিকাংশই গোঁড়া বা মূলপন্থী থেকে যায়। দ্বাদশ শতকে গাজ্জালী মুসলিম সমাজে সূফীবাদের বিজয় ঘটাতে সক্ষম হন। তিনি মূলত ভ্রষ্ট ধারণা ও আচারসমূহকে অপসারিত করে সূফীবাদের দেহে ইসলামী গোঁড়ামিকেই বুনে দিয়েছিলেন, যার ফলে সূফীবাদ মুসলিমদের মাঝে গ্রহণযোগ্যতা পায়। সুতরাং ইমাম গাজ্জালীর কারণে সূফীবাদের গোঁড়া অংশটাই মুসলিম সমাজে স্বীকৃতি পেয়েছিল। পথভ্রষ্ট বেশরীয়া সূফীদেরকে নানা নির্যাতন ভোগ, এমনকি মৃত্যুবরণও করতে হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, উগ্র গোড়া ইসলামী শাসক সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক (মৃত্যু ১৩৮৮) তার স্মৃতিগ্রন্থে লিখেছেন যে, 'তিনি দিল্লীর শেখ রুকনউদ্দিনকে আটক করেছিলেন, যিনি নিজেকে মাহদী

---

[116]. Umaruddin, p. 59-60

(মেসিয়াহ্‌) বলে ঘোষণা করেন এবং তিনি অতীন্দ্রিয় চর্চা ও বিকৃত ধারণার দ্বারা জনগণকে বিপথে পরিচালিত করছিলেন এটা বলে যে: তিনি সে রুকনউদ্দিন, যিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি।' জনগণ রুকনউদ্দিন ও তার কিছু ভক্তকে হত্যা করে; তারা 'তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ও তার হাড় ভেঙ্গে খণ্ড খণ্ড করে।' [117]

ভারতে মধ্য- এশীয় তুর্কীরা যখন সরাসরি মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করে (১২০৬), তখন গাজ্জালীর খাঁটি বা কট্টর সূফীবাদ মুসলিম সমাজে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল এবং মুসলিম হামলাকারীদের পথ ধরে ভারতে সূফীদের আগমন ঘটে ব্যাপকভাবে। ভারতের বিখ্যাত সূফী দরবেশ - যেমন নিজামউদ্দিন আউলিয়া, আমীর খসরু, নাসিরুদ্দিন চিরাগী, খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তী ও জালালুদ্দিন - এরা সবাই গোড়া ও অসহিষ্ণু মতবাদী ছিলেন। তারা গোঁড়া ইসলামী পণ্ডিত বা উলেমাদেরকে উচ্চ মূল্য দিতেন এবং তাদের শিষ্যদেরকে ধর্মীয় আইন ও সামাজিক আচরণ সম্পর্কে উলেমাদের রায় অনুসরণ করে চলার পরামর্শ দিতেন। বিখ্যাত আরব- স্প্যানিশ সূফী চিন্তাবিদ ইবনে আরাবীর (মৃত্যু ১২৪০) গোঁড়ামিহীন বিতর্কিত মতবাদ ও চর্চায় প্রভাবিত হয়ে ভারতীয় সূফীদের মধ্যে মঈনুদ্দিন চিশতী ও নিজামুদ্দিন আউলিয়া ছিলেন তুলনামূলক অগোড়া ও উদারপন্থী। গোড়া মুসলিমদের বিরক্ত করে তারা তাদের সূফী ধর্মীয় আচার- প্রক্রিয়ায় বাদ্যপর্ব (সামা) ও নৃত্য (রাক্‌স) প্রবর্তন করেন। কিন্তু ইসলামের প্রকৃত রীতি- নীতির প্রশ্নের মুখোমুখি হলে তারা কখনোই মূল গোঁড়ামির বিরুদ্ধে যান নি এবং ধর্মীয় ব্যাপারে সর্বদাই উলেমাদেরকে অগ্রগণ্য মনে করতেন। সূফী দরবেশদের প্রবর্তিত নৃত্যগীত ও বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা অনুমোদনযোগ্য কিনা সে প্রশ্নে আউলিয়া বলতেন: 'যেটা আইনে (শরীয়া) নিষিদ্ধ, সেটি অগ্রহণযোগ্য।' সেকালে বিতর্কিত সূফীদের ভজন বা ভক্তিমূলক গান অনুমোদনযোগ্য কিনা, সে প্রশ্নে তিনি বলেন: 'বর্তমানে এ বিতর্কের ব্যাপারে বিচারক (অর্থাৎ কাজী, সাধারণত গোড়া প্রকৃতির) যে রায় দিবেন, তাই কার্যকর হবে।' [118]

উলেমাদের সাথে ভারতীয় সূফীদের কোনো রকম বিরোধিতা ছিল না। উভয়ের লক্ষ্য ছিল এক - ইসলামের স্বার্থ - যার অর্জনে তাদের পদ্ধতি

---

[117]. Elliot & Dawson, Vol. III, p. 378-79
[118]. Sharma, p. 226

ছিল ভিন্ন। নিজামুদ্দিন আউলিয়া বলতেন: উলেমারা যা বক্তৃতার দ্বারা অর্জণ করতে চায়, আমরা তা আচরণ দ্বারা অর্জণ করি।' আউলিয়ার দীর্ঘসময়ের সঙ্গী জামাল কিয়ামুদ্দীন কখনোই তাকে নবীর 'সুন্নত' পালনে ব্যর্থ হতে দেখেন নি।[119] অন্যান্য বিশিষ্ট সূফীরা অনেক ক্ষেত্রে অধিকতর গোঁড়া মত পোষণ করতেন। যেমন বিখ্যাত সূফী সাধক নাসিরুদ্দিন চিরাগ সূফী সাধনার ভ্রষ্ট ধারণা বা বিষয়গুলো পরিশ্রুত ও বিশুদ্ধ করেন। প্রফেসর কে. এ. নিজামী জানান: 'আল্লাহ ও তাঁর নবী যা তোমাদেরকে আদেশ করেছেন, তা করো এবং আল্লাহ ও তাঁর নবী যা নিষিদ্ধ করেছেন, তা কোরো না' - একথা বলে তিনি (চিরাগ) সূফী সমাজে প্রবিষ্ট সমস্ত ভ্রষ্ট (শরীয়া থেকে) আচার ও চর্চা বা সাধনা নিষিদ্ধ করেন। প্রফেসর নিজামী আরো বলেন: 'তিনি সূফী ধারা বা আচারগুলোকে সুন্নতের সাথে সমন্বিত করেন। যেখানে সামান্যতম দ্বন্দ্ব থাকে, সেখানে তিনি শরীয়া আইনের প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেন।' [120]

সূফীদের চিন্তাধারা

এ পর্বে বিশিষ্ট সূফী, বিশেষত বিশিষ্ট ভারতীয় সূফীদের মন ও আদর্শ অনুধাবনের জন্য বিধর্মী ও সহিংস ইসলামী মতবাদ, যেমন জিহাদ, সম্পর্কে তাদের চিন্তাচেতনা সংক্ষেপে আলোচিত হবে।

শ্রেষ্ঠ সূফী চিন্তাবিদ গাজ্জালী জিহাদ সম্পর্কে গোঁড়া ও সহিংস মত পোষণ করতেন। তিনি তার অনুরাগী মুসলিমদের উপদেশ দিতেন:

"বছরে অন্তত একবার জিহাদে অবশ্যই যেতে হবে। দুর্গে অবস্থানকারীদের মাঝে নারী-শিশুরা থাকলেও তাদের বিরুদ্ধে গুলতি ব্যবহার করা যেতে পারে। অগ্নিসংযোগ করে তাদেরকে পুড়িয়ে কিংবা ডুবিয়ে মারা যেতে পারে। তাদের গাছপালা কেটে ফেলা যেতে পারে। তাদের অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ (বাইবেল, তৌরাত প্রভৃতি) অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে। জিহাদীরা লুণ্ঠিত মালামাল (গণিমতের মাল) ইচ্ছে অনুযায়ী গ্রহণ করতে পারে।[121]

---

[119]. Nazami KA (1991a) The Life and Times of Shaikh Nizamuddain Auliya, New Delhi, p. 138

[120]. Nazami KA (1991b) The Life and Times of Shaikh Nizamuddain Chiragh-I Delhi, New Delhi, p. 100,103

[121]. Bostom, p. 199

জিম্মি কর্তৃক অবমাননামূলক 'জিজিয়া' কর প্রদান সম্পর্কে তিনি লিখেছেন:

ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মাজিয়ানদেরকে অবশ্যই 'জিজিয়া' দিতে হবে। জিজিয়া প্রদানকালে জিম্মি তার মাথা ঝুলিয়ে দিবে এবং সরকারি কর্মচারী জিম্মির দাড়ি ধরে কানের নিচের স্ফীত স্থানে আঘাত করবে।

তিনি 'ওমরের চুক্তি ও শরীয়া- প্রতিষ্ঠিত নিয়মের আলোকে জিম্মিদের ক্ষেত্রে কতকগুলো অক্ষমতা নির্দিষ্ট করেন। তিনি লিখেছেন:

তারা খোলাভাবে মদ্যপান করতে ও চার্চের ঘণ্টা বাজাতে পারবে না... তাদের ঘর মুসলিমদের ঘরের চেয়ে উঁচু হবে না, তা 'যত নীচুই হোক। জিম্মিরা চমৎকার কোনো ঘোড়া বা খচ্চরে চড়তে পারবে না; তারা কেবল কাঠের গদী সম্বলিত গাধার পিঠে চড়তে পারে। তারা রাস্তার ভাল অংশ দিয়ে হাঁটতে পারবে না। তাদেরকে তালি দেওয়া জামা-কাপড় পরতে হবে। এমনকি সরকারী গোসলখানাতেও তাদেরকে মুখ বন্ধ রাখতে হবে।[122]

বিশিষ্ট ভারতীয় সূফীগণ বিধর্মী কিংবা জিহাদের বিষয়ে ব্যাপক কোন মন্তব্য বা লেখা রেখে যান নি। তবুও ছোটখাটো সুযোগ পেলেই এসব বিষয়ে তারা যেসব ছিটেফোঁটা মন্তব্য করে গেছেন, তা এসব ব্যাপারে তাদের চিন্তাচেতনার ইঙ্গিত দেয়। সামগ্রিকভাবে অবিশ্বাসী ও জিহাদের ব্যাপারে তাদের ধারণা ছিল অনেকটা শ্রেষ্ঠ সূফী সাধক গাজ্জালীর অনুরূপ।

নিজামুদ্দিন আউলিয়া (১২৩৮-১৩২৫): নিজামুদ্দিন আউলিয়া গোঁড়া মুসলিমদের মতামত অবলম্বনে হিন্দুদেরকে নরকের আগুনে পোড়ার জন্য অভিশপ্ত করেন। তিনি বলেন: 'বিধর্মীরা মৃত্যুকালে শাস্তি পাবে। সে মুহূর্তে তারা ইসলামকে সত্য বলে স্বীকার করবে, কিন্তু তাদের তখনকার সে বিশ্বাস গ্রহণযোগ্য হবে না; কারণ সেটি হবে না অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস। সুতরাং একজন বিধর্মীর মৃত্যুকালীন বিশ্বাস অগ্রহণযোগ্য থেকে যাবে।' তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন: 'পুনরুত্থানের দিন বিধর্মীরা শাস্তি ও নিদারুণ যন্ত্রণার মুখোমুখি হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে, কিন্তু তা কোন কাজে আসবে না। তারা নরকেই যাবে, যদিও বিশ্বাসী হিসেবে।'[123] তার 'খুৎবা'য় নিজামুদ্দিন

---

[122]. Ibid

[123]. Sharma, p. 228-29

আউলিয়া বিধর্মীদেরকে অপকর্মকারী পাপী হিসেবে নিন্দা করে বলেন: 'আল্লাহ্ বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের জন্য যথাক্রমে স্বর্গ ও নরক সৃষ্টি করেছেন, পাপীদেরকে তাদের অপকর্মের প্রতিদান দিতে মাত্র।'[124]
অমুসলিমদের বিরুদ্ধে জিহাদ সম্পর্কে নিজামুদ্দিন আউলিয়ার চিন্তাভাবনা কুরআনের প্রথম 'সূরা ফাতিহা' সম্পর্কে তার বিবৃতি থেকে পাওয়া যেতে পারে। তিনি বলেন: সূরা ফাতিহায় ইসলামের দশটি মৌলিক ভিত্তির মধ্যে দু'টি অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তা হলো: 'অবিশ্বাসীদের সাথে যুদ্ধ করা এবং স্বর্গীয় বিধিবদ্ধ আইন প্রতিপালন করা।' এবং সে মুতাবেক হিন্দুদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে নাসিরুদ্দিন কিবাচার বিজয়ে তিনি সাতিশয় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন এবং তার শিষ্য শাহ্জালালকে ৩৬০ জন জিহাদী সাথীসহ প্রেরণ করেছিলেন সিলেটের রাজা গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে লড়াই করতে।
দক্ষিণ ভারতে মালিক কাফুরের নেতৃত্বে পরিচালিত জিহাদের সম্ভাব্য সফলতা সম্পর্কে কাজী মুঘিসুদ্দিন যখন আউলিয়ার কাছে জানতে চান, আউলিয়া তখন আবেগাপ্লুতভাবে বলে উঠেন: 'এ বিজয় তো কি, আমি আরো বিজয়ের অপেক্ষায় আছি।'[125] নিজামুদ্দিন আউলিয়া সুলতান আলাউদ্দিনের জিহাদ অভিযানে লুণ্ঠিত মালে গণিমত থেকে বিপুল পরিমাণ উপহার গ্রহণ করতেন ও তার খানকায় বা আশ্রমে তা গর্বের সাথে প্রদর্শন করতেন।[126]
খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তী (১১৪১- ১২৩০): নিজামুদ্দিন আউলিয়ার পর সম্ভবত ভারতের দ্বিতীয়- শ্রেষ্ঠ সূফী সাধক ছিলেন খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তী, যিনি হিন্দুধর্ম ও তার চর্চার বিরুদ্ধে গভীর ঘৃণা প্রদর্শন করেন। আজমীর- এর আনাসাগর লেকে পৌঁছে তিনি সেখানে অনেক প্রতিমা- মন্দির দেখতে পেয়ে আল্লাহ্ ও নবীর সাহায্যে সেগুলো ধূলায় মিশিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। সেখানে আবাস স্থাপনের পর খাজার ভক্তরা প্রতিদিন একটি বিখ্যাত মন্দিরের সামনে একটি গরু (হিন্দুদের কাছে পবিত্র) আনতো, যেখানে রাজা ও হিন্দুরা পূজার্চনা করতো; তারা সে গরু সেখানে জবাই করে তার মাংস কাবাব বানিয়ে খেত, যা ছিল হিন্দুধর্মের প্রতি তার ইচ্ছাকৃত ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ। বলা হয়,

---

[124]. Nazami (1991a), p. 185
[125]. Ibid
[126]. Sharma, p. 200

ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য তিনি না কি সেখানকার হিন্দুদের অতি পবিত্র বিবেচিত দু'টি হ্রদ 'আনাসাগর' ও 'পানসেলা' শুকিয়ে দিয়েছিলেন তার আধ্যাত্মিক শক্তির তেজ দিয়ে।[127] মঈনুদ্দিন চিশ্‌তীও তার ভক্তদের নিয়ে ভারতে এসেছিলেন বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার লক্ষ্যে এবং সুলতান মুহাম্মদ ঘোরীর বিশ্বাসঘাতী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আজমীরের সে যুদ্ধে ক্ষত্রিয় হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহান পরাজিত হন। চিশ্‌তী তার জিহাদী উদ্দীপনায় এ যুদ্ধে বিজয়ের সমস্ত গৌরব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বলেছিলেন: 'আমরা পিথাউরাকে (পৃথ্বীরাজকে) জীবন্ত আটক করে ইসলামের বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করেছিলাম।'[128]

ওদিকে মুলতানে হিন্দুদের বিরুদ্ধ নাসিরুদ্দিন কিবাচার এক জিহাদী মুসলিম বাহিনী যখন বিপন্ন অবস্থায় পরাজয়ের মুখোমুখি, তখন চিশ্‌তীর সুবিখ্যাত শিষ্য ও সূফীসাধক কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী কিবাচার কাছে গিয়ে তাকে একটি যাদুকরী বা অলৌকিক তীর দিয়ে বলেন: 'বিধর্মী বাহিনীর দিকে এ তীর নিক্ষেপ করো... তার কথামত কিবাচা তা করেন এবং পরদিন যখন দিনের আলো ফুটে উঠে, তখন একজন অবিশ্বাসী সেনাকেও যুদ্ধ ক্ষেত্রে দেখা যায় নি; তারা সবাই পালিয়েছিল।'[129] এবং সে যাদুকরি সূফীসাধককে সম্মানিত করতে সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক দিল্লীর আশেপাশের মন্দিরগুলো ভেঙ্গে সেগুলোর মাল- মসলা দিয়ে সুবিখ্যাত 'কুতুব মিনার'টি নির্মাণ করেন।

আমির খসরু (১২৫৩- ১৩২৫): শেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়ার কৃতী শিষ্য আমির খসরু মধ্যযুগীয় ভারতের এক উদার সূফী কবি হিসেবে পরিচিত। অনেক আধুনিক ইতিহাসবিদের দৃষ্টিতে তার ভারতে আগমন ছিল এ উপমহাদেশের জন্য এক আশীর্বাদ। পরপর তিন সুলতানের রাজদরবারে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছিল তার। তৎকালীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে সুখ্যাত আমির খসরু ভারতে ক্লাসিক্যাল মিউজিক বা ধ্রুপদী বাদ্যের এবং কাওয়ালী গান (সূফীদের নিবেদনমূলক গান)-এর প্রতিষ্ঠাতা। তবলা আবিষ্কারের কৃতিত্বও তাকে দেওয়া হয়ে থাকে।

---

[127]. Ibid, p. 230
[128]. Ibid
[129]. Ibid, p. 230

গান ও কবিতায় আমির খসরুর কৃতিত্ব ও সাফল্যের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যখন পতিত অবিশ্বাসী ও তাদের ধর্মের প্রশ্ন আসে, তখন তার ইসলামের গোঁড়ামিপূর্ণ আবেগ স্পষ্ট হয়ে উঠে। হিন্দু রাজাদের উপর মুসলিম বিজয়ের বর্ণনায় তিনি তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্য, যেমন বৃক্ষ ও প্রস্তরমূর্তি পূজা ইত্যাদির ব্যাপারে বিদ্রূপ করেন। মুসলিম বীরদের দ্বারা পাথরের মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনায় ব্যঙ্গ- বিদ্রূপ করতঃ তিনি লিখেন: 'মুহাম্মদের ধর্মের বিজয়োল্লাসের জন্য আল্লাহকে ধন্যবাদ। কোনো সন্দেহ নেই যে 'গাবর'রা (পৌত্তলিকদেরকে খর্বিত করতে গালি) পাথর পূজা করে, কিন্তু পাথর তাদের কোন সেবায় আসেনি; তারা পরপারে গেল শুধু সে পূজার অর্থহীনতার সাক্ষ্য বহন করে।'[130]
আমীর খসরু মুসলিম বীরদের দ্বারা হিন্দুদেরকে নৃশংসভাবে হত্যাকাণ্ডের বর্ণনায় আনন্দ প্রকাশ করেন। ১৩০৩ সালে চিতোর বিজয়ের পর খিজির খান কর্তৃক ৩০, ০০০ বন্দীকে হত্যার বর্ণনা দিতে গিয়ে উল্লসিত আমির খসরু লিখেন: 'আল্লাহকে ধন্যবাদ যে তিনি বিধর্মী- ছেদনকারী তলোয়ার দ্বারা ইসলামের চৌহদ্দি থেকে সকল হিন্দু নেতাদের হত্যার আদেশ দেন... ঈশ্বরের এ খলীফার নামে ভারতে অবিশ্বাসের কোনই স্থান নেই।' [131] মালিক কাফুরের দক্ষিণ ভারতের একটি হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে সেখানে হিন্দুদের ও তাদের যাজক ব্রাহ্মণদের উপর চালানো নৃশংস হত্যাযজ্ঞের বর্ণনা দিতে গিয়ে খসরু কাব্যিক আনন্দে উল্লসিত হন।[132] হত্যাকাণ্ডটির বর্ণনায় তিনি লিখেন: '. . . ব্রাহ্মণ ও মূর্তিপূজকদের গর্দান থেকে মস্তক নাচতে নাচতে মাটিতে তাদের পায়ের উপর গড়িয়ে পড়লো ও রক্তের স্রোত বয়ে গেল।' ভারতে হিন্দুদের দুর্দশাপূর্ণ বশীভূতকরণ ও ইসলামের বর্বরোচিত বিজয়ে গোঁড়ামিপূর্ণ উল্লাসে তিনি লিখেন:
সমগ্র দেশ আমাদের পবিত্র ধর্মযোদ্ধাদের তরবারী দ্বারা আগুনে ভস্মিভূত কণ্টকশূন্য জঙ্গলের মত হয়ে গেছে। ইসলাম বিজয়ী হয়েছে, পৌত্তলিকতার পতন ঘটেছে। জিজিয়া কর প্রদানের মাধ্যমে মৃত্যুর হাত

---

130. Elliot & Dawson, Vol. III, p. 81-83
131. Ibid, p. 77
132. Ibid, p. 91

থেকে মুক্তির আইন মঞ্জুর না করা হলে, হিন্দুদের নামটি শিকড় ও শাখাসহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।[133]

আমীর খসরু হিন্দুদের উপর মুসলিম বিজয়ীদের দ্বারা সংঘটিত বহু বর্বরোচিত সর্বনাশা নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এসব বর্ণনায় তিনি কোথাও একটু দুঃখ বা অনুশোচনার চিহ্ন দেখান নি, বরঞ্চ আবেগ জড়িত উল্লাস প্রকাশ করেছেন। ওসব বর্বর ঘটনার বর্ণনায় তিনি সর্বদা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং নবী মুহাম্মদের প্রতি গৌরব প্রকাশ করেছেন - সে কৃতিত্বপূর্ণ কাজে মুসলিম যোদ্ধাদেরকে সক্ষমতা দানের জন্য।

অন্যান্য সূফীগণ

অপর যে এক শ্রেষ্ঠ সূফী সাধক ভারতে আসেন তার নাম শেখ মখদুম জালাল আদ-দীন বিন মোহাম্মদ, যিনি হযরত শাহ জালাল নামে সমধিক পরিচিত ও বাংলার সিলেটে স্থিত হয়েছিলেন (পরে বর্ণিত)। এ সকল অতি শ্রদ্ধাবান সূফী সাধক ছাড়া আরও অনেক সূফী ব্যক্তিত্ব রয়েছেন - যেমন শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া, শেখ নূরুদ্দিন মোবারক গজ্‌নবি, শেখ আহমদ শিরহিন্দী ও শেখ শাহ ওয়ালিউল্লাহ প্রমুখ - যারা অধিকতর গোঁড়া ধ্যান্তধারণার জন্য প্রায়শঃই আধুনিক ইতিহাসবিদ ও লেখকদের দ্বারা নিন্দিত হন। উদাহরণস্বরূপ, সুহরাওয়ার্দী তরিকা বা গোত্রের এক বিখ্যাত সূফী সাধক ও ইসলামী পণ্ডিত শেখ মুবারক গজ্‌নবি অমুসলিম (কাফির) ও তাদের ধর্মের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা ও অসম্মান প্রকাশ করতেন। তিনি সুলতানকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, 'রাজারা কাফির ও কুফরি (নাস্তিকতা), শিরক (বহুঈশ্বরবাদ) ও মূর্তিপূজা উচ্ছেদ না করা পর্যন্ত তাদের ধর্ম রক্ষার দায়িত্ব পূরণ হবে না - যার সবই আল্লাহর উদ্দেশ্যে ও তাঁর নবীর 'দ্বীন' রক্ষার জন্য।'[134] কিন্তু কোন অসম্ভব পরিস্থিতিতে তার উপদেশ ছিল: 'কুফরের গভীর ও দৃঢ় শিকড় এবং কাফির ও মুশরিকদের ব্যাপক সংখ্যাধিক্যের কারণে যদি পৌত্তলিকতা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা না যায়, তাহলে রাজাদের উচিৎ অন্তত মুশরিক ও মূর্তি- পূজক হিন্দুদের

---

133. Ibid, p. 545-46
134. Sharma, p. 179

অমর্যাদা, অসম্মান ও মানহানি করা, যারা ঈশ্বর ও তাঁর নবীর নিকৃষ্টতম শত্রু।'[135]

আধুনিক ইতিহাসবিদগণ কর্তৃক নিন্দিত হলেও এসব সূফী-সাধকরা তাদের সময়ে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন, বিশেষ করে উলেমা ও শাসক শ্রেণীর দ্বারা সম্মানিত হওয়ায় তারা রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়নে যথেষ্ট প্রভাব খাটাতেন। সূফী সাধক বাহাউদ্দিন জাকারিয়া ও নুরুদ্দিন মুবারক ইসলামের সর্বোচ্চ 'শেখ আল-ইসলাম' খেতাবে ভূষিত হন, যা সাধারণত ইসলামের সবচেয়ে জ্ঞানী পণ্ডিতগণকে দেওয়া হত। ওসব অধিকতর গোড়া অথচ জনপ্রিয় সূফীদের ধ্যান ধারণা সম্পর্কে আরো বিশদ আলোচনায় না গিয়ে ইসলামের বিস্তারে সূফীরা কী ভূমিকা রেখেছিল, এখন তা বিশ্লেষণ করা যাক।

ইসলামের বিস্তারে সূফীদের অবদান

শান্তিপূর্ণ ধর্ম প্রচারাভিযানের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক অবিশ্বাসীকে ইসলামে দীক্ষিত করার কৃতিত্ব দেওয়া হয় সূফীদেরকে। এ আলোচনার শুরুতেই দু'টো বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে। প্রথমত, সূফীরা ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ায় একটি সুগঠিত ও গ্রহণযোগ্য সমপ্রদায়ে পরিণত হয়েছিল। অথচ এর আগেই মধ্যপ্রাচ্য, মিসর, পারস্য ও উত্তর আফ্রিকার জনগণের অধিকাংশই মুসলিম হয়ে গিয়েছিল এবং সে ধর্মান্তরে সূফীরা অবশ্যই বিশেষ কোন ভূমিকা রাখতে পারে নি। সুতরাং ফ্রান্সিস রবিনসন যথার্থই বলেন: 'মূলতঃ ইসলামের উল্লেখযোগ্য বিস্তারে সূফীরা মুখ্য ভূমিকা রেখেছে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর থেকে।'[136] দ্বিতীয়ত, সূফীদের কথিত শান্তিপূর্ণ ইসলাম বিস্তার মিশনকে সফলভাবে এগিয়ে নেয়ার আগে ইসলামের প্রভাব সৃষ্টির জন্য অনিবার্যরূপে প্রয়োজন হয়েছে ক্ষমতা ও তরবারীর আতঙ্ক বা সন্ত্রাস।

মধ্যযুগীয় ভারতের সূফী সাধকদের উপরোল্লিখিত চিন্তাধারণা ও মনোবৃত্তি খুব একটা ভিন্ন ছিল না গোড়া ধার্মিক বা উলেমাদের মতামত থেকে, যারা অবিশ্বাসীদেরকে ধর্মান্তরিতকরণে কুরআন, সুন্নত ও শরীয়া অনুযায়ী শর্তহীনভাবে শক্তি প্রয়োগের পরামর্শ দিতেন। ভারতের

---

135. Ibid, p. 183

136. Robinson F (2000) *Islam and Muslim History in South Asia*, Oxford University Press, New Delhi, p. 31-32

সূফীরা ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য সর্বদা সহিংস জিহাদকে সমর্থন করেছেন। শ্রেষ্ঠ সূফীসাধক নিজামুদ্দিন আউলিয়া এবং মঈনুদ্দিন চিশতী উভয়েই অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে পবিত্র ধর্মযুদ্ধের জন্য ভারতে এসেছিলেন এবং জিহাদী যুদ্ধে স্বয়ং অংশও নিয়েছিলেন। নিজামুদ্দিন আউলিয়া সিলেটের রাজা গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য বাংলার শ্রেষ্ঠ সূফী সাধক শেখ শাহ জালালকে ৩৬০ জন শিষ্যসহ প্রেরণ করেন (নীচে দেখুন)। বিজাপুরের প্রখ্যাত সূফীরাও পবিত্র ধর্মযোদ্ধারূপে অবিশ্বাসীদের হত্যা করে সেখানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছিলেন (ইতিমধ্যে উল্লিখিত)।

বাংলায় সূফীদের দ্বারা ধর্মান্তর

বিপুল সংখ্যক অমুসলিমকে সূফীগণ কর্তৃক শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামে ধর্মান্তরিত করার দাবী ঐতিহাসিক দলিল বা প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয়। তদুপরি অধিকাংশ সূফী ছিলেন অসহিষ্ণু ও সহিংস জিহাদী মনোবৃত্তির; এমনকি তারা নিজেরাই ছিলেন সহিংস জিহাদে অংশগ্রহণকারী। বন্ধুত্বপূর্ণ এক আলাপচারিতায় বাংলাদেশী দুই ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞ পণ্ডিত আমাকে জানান যে, অন্তত বাংলাদেশে সূফীরা 'শান্তিপূর্ণ' উপায়ে ইসলামের বিস্তার ঘটিয়েছিলেন, এ কথা নেহেমিয়া লেট্‌সিওনের দাবীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যে, 'পূর্ব বাংলাকে প্রায় পুরোপুরি ইসলামে ধর্মান্তরকরণে সূফীরা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।'[137]

নীচে বাংলার দুই শ্রেষ্ঠ সূফী সাধক সম্পর্কে অনুসন্ধান ধর্মান্তরিতকরণে তাদের ভূমিকা কতটা শান্তিপূর্ণ ছিল তার কিছুটা ধারণা দেবে পাঠককে। দুই জালাল, শেখ জালালুদ্দিন তাবরিজী (মৃত্যু ১২২৬ অথবা ১২৪৪) ও শেখ শাহ জালাল (মৃত্যু ১৩৪৭), ছিলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ দুই সূফী সাধক। ১২০৫ সালে হিন্দু রাজা লক্ষণসেনকে পরাজিত করে বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়ের পর শেখ জালালুদ্দিন তাবরিজী বাংলায় আসেন। তিনি পান্দুয়ার (মালদহ, পশ্চিম বাংলা) নিকট দেবতলায় স্থায়ীভাবে বসতি গাড়েন। কথিত আছে যে, তিনি বিপুল সংখ্যক কাফিরকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করেন, যদিও তার ধর্মান্তর পদ্ধতি অজ্ঞাত।

---

137. Levtzion N (1979) Toward a Comparative Study of Islamization, in Conversion to Islam, p. 18

সৈয়দ আতহার রিজভীর মতে, 'দেবতলায় এক কাফির (হিন্দু বা বৌদ্ধ) নির্মাণ করেছিলেন বিশাল এক মন্দির ও একটি কূপ। শেখ সেই মন্দিরটি নিশ্চিহ্ন করে তথায় একটি 'তাকিয়া'(খানকাহ্) প্রতিষ্ঠা করেন।'[138] কাফেরদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করতে এ বিখ্যাত সূফী সাধক কোন্পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছিলেন এ উদাহরণটি থেকে তার সম্যক ধারণা পাওয়া যেতে পারে।[139]

বাংলার আরেক শ্রেষ্ঠ সূফী সাধক আবাস গেড়েছিলেন সিলেটে। বাংলাদেশী মুসলিমদের কাছে তিনি এক জাতীয় বীর। শাহ্জালাল ও তার শিষ্যদের কৃতিত্ব হলো 'সত্যিকার' শান্তিপূর্ণ উপায়ে অধিকাংশ বাঙ্গালীকে ইসলামে দীক্ষিতকরণ।

পূর্ববাংলার (এখন বাংলাদেশ) সিলেটে শাহ্জালালের স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার ঠিক পূর্বে সিলেটের শাসনকর্তা ছিলেন গৌর গোবিন্দ নামে এক হিন্দু রাজা। শাহ্জালাল বাংলায় আসার পূর্বে গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ দু'বার গৌর গোবিন্দকে আক্রমণ করেন। উভয় আক্রমণের নেতৃত্বে ছিলেন সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের ভাতিজা সিকান্দর খান গাজী। দু'বারেই মুসলিম হামলাকারীরা পরাজিত হয়।[140] সুলতানের প্রধান সেনাপতি নাসিরুদ্দিনের পরিচালনায় গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে তৃতীয় আক্রমণ চালানো হয়। এ জিহাদ অভিযানে অংশ নিতে নিজামুদ্দিন আউলিয়া তার বিশিষ্ট শিষ্য শাহ্জালালকে ৩৬০ জন অনুসারীসহ প্রেরণ করেন। শাহ্জালাল ভক্তদের নিয়ে বাংলায় পৌঁছে হানাদার মুসলিম বাহিনীতে যোগ দেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর রাজা গৌর গোবিন্দ পরাজিত হন।[141] প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী এ যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয়ের সবটুকু কৃতিত্বই বর্তায় শাহ্জালাল ও তার ভক্তদের উপর।

---

138. Rizvi SAA (1978) *A History of Sufism in India*, Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi, Vol. I, p. 201

139. In Kashmir, great Sufi saint Sayyid Ali Hamdani also destroyed a temple to set up his Khanqah. There is a likely parallel between the methods these two Sufis applied in converting the Hindus (see below)

140. There is a tradition that king Gaur Govinda was attacked because of his punishing one Shaykh burhanuddin and his son for slaughtering a cow. A piece of the cow-meat was stolen and dropped on th king's temple, which infuriated the king. Such Stories should be considered in the light of the facts that Muslims attacked every corner of India, often repeatedly and it is unlikely that they had or needed a valid reason like this in each case.

141. *Hazrat Shah Jalal*, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/ Hazrat_ Shah_Jalal

সাধারণ নিয়মে মুসলিমদের প্রতিটি বিজয়ে বিধর্মীরা হাজারে হাজারে ক্রীতদাসের শিকলে বন্দী হয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে মুসলিম হয়ে যেত। নিঃসন্দেহে সিলেটে শাহজালালের পদার্পণের প্রথম দিনই তলোয়ারের ডগায় দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা বিপুল সংখ্যক কাফেরকে তিনি ইসলামে ধর্মান্তরিত করতে সাহায্য করেন। বাস্তবিকপক্ষেই তা অত্যন্ত 'শান্তিপূর্ণ উপায়ে' ছিল বৈকি!

ইবনে বতুতা শাহজালালের সঙ্গে সিলেটে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন যে, সেখানে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল সেসব বিধর্মীদের ধর্মান্তরিতকরণে তার প্রয়াস সহায়ক ছিল।[142] কিন্তু ধর্মান্তরিতকরণে সূফী সাধকটির অবলম্বনকৃত উপায় বা ধরনটি সম্বন্ধে তিনি বিস্তারিত কিছু জানাননি। এ কথা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে, পবিত্র জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য শাহজালাল ভারতে এসেছিলেন ৭০০ সঙ্গী নিয়ে,[143] এবং গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী জিহাদে লিপ্ত হয়েছিলেন। এ দৃষ্টান্ত সিলেটের হিন্দু বা বৌদ্ধদেরকে ধর্মান্তরিতকরণে তিনি কী ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন, তার একটা স্পষ্ট ধারণা দেয়।

অপর এক দৃষ্টান্ত অনুসারে, বাংলায় ধর্মান্তরকরণে সূফী সাধক নূর কুতুব- ই- আলম কেন্দ্রীয় ভূমিকা রেখেছিলেন বলে জানা যায়। ১৪১৪ সালে বিদ্রোহী হিন্দু যুবরাজ গণেশ মুসলিম শাসককে হটিয়ে দিয়ে বাংলার ক্ষমতা দখল করেন। এক হিন্দু ক্ষমতাসীন হওয়ায় সূফী ও উলেমা উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তারা তার শাসন মেনে নিতে অস্বীকার করে বাংলার বাইরের মুসলিম শাসকদের কাছে সাহায্যের আবেদন করেন। তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইব্রাহীম শাহ সার্কি বাংলা আক্রমণ করে গণেশকে পরাজিত করেন। তৎকালীন বাংলার নেতৃস্থানীয় সূফী সাধক নূর কুতুক- ই- আলম সাময়িক শান্তি স্থাপনের মধ্যস' তাকারী রূপে এগিয়ে আসেন। তিনি গণেশকে সিংহাসন ত্যাগে বাধ্য করে গণেশের বার বছরের পুত্র যদু'কে মুসলিম বানিয়ে সুলতান জালালুদ্দিন মোহাম্মদ নাম দিয়ে সিংহাসনে বসান।[144]

---

[142]. Gibb, p. 269
[143]. *Shah Jalal (R)*, Banglapedia; http://banglapedia.search.com.bd/HT /S_0238.htm
[144]. Sharma, p. 243-44

সূফীসাধক কর্তৃক এ ধর্মান্তরকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে কিংবা তরবারীর ডগায়, যাই বলা হোক না কেন, ইসলামের জন্য তা হয়ে দাঁড়ায় এক পরম আশীর্বাদ। সূফী-উলেমারা ইসলামে ধর্মান্তরিত তরুণ সুলতানকে এমনভাবে দীক্ষা দেন যে, তিনি (যদু) চরম সহিংসতার মাধ্যমে বিধর্মীদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরের জন্য এক রক্তপিপাসু ধর্মান্তরকারীতে পরিণত হন। 'কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া'তে বলা হয়েছে যে, 'জালালুদ্দিন মোহাম্মদের (১৪১৪-৩১) শাসনকালে ধর্মান্তরের একটা স্রোত বয়ে যায়।'[145] কিন্তু জালালুদ্দিন কর্তৃক বাংলায় বিধর্মীদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরের এ স্রোত কিভাবে সাধিত হয়েছিল তার ধারণা পাওয়া যায় জার্নাল অব দ্যা এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল (১৮৯৪)-এ প্রকাশিত ড. জেমস ওয়াইজ-এর গবেষণায়: 'তিনি একটিমাত্র শর্ত দিয়েছিলেন - হয় কুরআন অথবা মৃত্যু... অনেক হিন্দু কামরূপ ও আসামের জঙ্গলে পালিয়ে যায়; তথাপি সম্ভবত তার ১৭ বছরের শাসনামলে (১৪১৪-৩১) যত লোককে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল পরবর্তী তিনশ' বছরেও তা সম্ভব হয় নি।'[146] অধ্যাপক ইশতিয়াক হুসেইন কোরেশী একটা কৌতূহলজনক পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, বাংলার সূফীরা হিন্দু ও বৌদ্ধদের ধর্মান্তরিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, কিন্তু তা করেছিলেন একেবারে 'গোঁড়ামির' রাস্তায়।[147] তার অর্থ হলো, বাংলার সূফীরা ছিলেন ধর্মীয় মতবাদে কট্টর; সুতরাং তাদের গ্রহণকৃত পদ্ধতি মতবাদী আপোষ ও শান্তিপূর্ণভাবে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ধর্মান্তরের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ; কেননা বিধর্মীদেরকে ধর্মান্তরিতকরণে গোঁড়া ইসলাম নিঃশর্ত শক্তি প্রয়োগ দাবী করে। বাংলার সূফীদের গোঁড়ামির প্রসঙ্গে ইশতিয়াক বলেন: 'তারা হিন্দু বা বৌদ্ধ মন্দিরের স্থানগুলোতে তাদের 'খানকাহ' ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা ইতিমধ্যে ইসলামের পূর্বেই পবিত্র (হিন্দু-বৌদ্ধদের কাছে) বলে পরিচিত ছিল।' ইশতিয়াক আমাদেরকে জানাতে চান যে, হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস করে সে স্থানে সূফীরা খানকাহ্ স্থাপন করেছিল - যা বহু স্থানে (কাশ্মীর, মালদাহ ইত্যাদি)

---

[145]. Smith, p. 272
[146]. Lal, KS (1990) *Indian Muslims: Who Are They*, Voice of India, New Delhi, p. 57
[147]. Qureishi IH (1962) The Muslim Community of the Indo-Pakistan Subcontinent (610-1947), S-Gravenhage, p. 74

সূফীদের দ্বারা ঘটিত একটা সাধারণ ও পুনরাবৃত্ত ঘটনা - সেটি স্থানীয় বিধর্মীদের ধর্মান্তরে সুবিধা করে দেয়। এ মর্মে লেট্‌সিওন বলেন: 'সূফীরা বৌদ্ধ মন্দিরের স্থানে তাদের খানকাহ্‌প্রতিষ্ঠা করেন, আর তা সে ধর্মীয় পরিবেশে তাদের জন্য ফলদায়ক হয়।'[148]

এ কথা একেবারেই অবিশ্বাস্য যে, সূফীদের মন্দির ধ্বংস করে তার উপর 'খানকাহ্‌' স্থাপন স্থানীয় বিধর্মীদেরকে তার সাথে সহজেই সম্পৃক্ত করে তুলে, আর বাংলার হিন্দু- বৌদ্ধরা সেজন্য তাদের প্রতি ভালবাসায় গদগদ হয়ে উঠে।[149] সূফীদের মন্দির ধ্বংস করে সেস্থানে খানকাহ্‌ স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু- বৌদ্ধ ধর্মকে অবমাননা করা বা আঘাত হানা। এবং বাস্তবিকপক্ষে ভারতীয় ইতিহাস বহু দৃষ্টান্তে ভরপুর যে, মুসলিমরা যখন তাদের (হিন্দু- বৌদ্ধ) মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে আসে তখন তারা স্বাগত জানিয়েছে, কিন্তু যখন তাদের ধর্মকে আক্রমণ করেছে, তখনই তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ফুঁসে উঠেছে। মুসলিম আক্রমণকারীরা ভারতীয়দের মধ্যে যে বিরামহীন বিদ্রোহ ও সংগ্রামের অগ্নি জ্বেলে দিয়েছিল, তার পিছনে তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ রাজনৈতিক কারণের চেয়ে কোন অংশে কম দায়ী ছিল না - এ সত্যটি জওয়াহেরলাল নেহরুর লেখায় বারংবার উদ্ধৃত হয়েছে।

সম্রাট আকবর ও কাশ্মীরে সুলতান জয়নুল আবেদীনের উদারনীতিক শাসন - যখন ধর্মীয় নির্যাতন নিষিদ্ধ ও ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল - তা যথেষ্ট শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ ছিল। এটা প্রমাণ করে যে মুসলিমরা, তা শাসকই হোক কিংবা সূফী, যখন হিন্দু বা বৌদ্ধদের ধর্ম- মন্দিরকে ধ্বংস বা কলুষিত করেছে, ভারতীয়রা তা অপছন্দ করেছে। অধিকন্তু বৌদ্ধরা, যারা বাংলায় সর্বাধিক সংখ্যক ধর্মান্তরিত হয়েছিল, তারা বৌদ্ধবাদের অহিংস ও শান্তিপূর্ণ বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়ে এর আগে পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম থেকে বৌদ্ধ ধর্মে স্বেচ্ছায় দীক্ষিত হয়েছিল। তাদের মন্দির ও অন্যান্য ধর্ম- প্রতিষ্ঠানে মুসলিম আক্রমণ ও সেগুলোকে খানকাহ্‌ও মসজিদে রূপান্তরিত করা হলে নিঃসন্দেহে তা

---

148. Levtzion (1979) in *Conversion to Islam*, p. 18

149. For the Sufis, building of their Khanqahs at the site of destroyed temples was meant for showing their utter contempt and disrspect for the religion of infidels.

তাদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল; কোনমতেই ইসলামের প্রতি অনুকূল আকর্ষণ নয়।

কাশ্মীরে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী সূফীদের দ্বারা ধর্মান্তর

পারস্য ইতিহাস পঞ্জী 'বাহারিস্তান্তই-শাহী' এবং 'তারিখ-ই-কাশ্মীর' (১৬২০) কাশ্মীরের হিন্দুদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরকরণে সূফীদের সম্পৃক্ততা সম্বন্ধে কিছুটা বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছে। কাশ্মীরে আগমনকারী সর্বশ্রেষ্ঠ সূফীসাধক ছিলেন আমীর শামসুদ্দীন মোহাম্মদ ইরাকী। তিনি মালিক মূসা রায়নার সঙ্গে শক্তিশালী আঁতাত গড়ে তোলেন, যিনি ১৫০১ সালে কাশ্মীরের শাসনকর্তা হন। এর আগে কাশ্মীরের একমাত্র উদার ও সহনশীল মুসলিম শাসক জয়নুল আবেদীন (১৪২৩-৭৪) ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করায় সেখানে হিন্দুত্ব উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল, এর আগে মূর্তি-ধ্বংসকারীরূপে খ্যাত সিকান্দার যা প্রায় নিশ্চিহ্ন করেছিলেন।[150] 'বাহারিস্তান্তই-শাহী'তে বলা হয়েছে যে, মালিক রায়নার পৃষ্ঠপোষকতা ও কর্তৃত্বে আমীর শামসুদ্দীন মোহাম্মদ প্রতিমা-মন্দির পাইকারী হারে ধ্বংস এবং বিধর্ম ও অবিশ্বাসের ভিত্তি চিরতরে নির্মূল করার কাজে লিপ্ত হন। প্রতিটি ধ্বংসকৃত মন্দিরের স্থলে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিয়ে তথায় ইসলামী প্রথায় প্রার্থনা (নামাজ) চালু করা হয়।[151] সুলতান ইউসুফ শাহের রাজসভার (১৫৭৯-৮৬) কর্মচারী হায়দার মালিক চাদুরা লিখিত কাশ্মীরের বিস্তৃত ইতিহাস 'তারিখ-ই-কাশ্মীর'-এ তিনি লিখেছেন: 'শেখ শামসুদ্দীন কাশ্মীরে পৌঁছেন। তিনি পূজার স্থান ও হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস শুরু করেন এবং সে উদ্দেশ্য হাসিলের প্রচেষ্টা চালান।'[152] 'তোহ্ফাত-উল-আহবাব' নামের মধ্যযুগীয় এক ইতিহাস পঞ্জীতে বলা হয়েছে: 'শামসুদ্দীন ইরাকীর পিড়াপিড়িতে মূসা রায়না আদেশ জারী করেন যে প্রতিদিন ১,৫০০ থেকে ২,০০০ বিধর্মীকে তার ভক্তদের দ্বারা শামসুদ্দীন ইরাকীর সম্মুখে হাজির করা হোক। তারপর তাদের পবিত্র সূতা (জুনার) খুলে ফেলা হয়, তাদেরকে কলেমা পড়ানো হয়, তাদের মুসলমানি করা হয় ও তাদেরকে গোমাংস খাওয়ানো হয়।' এভাবে তাদেরকে মুসলিম বানানো হয়। শামসুদ্দীন ইরাকী কর্তৃক হিন্দুদের ইসলামে ধর্মান্তর

---

[150]. Pundit, p. 74; also discussed above.
[151]. Ibid, p. 93-94
[152]. Chadurah, p. 102-03

সম্পর্কে ‘তারিখ-ই-হাসান খুইহামি’তে উল্লেখ হয়েছে যে, ‘শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জোরপূর্বক ২৪ হাজার হিন্দু পরিবার ইরাকির ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিল (কাহরান ওয়া জাবরান)।’ [153]

পরে ১৫১৯ সালে মালিক কাজী চক সুলতান মোহাম্মদ শাহের অধীনে সামরিক প্রধানে উন্নীত হন। বাহারিস্তান্তই-শাহীতে বলা হয়েছে: ‘কাজী চকের প্রতি আমীর শামসুদ্দীন মোহাম্মদ ইরাকীর নির্দেশ ছিল যে, সে যেন এ ভূখণ্ডের সমস্ত অবিশ্বাসী ও পৌত্তলিককে নিশ্চিহ্ন করে, যা কাজী চক সম্পন্ন করেছিল।’ [154] এর আগে মালিক রায়নার শাসনকালে যাদেরকে জোরপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল, তাদের অনেকেই পরে বহুঈশ্বরবাদে (হিন্দুত্ববাদ) ফিরে যায়। এ অবস্থায় একটা গুজব ছড়ানো হয় যে, ওসব ইসলামত্যাগীরা ‘পবিত্র কুরআনের একটি কপি বসার আসনরূপে পাছার নীচে ব্যবহার করেছে।’ এ কথা শুনে ক্রুদ্ধ সূফী সাধক ইরাকী কাজী চকের কাছে নালিশ জানায় যে:

‘পৌত্তলিকদের এ সমপ্রদায় ইসলাম গ্রহণের পর এখন এর বিরোধিতায় তাদের আগের ধর্মে ফিরে গেছে। তুমি যদি শরীয়ত মোতাবেক তাদেরকে দণ্ডদানে অক্ষমতা প্রদর্শন কর (ধর্মত্যাগীদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড) ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না কর, তাহলে আমার জন্য আত্মনির্বাসনে যাওয়া অনিবার্য হয়ে উঠবে।’ [155]

উল্লেখ্য যে, শেখ ইরাকীর অভিযোগের মধ্যে কোথাও কুরআন অবমাননার কথা বলা হয় নি; তিনি কেবল ইসলাম গ্রহণের পর তা পরিত্যাগ করার উপর জোর দিয়েছেন। বাহারিস্তান্তই-শাহী উল্লেখ করে যে, এ শ্রেষ্ঠ সূফী সাধককে শান্ত করতে কাজী চক ‘অবিশ্বাসীদের উপর বেপরোয়া হত্যাযজ্ঞ চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পবিত্র আশুরার দিন (মুহররম, ১৫১৮) হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করা হবে বলে স্থির করা হয়। সে নির্দিষ্ট দিনে সাত থেকে আটশত বিধর্মীকে হত্যা করা হয়। হত্যাকৃতদের অধিকাংশই ছিল সে সময়ের অবিশ্বাসী (হিন্দু/বৌদ্ধ) সমপ্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব।’ তারপর কাশ্মীরের অবিশ্বাসী ও পৌত্তলিক সমপ্রদায়ের সব লোককে তরবারীর মুখে জোরপূর্বক

---

153. Pundit, p. 105-106
154. Ibid, p. 116
155. Ibid, p. 117

ইসলামে ধর্মান্তর করা হয়। বাহারিস্তান্তই- শাহী জানায়: 'মালিক কাজী চকের এটা ছিল প্রধান একটা সাফল্য।'[156] আর এ লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়েছিল মহান সূফী সাধক ইরাকীর নির্দেশেই।
সাইয়িদ আলী হামদানি ছিলেন আরেক সূফী সাধক, যিনি কাশ্মীরে এসেছিলেন ১৩৭১ কিংবা ১৩৮১ সালে। তাঁর প্রথম কাজ ছিল ছোট একটা মন্দির ধ্বংস করে সেস্থানে নিজের 'খানকাহ্' স্থাপন করা।[157]
তার কাশ্মীরে পদার্পণের পূর্বে তৎকালীন শাসক কুতুবুদ্দীন ধর্মীয় আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে শিথিল ছিলেন। সে সময়ে কাজী ও ধর্মবিশারদসহ সমাজের সকল স্তরের মুসলিমরা ইসলামে নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি তেমন মনোযোগ দেয়নি। মুসলিম শাসক, ধর্মবিদ কিংবা সাধারণ লোকেরা সহনশীলতা ও আয়েশের সাথে হিন্দু আচার-ঐতিহ্যের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল।[158] কাশ্মীরী মুসলিমদের এরূপ অইসলামীক কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ হয়ে সাইয়িদ হামদানী সে শৈথিল্য নিষিদ্ধ করেন ও গোঁড়ামি আনয়নের চেষ্টা চালান। সুলতান কুতুবুদ্দীন তার ব্যক্তিগত জীবনে গোঁড়া ইসলামী প্রথা চর্চার চেষ্টা করেন, কিন্তু 'আমীর সাইয়িদ আলী হামদানীর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ইসলামের বিস্তার ঘটাতে ব্যর্থ হন।' অবিশ্বাসী প্রথা, সংস্কৃতি ও ধর্মে প্রভাবিত স্থানে বসবাসে অনীহা প্রকাশ করে প্রতিবাদস্বরূপ সূফী সাধক কাশ্মীর ত্যাগ করে চলে যান। পরবর্তীতে মূর্তি ধ্বংসকারী সিকান্দরের শাসনামলে কাশ্মীরের আরেক শ্রেষ্ঠ সূফী সাধক আমীর সাইয়িদ মোহাম্মদ সেথায় আসেন, যিনি ছিলেন সাইয়িদ আলী হামদানীর পুত্র। সাইয়িদ মোহাম্মদ ও মূর্তি ভঙ্গকারী সিকান্দরের যৌথ অংশীদারিত্বে তারা কাশ্মীর থেকে মূর্তিপূজা সমূলে উচ্ছেদ করে, যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। 'বাহারিস্তান্তই- শাহী'তে উল্লেখ রয়েছে: 'এ দেশের মানুষের বিবেকের আয়না থেকে নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহিতার সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলার কৃতিত্ব' ছিল মহান সূফী সাধক সাইয়িদ মোহাম্মদের।[159]

সূফীদের দ্বারা গুজরাটে ধর্মান্তর

156. Ibid
157. Ibid, p. 36
158. Ibid, p. 35
159. Ibid, p. 37

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-৮৮) গুজরাটের গভর্নর রূপে ফারহাত উল-মূল্‌ক'কে নিয়োগ করেছিলেন। ফেরিস্তা উল্লেখ করেছেন: 'হিন্দুদের প্রতি সহনশীল নীতি গ্রহণ করে ফারহাত উল-মূল্‌ক হিন্দু ধর্মকে উৎসাহিত করেন এবং এরূপে প্রতিমা পূজা দাবীয়ে রাখার বদলে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেন।'[160] স্বভাবতই এটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে 'গুজরাটের বিজ্ঞ সূফী ও গোড়া উলেমাগণের মধ্যে, এ ভয়ে যে এরূপ আচরণের পরিণামে ইসলামের সত্যিকার বিশ্বাসটাই সে অঞ্চল থেকে উঠে যেতে পারে।' দিল্লীর সুলতানকে তারা চিঠি লিখে উদার এ মুসলিম গভর্নরের রাজনৈতিক ধারণা ও 'ইসলামের জন্য তা কতটা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে তিনি গভর্নর পদে বহাল থাকলে' - তা পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা কোরে। অভিযোগ পেয়ে সুলতান ফিরোজ শাহ দিল্লিতে রাজসভার পবিত্র লোকদের (সূফী সাধক) এক সভা ডাকেন এবং তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি গুজরাটের ভাইসরয় হিসেবে জাফ্‌ফরকে (মুজাফ্‌ফর খান) নিয়োগ করেন।[161]

গুজরাটের সূফী সাধকদের অনুরোধে ও দিল্লির সূফী সাধকদের পছন্দে নিযুক্ত মুজাফ্‌ফর খান খুব শীঘ্রই গুজরাট থেকে সহনশীল গভর্নর ফারহাত উল-মূল্‌ক'কে বিতাড়িত করেন এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে নৃশংস বর্বর সন্ত্রাস শুরু করে দেন। আর সে সঙ্গে শুরু করেন জোরপূর্বক ধর্মান্তর ও হিন্দুদের মূর্তি ধ্বংসের হোলিখেলা। ১৩৩৫ সালে, 'তিনি সোমনাথে অগ্রসর হন। সেখানে তিনি যে সব হিন্দু মন্দির খাড়া দেখেন, তার সবগুলোকে গুঁড়িয়ে দিয়ে সে স্থানে মসজিদ স্থাপন করেন। ধর্ম প্রচার ও প্রসারের নিমিত্তে সেসব স্থানে বিজ্ঞ সূফী সাধক ও শাসন কাজের জন্য কর্মচারীদের রেখে আসেন।'[162]

এ দৃষ্টান্ত আবারও প্রতীয়মান করে যে, যখনই কোন দয়ালু ও উদার চিত্তের মুসলিম শাসক অমুসলিমদের প্রতি সহনশীলতা দেখিয়েছে, সূফীরা সাধারণত তা সহ্য করে নি।

অধিকন্তু প্রশ্ন উঠে: মুজাফ্‌ফরের সোমনাথে রেখে আসা সূফীরা কিভাবে সন্ত্রাসে আতঙ্কগ্রস্ত হিন্দু, যাদের ধর্মমন্দির ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল, তাদের মাঝে ইসলাম বিস্তার করে?

---

[160]. Ferishtah, Vol. IV, p. 1

[161]. Ibid

[162]. Ibid, p. 3

গুজরাট ও দিল্লির সূফীরা মূর্তি- পূজা অবদমন না করার জন্য সহনশীল গভর্নর ফারহাত উল-মূল্কের অপসারণ চান। সুতরাং নিঃসন্দেহে মুজাফ্ফরের রেখে আসা সূফীরা অবশ্যই মুসলিম কর্মচারীদের সাথে হাত মিলিয়ে সতর্কতার সঙ্গে কাজ করেছিলেন যাতে ইসলামী আইন কার্যকর ও হিন্দু ধর্ম অবদমিত হয়। তার অর্থ দাঁড়ায়: সূফীরা নিশ্চিত করেন যে ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির যেন আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হয় এবং মূর্তি- পূজা দমনকরণে হিন্দু ধর্মচর্চা বন্ধ হয়। অবশ্য তারা কাশ্মীরের সূফী সাধক শামসদ্দীন ইরাকীর মত কাজও করে থাকতে পারেন - যার ভক্তরা মুসলিম সেনাদের সহায়তায় প্রতিদিন ১, ৫০০ থেকে ২, ০০০ বিধর্মীকে ধরে তার খানকায় এনে জোরপূর্বক মুসলিম বানিয়ে ছেড়ে দিতেন।

ধর্মান্তরকরণে সূফীদের প্রকৃত অবদান

সাধারণ ধারণা অনুযায়ী সূফীরা যদি ইসলামের বিস্তারে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে, তাহলে অবশ্যই সেটি ঘটেছে ভারতে। কারণ, ভারতে ইসলামী বিজয় সূচিত হয়েছিল এমন এক সময়ে, যখন সূফীবাদ মুসলিম সমাজে প্রথমবারের মতো ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে যথাযথভাবে সুসংগঠিত হয়েছিল। ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী সুলতান মোহাম্মদ ঘোরীর বাহিনীর সঙ্গে আজমীরে এসেছিলেন, ঠিক যখন মুসলিম বিজয় উত্তর ভারতে স্থায়ী পদাঙ্ক স্থাপন করতে শুরু করে। উপরে বিবৃত হয়েছে যে, কোনো বিখ্যাত ভারতীয় সূফীর মাঝে শান্তিপূর্ণভাবে ইসলাম বিস্তারের মানসিকতা ছিল না। খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী ও শেখ শাহজালাল ভারতে এসেছিলেন পবিত্র ধর্মযুদ্ধে যোগ দিতে এবং বাস্তবত তারা হিন্দুদেরকে হত্যা ও ক্রীতদাস বানাতে জিহাদী যুদ্ধে অংশগ্রহণও করেছিলেন। নিজামুদ্দিন আউলিয়া সুলতান আলাউদ্দিনের বর্বর ও নির্মম জিহাদ উৎসাহিত করতেন ও তার রক্তক্ষয়ী জিহাদী অভিযানের বিজয়ে স্পষ্টতঃই উৎফুল্ল হন এবং হৃষ্টচিত্তে জিহাদে লুণ্ঠিত মালে গণিমতের মোটা উপহার গ্রহণ করেন।

এগুলো হলো মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও সহনশীল সূফী সাধকদের কাহিনী। এসব তথ্য ও দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে যে, তথাকথিত ‘শান্তিপূর্ণ উপায়ে’ ইসলাম বিস্তারের জন্য ধর্মপ্রচারণায় ব্রতী হওয়ার পরিবর্তে সূফীরা অনিবার্যরূপে মুসলিম শাসক কর্তৃক পরিচালিত

রক্তঝরা ধর্মযুদ্ধ বা জিহাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সমর্থক ছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে তারাই ছিলেন সহিংস জিহাদের প্ররোচক ও উদ্বুদ্ধকারী, এমনকি ওসব রক্তাক্ত যুদ্ধে বিশিষ্ট অংশগ্রহণকারী। কাশ্মীরে সূফীরাই রক্তাক্ত জিহাদের অনুপ্রেরণা ও প্রণোদনা দেন, যার মাধ্যমে পাইকারি হারে হিন্দু মন্দির ও প্রতিমা ধ্বংস, হিন্দুদেরকে বেপরোয়াভাবে হত্যা ও জোরপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়।

মধ্যযুগীয় ভারতের এসব প্রসিদ্ধ সূফী সাধকদের মানসিকতা, মনোবৃত্তি ও কর্মকাণ্ড - সেটি হোক আজমীরে কিংবা বাংলায়, বিজাপুরে, দিল্লীতে বা কাশ্মীরে - তাতে ব্যবধান ছিল খুবই সামান্য। সুতরাং সমগ্র ভারতে ধর্মান্তরের ক্ষেত্রে সূফীদের ভূমিকা কাশ্মীরের সূফী কর্তৃক পালিত ভূমিকা থেকে খুব বেশী ভিন্ন না হওয়ারই কথা।

উল্লেখ্য যে, ভারতে মুসলিম শাসকরা অগণিত হিন্দুর বিরুদ্ধে বিরামহীন জিহাদ চালিয়ে যান। এসব ধর্মযুদ্ধের অনেক ক্ষেত্রেই পরাজিত হতভাগাদেরকে গণহারে হত্যার পর হাজার হাজার বা লাখ লাখ নারী- শিশুকে দাস বানানোর মাধ্যমে ইসলামের পতাকাতলে আনা হয়। দলে- দলে, হাজারে- হাজারে বিধর্মীদেরকে ধর্মান্তরের জন্য এরূপ নিষ্ঠুর ও বর্বরতাপূর্ণ কাজ ও উপায়ের নিন্দা কখনো কোনো বিখ্যাত সূফী সাধক করেননি। এরূপ বর্বর কাজের নিন্দা জানিয়ে আজ পর্যন্ত ভারতের কোনো বিখ্যাত সূফী সাধক একটি বিবৃতি দেননি। তারা কখনোই শাসকদেরকে তাদের বর্বর অভিযান ও মৃত্যুর যন্ত্রণায় ধর্মান্তরিত করার এ নিষ্ঠুর পন্থা বন্ধ করতে বলেন নি। তাদের কেউই এ পর্যন্ত বলেন নি: ‘এরূপ নিষ্ঠুর উপায়ে ধর্মান্তরিত করার জন্য হিন্দুদের বন্দী বা আটক কোরো না। এ কাজটা আমাদের উপর ছেড়ে দাও। এটা আমাদের শান্তিপূর্ণ উপায়ে করণীয় দায়িত্ব।’ তৎপরিবর্তে তারা ওসব বর্বর ও নিষ্ঠুরতাপূর্ণ কাজে লাগামহীন সমর্থন, প্রকৃতপক্ষে উৎসাহ যুগিয়েছেন; এমনকি একান্ত আগ্রহে অংশগ্রহণও করেছেন।

কাশ্মীর, গুজরাট ও বাংলার হিন্দুদের ধর্মান্তরে সূফীদের সম্পৃক্তির দৃষ্টান্তগুলো ইসলাম বিস্তারে তাদের প্রয়োগকৃত পন্থার একটা পরিষ্কার ধারণা দেয়, যা অমুসলিম ও তাদের ধর্ম সম্পর্কে তাদের বিকৃত ধারণা ও মনোবৃত্তির সঙ্গে যথার্থ সঙ্গতিপূর্ণ। কাশ্মীরে তারা শাসকদেরকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন ও তাদেরকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরে উৎসাহিত করেন। ব্যাপকহারে অমুসলিমদেরকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তারা

ধর্মান্তরিত করেছেন, এমন প্রমাণ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। যদি এমনটা কখনো কোথাও ঘটে থাকে, সেটা মধ্যযুগীয় ভারতে সামগ্রিক ইসলামে ধর্মান্তর প্রক্রিয়ায় নিছকই প্রান্তিক ভূমিকা রেখেছিল মাত্র। বিশ্বের অন্যত্র তাদের সে ভূমিকা সম্ভবত আরো গুরুত্বহীন বা নগণ্য ছিল।

সূফীদের শান্তিপূর্ণ ধর্মান্তরের সাক্ষ্য- দলিল সামান্য: মধ্যযুগীয় ভারতের সর্বত্র লাগাতার মুসলিম অভিযানকালে যুদ্ধক্ষেত্রে তলোয়ারের মুখে এবং দাস বানানোর মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক অবিশ্বাসীকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণের গাদাগাদা প্রমাণ রেখে গেছেন মুসলিম ইতিহাসবিদরা। কিন্তু তার মধ্যে এমন কোনো ঘটনার একটি দলিলও খুঁজে পাওয়া যায় না, যা প্রমাণ করে যে, কোনো সূফী উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হিন্দুকে 'অহিংস উপায়ে' ইসলামে ধর্মান্তরিত করেন।

সুলতান মাহমুদ ভারতে তার প্রথম অভিযানে ৫০০, ০০০ (পাঁচ লাখ) হিন্দুকে বন্দী ও দাস করে ইসলামে সংযুক্ত করেন। শাম্‌স সিরাজ আফিফ লিখেছেন যে, সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক বিপুল সংখ্যক হিন্দুকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করেছিলেন তাদেরকে নির্যাতন, অবমাননাকর জিজিয়া ও অন্যান্য দুর্বহ কর থেকে মুক্তি দানের প্রস্তাব দিয়ে,[163] যা সুলতান নিজেও লিপিবদ্ধ করে গেছেন (উপরে আলোচিত)। আফিফ জানান, ফিরোজ শাহ তুঘলক ১৮০, ০০০ হিন্দু বালককে দাসরূপে সংগ্রহ করেছিলেন: 'তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক দাস- বালক শুধুমাত্র পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও মুখস্ত করে সময় কাটাত, অন্যেরা ধর্মশিক্ষায় ব্যস্ত থাকত ও বাকীরা বই নকল করে সময় কাটাত।'[164] এমনকি দাসকরণ ও জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তর নিষিদ্ধকারী বিজ্ঞ আকবরের শাসনামলেও তাঁর অনেকটা অখ্যাত ও মাত্র দুই বছর মালওয়া শাসনকারী জেনারেল আব্দুল্লাহ খান দাস বানানোর মাধ্যমে ৫০০, ০০০ (পাঁচ লাখ) অবিশ্বাসীকে ইসলামে ধর্মান্তর করেছিলেন বলে সগর্বিত দাবী করে গেছেন।[165] উত্তর- পশ্চিম প্রদেশের আজকের মুসলিমদের পূর্বপুরুষরা মুসলিমে পরিণত হয়েছিল প্রধানত গোঁড়া ধর্মান্ধ আওরঙ্গজেবের শাসনামলে, মূলত সম্রাটের নির্যাতন থেকে

---

[163]. Sharma, p. 185
[164]. Elliot & Dawson, Vol. III, p. 341
[165]. Lal (1994), p. 73

রেহাই, সুবিধাজনক অধিকার প্রাপ্তি ও বৈষম্যমূলক করের বোঝা থেকে মুক্ত হতে।

এরূপ প্রধানত জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরের গাদা গাদা সাক্ষ্যর বাইরে ধর্মান্তরে সূফীদের অবদানের সাক্ষ্য নিতান্তই অনুপস্থিত। মধ্যযুগীয় ভারতে ধর্মান্তর সম্পর্কিত ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ভিত্তিতে হাবিব উল্লেখ করেন: 'ঐতিহাসিক দলিলে মুসলমানদের কোন মিশনারি শ্রম বা ধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টার নজীর নেই। অমুসলিমদেরকে ধর্মান্তরিত করার জন্য আমরা কোনো মিশনারী কর্মকাণ্ডের চিহ্ন খুঁজে পাই না।' তিনি যোগ করেন যে, মধ্যযুগীয় ইসলাম 'মিশনারী বা ধর্ম প্রচার কার্যক্রমের অগ্রগতি সাধনে ব্যর্থ হয়' এবং ভারতে 'আমাদেরকে সোজাসুজি স্বীকার করতে হয় যে, অমুসলিমদের ধর্মান্তরের জন্য মিশনারী আন্দোলনের কোন চিহ্নই এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। 'তিনি আরো উল্লেখ করেন: 'কিছু কিছু সস্তা পুস্তকে মুসলিম আধ্যাত্ম সাধকদের অলৌকিকতা প্রদর্শনের মাধ্যমে ধর্মান্তরের কথা বলা হলেও ওসব পুস্তক পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে জানা যায়, সেগুলো পরবর্তীকালের বানানো গল্প ছাড়া কিছুই নয়।' [166]

মধ্যযুগীয় সূফী সাধকদের উপর গবেষণা চালিয়ে রিজভী এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, 'প্রাথমিক আধ্যাত্মিক দলিলে (মাল্‌ফুজাত ও মাক্‌তুবাত) এসব সাধকদের দ্বারা জনগণকে ইসলামে ধর্মান্তর করার কোনোই উল্লেখ নেই।' নিজামুদ্দিন আউলিয়া ছিলেন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সূফী সাধক। কিন্তু তার আত্মজৈবনিক স্মৃতিগ্রন্থ 'ফাওয়াইদ-উল-ফুয়াদ'-এ তার দ্বারা মাত্র দু'জন হিন্দু দই বিক্রেতাকে ধর্মান্তরিত করার কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে।[167]

বড় ধরনের ধর্মান্তরের যেসব দৃষ্টান্তে সূফীদের সম্পৃক্ততা রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ছিল অমুসলিমদের উপর বেপরোয়া সহিংসতা ও নির্মমতা প্রদর্শনে শাসকদেরকে প্ররোচিত করা। উপরে প্রদত্ত সাক্ষ্য-প্রমাণে এটা স্পষ্ট হয় যে, সূফী সাধকরা শান্তিপূর্ণ ধর্মপ্রচার কর্মকাণ্ডে খুব সামান্যই আগ্রহ দেখিয়েছেন বা উদ্যোগী হয়েছেন। এমনকি তারা সে ধরনের শান্তিপূর্ণ কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার বিরোধীও ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, মাহদী হুসেইন উল্লেখ করেছেন:

---

[166]. Lal (1990), p. 93
[167]. Ibid, p. 93-94

ধর্মান্তরকরণে অতিশয় আগ্রহী সুলতান মুহাম্মদ শাহ তুঘলক মিশনারী কাজে সূফীদের নিয়োজিত হওয়ার প্রস্তাব করলে, সূফী সমপ্রদায় তার প্রস্তাবের প্রচণ্ড বিরোধিতা করে।[168] অন্যত্র সূফীরা যখনই ধর্মান্তর কাজে জড়িত হয়েছেন, তাদের পদ্ধতি স্পষ্টতঃই শান্তিপূর্ণ ছিল না।

তদুপরি অধিকাংশ ভারতীয় সূফী, যারা পারস্য ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে এসেছিলেন, তারা সাধারণ মানুষের কাছে ইসলামের বার্তা কার্যকরভাবে পৌঁছে দিতে ভারতীয় ভাষায় কথা বলতেন না। তারা কখনোই ঘৃণিত 'জাহিলিয়া' ভাষা (অর্থাৎ ভারতীয় স্থানীয় ভাষা) শিখতে আগ্রহী হননি। অথচ তৎকালীন ভারতের স্থানীয় অধিকাংশ মানুষ ছিল অশিক্ষিত, নিরক্ষর। তারা ফার্সি বা আরবী ভাষা বুঝত না। পরিশেষে, আজকের হিন্দুরা, বিশেষত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা, ইসলামে ধারণকৃত বলে দাবীকৃত উচ্চমানের সমতা, শান্তি ও সামাজিক ন্যায় বিচারের বার্তা সম্বন্ধে অনেক ভাল বিচার-ক্ষমতা রাখে। আজ অসংখ্য সহজগম্য ও সৃজনশীল উপায়ে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ও সঠিক ব্যাখ্যায় ইসলামের বার্তা ভারতের প্রতিটি স্থানে পৌঁছে যাচ্ছে। ইসলামের বার্তা যদি এতটাই শ্রেষ্ঠ বা উচ্চমানের হতো, যার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে হাজার হাজার ভারতীয় অবিশ্বাসী মুসলিম শাসনামলে ইসলাম গ্রহণ করেছিল বলে দাবী করা হয়, তাহলে আজকের দিনে ধর্মান্তরের হার অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশী হতো।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বণিকদের দ্বারা ধর্মান্তর

সম্প্রতি মুসলিম বণিকদের দ্বারা বিধর্মীদেরকে ইসলামে ধর্মান্তর, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যেটা ঘটেছিল, তা ইসলামে ধর্মান্তরের একটা নতুন দৃষ্টান্তরূপে প্রচারণা পাচ্ছে। দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া-র এক নিবন্ধে অতুল শেঠী দাবী করেন: 'ভারতে মুসলিম হানাদারদের দ্বারা ইসলাম আনীত হয়েছিল - এটা একটা ভুল ধারণা। এ ভুল ধারণা সংশোধন করতে তিনি লিখেছেন:[169]

অধিকাংশ ইতিহাসবিদ এখন একমত যে, ভারতে ইসলামের প্রবর্তন আরব বণিকদের মাধ্যমে হয়েছে, মুসলিম হানাদারদের দ্বারা নয় - যা

---

[168]. Ibid, p. 94

[169]. Sethi A, *Islam was brought to India by Muslim invaders*, The Time of India, 24 June 2007; also see Qasmi MB, *Origin of Muslims in India*, Asian Tribune, 22 April 2008

সাধারণত বিশ্বাস করা হয়। আরবরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন থেকে দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলে আসা-যাওয়া করে আসছিল, আরবে ইসলাম প্রচারেরও অনেক আগে থেকে। এইচ. জি. রাউলিনসন তার এইনসান্ট অ্যান্ড মেডিয়েভল হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া গ্রন্থে লিখেছেন: 'সপ্তম শতকের শেষাংশে ভারতের উপকূলীয় শহরগুলোতে প্রথম আরব মুসলিমরা বসতি স্থাপন করতে শুরু করে। তারা ভারতীয় নারীদের বিয়ে করে ও সম্মানসূচক আচরণ পায়। তারা তাদের ধর্মবিশ্বাস প্রচারেরও অনুমতি পায়। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান বি. পি. শাহুর মতে, অষ্টম ও নবম শতকের মধ্যে যেখানে যেখানে আরব মুসলিমরা বসতি স্থাপন করেছিল, সেখানেই তারা বিশিষ্ট অবস্থান দখল করতে শুরু করে। বস্তুতঃ এদেশে প্রথম মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হয় এক আরব বণিকের দ্বারা ৬২৯ সালে কোদুনগালুরে, যা এখন কেরালা নামে পরিচিত। কৌতূহলের বিষয় হলো, সেসময় নবী মুহাম্মদ জীবিত ছিলেন ও ভারতের এ মসজিদটি সম্ভবত বিশ্বের প্রথম গুটিকয় মসজিদের একটি। এটা প্রমাণ করে যে, ভারতে ইসলামের উপস্থিতি শুরু হয় মুসলিম হানাদারদের আগমনের অনেক আগেই।
প্রখ্যাত মুসলিম বণিক ও ইতিহাসপঞ্জিকার আল-মাসুদী ৯১৬-১৭ সালে আধুনিক বোম্বাই থেকে পঁচিশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত 'চউল-এ হাজার হাজার মুসলিমের এক আবাসের বর্ণনা দিয়েছেন, যাদের পূর্বপুরুষরা আরব ও ইরাক থেকে লঙ্কা ও মশলার ব্যবসার জন্য এসেছিলেন। স্থনীয় রাজা এ বসতির লোকদেরকে কিছুটা রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করেছিলেন। এর সদস্যরা ছিল প্রধানত আরব, যারা চউলে জন্মগ্রহণ করেছে ও স্থানীয় লোকদের সাথে যথেষ্ট পরিমাণে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল।' [170]
স্পষ্টতঃই মুসলিম আক্রমণকারীরা ৭১২ সালে সিন্ধুতে বিজয়ের খুঁটি গাড়ার অনেক আগেই মুসলিম বণিকরা ভারতে আগমন করে বসতি স্থাপন করে। এসব উদাহরণের ভিত্তিতে দাবী করা হয় যে, আক্রমণকারী মুসলিম হানাদার ও বীর যোদ্ধারা নয়, বরং বণিকরা ভারতে ও অন্যান্য অনেক স্থানে ইসলামের বিস্তার ঘটিয়েছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ ফিলিপিন ও দক্ষিণ

[170]. Eaton (1978), p. 13

থাইল্যান্ড বণিকদের মাধ্যমে এরূপে ইসলাম বিস্তারের এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। অমুসলিমদের ইসলামে ধর্মান্তরে শক্তি প্রয়োগের অভিযোগ অস্বীকার করতে জাকির নায়েক প্রশ্ন রাখেন:

ইন্দোনেশিয়া একটা দেশ যেখানে বিশ্বের সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মুসলিম বাস করে। মালয়েশিয়ার অধিকাংশ মানুষ মুসলিম। প্রশ্ন হলো: 'কোন্মুসলিম বাহিনী অস্ত্রহাতে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় গিয়েছিল?'

মুসলিমদের কাছ থেকেই এ প্রশ্নের উত্তর আসে: 'সে কালের শাসকরা স্বেচ্ছায় আজকের ধর্মের (অর্থাৎ ইসলামের) কাছে সমর্পণ করেছিল সিল্ক রুট ও সমুদ্র পথ দিয়ে আগত আরব মুসলিম বণিকদের মাধ্যমে' (ব্যক্তিগত যোগাযোগ)। অপরদিকে ড্যানিয়েল পাইপস নায়েকের সাথে সহমত প্রকাশে তার প্রশ্নের জবাব দেন এভাবে: 'দ্বারুল ইসলাম শান্তিপূর্ণভাবেও বিস্তৃতি লাভ করে রাজাদের স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরের মাধ্যমে, যেমন ১৪১০ সালে মালাক্কার শাসনকর্তা পরমেশ্বরের ধর্মান্তর; পরবর্তীতে তার নগরী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়।'[171] একইভাবে আরব লীগের সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল খালেক হাসৌনা দাবী করেন (১৯৩৮): 'কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই ইসলাম চীন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপিনে বিস্তার লাভ করে।'[172]

ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসবিদ রাদেন আব্দুলকাদির উইদিয়োতমোদিয়ো ইন্দোনেশিয়ার অমুসলিমদেরকে ইসলামে ধর্মান্তর সম্পর্কে লিখেন:

ইন্দোনেশিয়ায় ধর্মান্তরের গোটা ইতিহাসে কোথাও কোনো বহিরাগত শক্তির অস্তিত্ব নেই। সত্যিকারের ধর্ম বিস্তারে জিহাদ বা পবিত্র ধর্মযুদ্ধই একমাত্র পথ নয়। নিয়ম অনুযায়ী, কেবলমাত্র উপদেশ ও প্রচারণা ব্যর্থ হলে শক্তি প্রয়োগ অনুমোদিত।[173]

উইদিয়োতমোদিয়ো অন্তত ইসলামে ধর্মান্তরের ক্ষেত্রে 'ধর্মযুদ্ধের' মাধ্যমে শক্তি-প্রয়োগ ধর্মীয়ভাবে অনুমোদিত বলে একমত হয়ে সততার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু তিনি ইন্দোনেশিয়ায় তার প্রয়োগের

---

171. Pipes (1983), p. 73

172. Waddy, p. 187

173. Widjojoatmodjo RA (1942) *Islam in the Netherlands East Indies*, in the Far Eastern Quarterly, 2 (1), p. 51

কোনো আলামত খুঁজে পান নি। এবং তিনি সোজাসুজি স্বীকার করেন যে, বুঝিয়ে- সুঝিয়ে ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের বিধর্মীদেরকে ধর্মান্তরের প্রচেষ্টায় বাধা এলে বা তা ব্যর্থ হলে, বল প্রয়োগ হতো বা হতে পারতো।

দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম প্রসারের পূর্বে ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত এ অঞ্চলে তিনটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল, যেগুলো হলো শ্রীবিজয়া (মালয়েশিয়া), মাজপাহিত (ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ) ও সিয়াম বা শ্যাম (থাইল্যান্ড)। জনগণ তখন হিন্দু, বৌদ্ধ ও সর্বপ্রাণবাদের সংমিশ্রণে সৃষ্ট একটি মিশ্র ধর্ম অনুসরণ করতো। ইসলামের তৃতীয় খলীফা ওসমানের (মৃত্যু ৬৫৬) রাজত্বের প্রথম দিকে আরব মুসলিম বণিকরা সমুদ্রপথে চীনের উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে ইন্দোনেশিয়ার উপকূলীয় বন্দরে যাত্রাবিরতির মাধ্যমে সর্বপ্রথম এ অঞ্চলের সাথে ইসলামের যোগসূত্র স্থাপন করে।

পরে ৯০৪ সাল থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত মুসলিম বণিকরা শ্রীবিজয়ার সুমাত্রা বন্দরের বাণিজ্যকর্মে ক্রমে অধিকতর জড়িত হয়। ভারতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবার পর মুসলিম বণিকরা ভারতের গুজরাট, বাংলা ও দক্ষিণ ভারতের উপকূলীয় বন্দর এবং চীন থেকেও অধিক সংখ্যায় আসতে থাকে। এসব মুসলিম বণিক, যারা সর্বদাই ধর্মপ্রচার মিশন সঙ্গে আনত, তারা উপকূলীয় বন্দর- শহরগুলোতে স্থায়ীভাবে বসতিস্থাপন করে, যেমন মালাক্কা ও উত্তর সুমাত্রার (আচেহ, জাভা) সামুদ্রা বা পাসাই। তারা স্থানীয় বিধর্মী নারীদের সাথে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে মুসলিম সমপ্রদায় গড়ে তুলে। সম্ভবত দশম শতাব্দীর গোড়ার দিকে এ অঞ্চলে মুসলিম বণিক কর্তৃক স্থাপিত মুসলিম বসতি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিকে উত্তর সুমাত্রায় উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি গড়ে তুলে। এ সময়ের মধ্যে তারা দু'টো মুসলিম নগর- রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়: একটা সামুদ্রা বা পাসাই- এ, অপরটি ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের পার্লাক- এ। ১৩৪৫- ৪৬ সালে ইবনে বতুতা সামুদ্রা মুসলিম নগর- রাজ্যটি সফর করেন।

তখন পর্যন্ত এ অঞ্চলের অবিশ্বাসীরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়নি বলে মনে হয়। মুসলিমরা স্থানীয় সহনশীল ও উদার সংস্কৃতির সুযোগ নিয়ে স্থানীয় নারীদেরকে বিবাহের মাধ্যমে তাদের সন্তান্তসন্ততিদের দ্বারা ধীরে ধীরে মুসলিম সমপ্রদায় গড়ে তুলে। তারা

তিন থেকে চার শতাব্দীর মধ্যে সামুদ্রা ও পার্লাকে দু'টো নগর-রাজ্য গড়ে তোলার মতো মুসলিম জনসংখ্যা অর্জনে সক্ষম হয়। এবং শীঘ্রই তারা আশপাশের বিধর্মীদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সামুদ্রা সুলতানাত সফরের পর ইবনে বতুতা উল্লেখ করেন: 'শাসক সুলতান আল-মালিক আজ-জাহির ছিলেন সুখ্যাত ও মুক্তহস্ত শাসক।' তার কারণ:

তিনি অবিরাম ধর্মের জন্য যুদ্ধে (অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদে) ও যুদ্ধাভিযানে লিপ্ত ছিলেন। তার প্রজারাও নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসের জন্য যুদ্ধ করতে আনন্দ পেত ও স্বেচ্ছায় যুদ্ধাভিযানে তার সঙ্গী হতো। মুসলিমরা সে অঞ্চলের সমস্ত অবিশ্বাসীদের উপর কর্তৃত্বকারী অবস্থানে ছিল, যাদেরকে (মুসলিমদেরকে) ভূমিকর দিয়ে শান্তির নিশ্চয়তা কিনতে হতো।[174]

রাজা পরমেশ্বরের ধর্মান্তর: তথাপি চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এ অঞ্চলের অবিশ্বাসীদেরকে ধর্মান্তরিত করতে ইসলাম খুব সামান্যই সফলকাম ছিল এবং তাদের উপস্থিতি মাত্র কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোণে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এর নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে প্রতারণার মাধ্যমে শ্রীবিজয়ার রাজা পরমেশ্বরের ধর্মান্তরিত হওয়ার সাথে সাথে। পরমেশ্বর পালেমবাং থেকে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। এ সময় শ্রীবিজয়া রাজ্যের পতন ঘটছিল এবং মাজ্পাহিত শাসকরা তাদের প্রভু হয়ে উঠছিল। মাজ্পাহিত শাসকের সাথে এক কলহের কারণে তিনি তাঁর রাজধানী পালেমবাং থেকে কিছুটা নিরাপদ তেমাসেক দ্বীপে (সিঙ্গাপুর) স্থানান্তর করতে বাধ্য হন। মাজ্পাহিত বাহিনীর সাথে এক হাতাহাতি যুদ্ধে তিনি মাজপাহিতের মিত্র শ্যামের যুবরাজ তেমাগিকে হত্যা করেন। এতে শ্যামের ক্রুদ্ধ রাজা মিত্র মাজ্পাহিতের সঙ্গে যৌথশক্তিতে পরমেশ্বরকে বন্দী ও হত্যার উদ্দেশ্যে একের পর এক শ্রীবিজয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পরমেশ্বর পিছুপদ হয়ে তেমাসেক দ্বীপ থেকে পালিয়ে যান - প্রথমে মুয়ারে, পরে মালাক্কায়, এবং ১৪০২ সালে মালাক্কাকে রাজধানী করেন তিনি।

এ সময় বন্দর-নগরী মালাক্কায় দীর্ঘদিন আগে বসতি স্থাপনকারী মুসলিমরা উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি গড়ে তুলেছিল। প্রধানত ব্যবসায়ী

---

[174]. Gibb, p. 274

পেশায় নিয়োজিত হওয়ায় তারা ভারতের সাথে মালাক্কার প্রসারিত বাণিজ্যে ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। সুতরাং পরমেশ্বরের রাজদরবারে তারা স্বাগত পেত এবং সেখানে তাদের উপস্থিতি ক্রমশঃ বর্ধিত করে তারা পরমেশ্বরের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণে প্রভাব বাড়িয়ে তুলে। মুসলিমরা তার সেনাবাহিনীতে ঢুকে পড়তে থাকে এবং তিনি শ্যাম ও মাজ্‌পাহিত শাসকদের আক্রমণ প্রতিহত করতে ক্রমশ তাদের উপর অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। ঠিক এ সময়ে পরমেশ্বরের মুসলিম উপদেষ্টারা তাকে প্রস্তাব দেয় যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে তার পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য আরো আরব মুসলিম যোদ্ধা পাঠানো হবে। পরমেশ্বর এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর কয়েক বছর ধরে তার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ শত্রুর বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধে অবস্থান ক্রমশ দুর্বল ও বিপজ্জনক হতে থাকে।

ঠিক এ সন্ধিক্ষণে আরব বণিকরা তাকে পাসাই থেকে মিশ্ররক্তের এক সুন্দরী তন্বীকে উপহার দেয়, যার পিতা ছিল আরব ও মাতা ইন্দোনেশীয় বংশোদ্ভূত। পরমেশ্বর এ অনন্য সুন্দরী দাস- কন্যার প্রেমে পড়ে যান ও তার হারেমে সে গর্ভবতী হয়। নিঃসন্তান পরমেশ্বর দীর্ঘদিন থেকেই তার রাজ্যের জন্য এক উত্তরসূরীর আকাঙ্ক্ষা করছিলেন। তিনি গর্ভবতী দাস- বালিকাকে তার সন্তানের বৈধতা প্রদানের উদ্দেশ্যে বিয়ের প্রস্তাব দিলে, বিয়ের আগে সে পরমেশ্বরকে অবশ্যই ইসলাম গ্রহণের দাবী করে বসে। উত্তরোত্তর দুর্বল ও বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে মুসলিম সেনাদের থেকে অধিক সাহায্যের জরুরী প্রয়োজন ও এর সাথে উত্তরসূরীর আকাঙ্ক্ষা - এ দু'টো কারণে পরমেশ্বর শেষ পর্যন্ত ধর্মান্তরে সম্মত হন। তিনি ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়ে গর্ভবতী দাস- বালিকাটিকে বৈধ রাণী করে প্রাসাদে নিয়ে আসেন।

মালাক্কা সুলতানাত ও জিহাদের তীব্রতা বৃদ্ধি: ১৪১০ সালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর পরমেশ্বর হিন্দু রাজ্য শ্রীবিজয়াকে একটি মুসলিম সুলতানাত অর্থাৎ মালাক্কা সুলতানাতে পরিণত করেন এবং নিজে সুলতান ইস্কান্দার শাহ নাম ধারণ করেন। ধর্মান্তরের পর তার অর্ধ-মুসলিম রাণী এবং মুসলিম যোদ্ধা ও উপদেষ্টারা তাকে এক কট্টর মুসলিম শাসক বানিয়ে তুলে। চীন সম্রাট ইউং লো'র এক কূটনীতিকের সেক্রেটারী ড্রাগোম্যান হিসেবে আগত মা হুয়ান নামক এক চীনা মুসলিম ১৪১৪ সালে সুলতান ইস্কান্দার শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

তিনি সুলতানকে ইতিমধ্যেই এক 'কঠোর ধর্মবিশ্বাসীরূপে' দেখতে পান।[175]

ইবনে বতুতার তথ্য অনুযায়ী, চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকে মুসলিমরা সামুদ্রায় কিছুটা শক্তিশালী হয়ে উঠার সাথে সাথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিধর্মীদের বিরুদ্ধে ছোট ছোট সহিংস জিহাদ শুরু করে দিয়েছিল। মালাক্কা সুলতানাত প্রতিষ্ঠার পর জিহাদ তীব্রতর হয় বৃহত্তর গৌরব অর্জনের লক্ষ্যে। মালাক্কা সুলতানাত ইসলামের পরিধি সম্প্রসারণের জন্য প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর বিরুদ্ধে বড় আকারের জিহাদ অভিযানের কেন্দ্র হয়ে উঠে। গাজী কিংবা শহীদ হওয়ার জন্য আল্লাহর পথে জিহাদের ইসলামী জোশে অনুপ্রাণিত এখনকার মুসলিম বাহিনী নাটকীয়ভাবে তার ভাগ্যে পরিবর্তন আনে বিপজ্জনকভাবে দুর্বল অবস্থান থেকে। প্রায় ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে চলে আসা ইস্কান্দার শাহ (তথা পরমেশ্বর) ও তার বংশধররা দ্রুত প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর উপর রাজনৈতিক কর্তৃত্বের শক্তি অর্জন করে। সুলতানাতটি বিস্তৃত হতে থাকে: সর্বোচ্চ সম্প্রসারণকালে তা পরিবেষ্টিত ছিলো আজকের মালয়েশিয়া উপদ্বীপ, সিঙ্গাপুর এবং পূর্ব সুমাত্রা ও বোর্ণিওর বৃহত্তর অঞ্চল পর্যন্ত। পরে বোর্ণিও আরেকটি স্বাধীন সুলতানাত হিসেবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দীর্ঘ দিন ধরে মালাক্কা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ইসলামের প্রাণকেন্দ্ররূপে গণ্য ছিল, যার সঙ্গে যুক্ত ছিল মালয়েশিয়া, আচেহ্, রিয়াউ, পালেমবাং ও সুলাওয়েসি।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে মালাক্কা সুলতানাত প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত হয়ে শক্তিশালী মাজ্পাহিত রাজ্যকে ধ্বংসের মুখে পতিত করে ও শ্যাম রাজ্যকে দুর্বল করে তুলে। ১৫২৬ সালে মুসলিম যোদ্ধারা যখন জাভা অধিকার করে, তখন মাজ্পাহিত সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। মালাক্কা সুলতানাত তখনো পর্যন্ত টিকে থাকা থাই রাজ্যের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অব্যাহত রেখে তার দক্ষিণাংশ থেকে কিছু ভূখণ্ড দখল করে নেয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ও ষোড়শ শতাব্দীর শুরুর দিকে মুসলিম আক্রমণকারীরা ঝড়ের বেগে থাই রাজধানী আয়ূথায়া আক্রমণ করে। কিছু সময়ের জন্য পরিস্থিতি এমন হয়ে উঠে যে, মুসলিম ধর্মযোদ্ধারা যেন সিয়াম অধিকার করে নিবে।

---

[175]. Widjojoatmodjo, p. 49

ঠিক এ বিপজ্জনক সন্ধিক্ষণে মালাক্কা প্রণালীর নৌপথ বরাবর কাকতালীয়ভাবে এক পর্তুগীজ বাণিজ্যবহর এসে নোঙ্গর করলে পর্তুগীজ ও মালাক্কা সুলতানের মধ্যে মারাত্মক দ্বন্দ্ব শুরু হয়, যা বিপন্ন ও অবরুদ্ধ সিয়ামের জন্য এক আশীর্বাদ হয়ে উঠে। ১৫০৯ সালে লোপেজ ডা সেকুরার নেতৃত্বে পর্তুগীজ নৌবহর মালাক্কা প্রণালীতে পৌঁছে। তৎকালীন মালাক্কার শাসক সুলতান মাহমুদ শাহ সম্প্রতি ভারতে ঘটিত মুসলিম- পর্তুগীজ দ্বন্দ্বের সূত্রে পর্তুগীজ বহরটিকে আক্রমণ করে তাড়িয়ে দেয়। ১৫১১ সালে ভাইসরয় আলফোন্‌সো ডা'আলবুকার্ক- এর নেতৃত্বে ভারতের কোচিন থেকে আরেকটি পর্তুগীজ বহর মালাক্কায় এলে পুনরায় দ্বন্দ্ব শুরু হয়। চল্লিশ দিন যুদ্ধের পর ২৪ আগস্ট পর্তুগীজ বাহিনীর হাতে মালাক্কার পতন ঘটে এবং সুলতান মাহমুদ শাহ মালাক্কা থেকে পালিয়ে যান। পরবর্তী বছর ও দশকগুলোতে পর্তুগীজ ও মুসলিম বাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী লড়াই চলতে থাকে। পর্তুগীজদের দ্বারা মালাক্কা সুলতানাতের এ বিহ্বলতা ও পরিণামে অবলুপ্তি সিয়াম রাজ্যকে মুসলিম শাসকদের হাতে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করে। সপ্তদশ শতকে শ্যামের শাসকরা সমুদ্র ভ্রমণকারী পর্তুগীজ ও ডাচ (হল্যান্ড) শক্তির সাথে মিত্রতা স্থাপন করলে তারা মুসলিম আক্রমণের হুমকী প্রতিরোধে সফলকাম হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সিয়াম তার হারানো ভূখণ্ড ফিরে পেতে প্রতিআক্রমণ চালায়। তারা পতনোন্মুখ মুসলিম সুলতানাত পাট্টানি অধিকার করে শ্যাম রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করে।

ফিলিপিনে ইসলামের বিস্তার: ফিলিপিনের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল মিন্দানাও ও সুলু হলো আরেকটি দৃষ্টান্ত যেখানে বণিকদের দ্বারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলামের প্রসার ঘটেছিল বলে মুসলিম ও অনেক পণ্ডিতরা দাবী করেন। মুসলিমরা প্রশ্ন তোলেন: কোন্‌মুসলিম বাহিনী তলোয়ার দ্বারা ইসলাম বিস্তারের জন্য ফিলিপিনে গিয়েছিল? তারা দাবী করেন: ভারত ও মালয় উপদ্বীপ থেকে আগত সূফী ও মুসলিম বণিকরাই শান্তিপূর্ণ মিশনারী কার্যক্রমের মাধ্যমে সেখানে ইসলামের বিস্তার ঘটায়।

জানা যায়, ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে ভারত থেকে আগত আরব বণিক মাখদুম করিমের মাধ্যমে দক্ষিণ ফিলিপিনের সুলু দ্বীপপুঞ্জে প্রথম ইসলাম আনীত হয়। তিনি সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে একটি মসজিদ

প্রতিষ্ঠা করেন, যা ঐ অঞ্চলের সবচেয়ে প্রাচীন মসজিদ। কিন্তু মালয় উপদ্বীপ ও ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে মালাক্কা সুলতানাতের রাজনৈতিক উত্থান না হওয়া পর্যন্ত ফিলিপিনের সর্বপ্রাণবাদী বিধর্মীরা ব্যাপকহারে ইসলামে দীক্ষিত হয়নি। মালয়েশিয়ার জোহর'এ জন্মগ্রহণকারী এক আরব যোদ্ধা শরীফুল হাশেম সৈয়দ আবু বকর এক বাহিনী নিয়ে ১৪৫০ সালে বোর্ণিও থেকে পাল তুলে সুলু দ্বীপে আসেন ও সুলু সুলতানাত প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর ইসলামী রাজনৈতিক শক্তিবলে সেখানকার সর্বপ্রাণবাদীদেরকে ইসলামে ধর্মান্তর অতিশয় সাগ্রহে শুরু হয়ে যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বোর্ণিও সুলতানাতের পৃষ্ঠপোষকতায় সুলু থেকে অগ্রসরমান জিহাদ ভিসিয়াস (মধ্য ফিলিপিন)- এর প্রায় সবটুকু, লুজন (উত্তর ফিলিপিন)- এর অর্ধাংশ ও দক্ষিণের মিন্দানাও দ্বীপসমূহ মুসলিম নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। অবিরাম বিধর্মী ভূখণ্ডে প্রবেশ করে মুসলিম জিহাদীরা আতঙ্কিত সর্বপ্রাণবাদী জনগণের মধ্যে ইসলামের বিস্তার তীব্রতর করে। মুসলিম ধর্মযোদ্ধাদের পথ ধরে ১৫৬৫ সালের মধ্যে ইসলাম সুলু থেকে মিন্দানাও পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে ম্যানিলা পৌঁছে যায়।

স্থানীয় ফিলিপিনোরা ছোট ছোট বারাঙ্গীতে (গ্রাম বা উপজাতীয় সম্প্রদায় ভিত্তিক দল) সংগঠিত হয়ে সুসংগঠিত মুসলিম হানাদারদের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্বল প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। ১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনীয় উপনিবেশীরা ফিলিপিনের সেবু দ্বীপে এসে পৌঁছে। সেখান থেকে তারা ধীরে ধীরে ফিলিপিনের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ সম্প্রসারণ করলে অবশেষে ইসলামের বিস্তার থেমে যায়। স্পেনীয়রা যখন মুসলিম- নিয়ন্ত্রিত দক্ষিণ ফিলিপিনো দ্বীপগুলোর উপর তাদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সম্প্রসারণে ব্রতী হয়, তখন মুসলিম যোদ্ধাদের হুমকি ও নিষ্ঠুরতার শিকার সর্বপ্রাণবাদী জনগণ এ নতুন সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে তেমন কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলে নি। কিন্তু মুসলিম- অধ্যুষিত দ্বীপগুলোতে স্পেনীয়রা প্রচণ্ড ও সুদীর্ঘ প্রতিরোধের মুখে পড়ে।[176] স্থানীয় শক্তিগুলো স্পেনীয়দের সাথে মিত্রতা করে মুসলিম অধ্যুষিত দ্বীপগুলো কব্জা করার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়।

---

[176]. Pipes (1983), p. 266

যাহোক, স্পেনীয় দখলদাররা কিছু কিছু এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম দখলকারীদেরকে পিছনে হটে যেতে বাধ্য করে এবং ইসলামের আরো ভূখণ্ড দখল ও বিস্তার রুদ্ধ করে দেয়। পুরোপুরি ইসলামী করণকৃত মিন্দানাও ও সুলু দ্বীপপুঞ্জ মুসলিম নিয়ন্ত্রণে থেকে যায় এবং আজও তা ইসলামী রয়ে গেছে।

দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ায় ধর্মান্তর পদ্ধতি

এটা বিতর্কাতীত যে, দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ায় মুসলিমরা প্রথমে বণিকরূপে এসে বন্দর নগরীগুলোতে স্থানীয় জনগণের পাশে বসতি গড়ে তোলে। স্থানীয় সহনশীল ও উদার সংস্কৃতির সুযোগ নিয়ে তারা বাধাহীনভাবে সেখানকার অবিশ্বাসী নারীদেরকে বিয়ে করে। তাদের এ মিশ্র- বিয়ের জাতকরা হয় মুসলিম। এরূপ মিশ্র- বিয়েতে এমনকি ক্ষমতাধর রাজা পরমেশ্বরও তার নিজের ধর্ম ধরে রাখতে পারেন নি, যদিও তার তন্বী উপপত্নী ছিল অর্ধ- মুসলিম, অর্ধ- ইন্দোনেশীয়। দশম শতাব্দীর গোড়ার দিকে দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ায় প্রধানত পুরুষ মুসলিম বণিকরা এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার পর মূলত মিশ্র- বিয়ের মাধ্যমে সন্তানের জন্মই মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান উৎস ছিল বলে মনে হয়। সে সময় কিছু চাকর- বাকর বা কর্মচারী, যাদেরকে মুসলিম বণিকরা নিজস্ব ব্যবসার কাজে নিয়োজিত করত, তাদের কেউ কেউ ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়ে থাকতে পারে, কেননা বিধর্মীদের প্রতি মুসলিমদের তীব্র ঘৃণা বা বিরূপ মনোভাবের প্রেক্ষিতে এ ধর্মান্তর দু'পক্ষের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়ক ছিল। অধিকন্তু ইসলামে এক পুরুষের চার- চারটি স্ত্রী, তাদের সাময়িক বিবাহবন্ধনে (মুতা বিবাহ)[177] আবদ্ধ হওয়া ও অসংখ্য উপপত্নী (যৌনদাসী) রাখার ধর্মীয় অনুমোদনও মুসলিম জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধিতে অবশ্যই সহায়ক হয়েছিল।

দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ায় মুসলিম বসতির প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলামের তথাকথিত উচ্চমানের বার্তার কারণে খুব বেশী মানুষ ধর্মান্তরিত হয়নি। মুসলিমদের স্থায়ী বসবাস শুরুর প্রায় চারশ বছর পর ১২৯০- র দশকে উত্তর সুমাত্রায় মাত্র দু'টো ছোট মুসলিম নগর- রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। রাজা পরমেশ্বর ধর্মান্তরিত হয়ে মালাক্কায় একটি ইসলামীক

---

[177]. It is said that the Pasai damsel, presented to Parameswara, was born of a *mut'ah* marriage.

সুলতানাত প্রতিষ্ঠার পর ইসলাম ক্ষিপ্রগতিতে বিস্তার লাভ করে মালয় উপদ্বীপ, ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ, ফিলিপিন ও দক্ষিণ থাইল্যান্ড বিজয়ের মাধ্যমে। মালাক্কা সুলতানাত পর্তুগীজদের আগমনের পূর্বে মাত্র এক শতাব্দীর কিছুটা বেশী সময় মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। আর এ স্বল্প সময়ের মধ্যেই বিজিত জনগণের বিপুল অংশ মুসলিম হয়ে গিয়েছিল।

দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ার অন্যথায় প্রতিরোধী বিধর্মীরা মুসলিম রাজনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠার পর দ্রুত ধর্মান্তরিত হয় কী কারণে?

রিচার্ড ইটন ও অ্যন্টনি জন্সসহ অনেক ইতিহাসবিদের মতে, এবার আসে প্রধানত ভারত থেকে আগত সূফীদের শান্তিপূর্ণভাবে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তখন্ত পর্যন্ত- প্রতিরোধী অবিশ্বাসীদের মাঝে দ্রুত ইসলাম প্রচারের পালা। কিন্তু ইটনের বিবৃতিতেও কোনো সুস্পষ্ট সাক্ষ্য- প্রমাণ নেই যাতে বলা যেতে পারে যে, সূফীরাই অবিশ্বাসীদেরকে ইসলামে ধর্মান্তর করে। কিংবা ধর্মান্তরে তারা কী পন্থা ব্যবহার করেছিল তারও কোন ইঙ্গিত নেই। ইটনের মতে, সেখানে কেবলমাত্র ‘অতি প্রভাবশালী জাভানি সূফী (কিয়ায়ি)’- দের সম্পর্কে ‘কাল্পনিক রূপকথার’ মত কিছু বিচ্ছিন্ন লেখার খোঁজ পাওয়া যায়।[178] এরূপ বাস্তবতা- বিবর্জিত ও প্রমাণহীন কাহিনীর ভিত্তিতে এসব বিজ্ঞ পণ্ডিতরা তরিৎ দাবী করে বসেন যে, সেথায় ধর্মান্তর ছিল শান্তিপূর্ণ প্রকৃতির, যার কৃতিত্ব সূফীদের প্রাপ্য। এক অতিশয় আগ্রহপূর্ণ দাবীতে সৈয়দ নাগুইব আল- আত্তাস লিখেন: ‘আমি বিশ্বাস করতে চাই যে, প্রকৃতপক্ষে সূফীরাই ইসলামের বিস্তার ঘটান ও জনগণের মাঝে ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। মালয়ের ক্ষেত্রে আমি প্রায় নিশ্চিত যে, ইসলাম সূফীদের দ্বারাই বিস্তৃত হয়।’ তার এ দাবী আদৌ কোন প্রমাণের উপর ভিত্তিশীল নয়, যা স্বীকার করে তিনি দ্রুত যোগ করেন: ‘এই মতবাদের সমর্থনে যদিও কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই।’[179] ভারতে এ ধরণের সূফী রূপকথা বা কাল্পনিক গল্প যত্রতত্র ছড়িয়ে রয়েছে, যার প্রায় সবই সম্ভবত বানানো গল্প। আগেই বর্ণিত হয়েছে যে, ভারতের বিধর্মীদেরকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ধর্মান্তরে সূফীরা কতটা

---

178. Eaton (2000), p. 39

179. Al-Attas SN (1963) *Some Aspects of Sufism as Understood and Practice Among the Malays*, S Gordon ed., Malaysian Sociological Research Institute Ltd., Singapore, p. 21

অসফল ছিল; এবং কাশ্মীরে যখন তারা সফল হয়, তা কতটা ভয়ঙ্কর ছিল। উইদিয়োতমোদিয়োর মতে, ইবনে বতুতা সামুদ্রা সুলতানাতের মুসলিম শাসককে তার ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে ধর্ম পালন করতে দেখতে পান। সেই শাসক ছিলেন ইমাম শাফীর 'মাযহাব' বা তরিকার ভক্ত।[180]

দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ার মুসলিমরা শা'ফী আইন গ্রহণ করেছিল। এ আইন শাস্ত্রে ধর্মান্তর বা মৃত্যুর যে কোন একটি বেছে নেওয়ার রায় পৌত্তলিকদের জন্য, যে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল ইসলাম- পূর্ব দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী হিন্দু, বৌদ্ধ ও সর্বপ্রাণবাদীরা। ইবনে বতুতার বর্ণনায় দেখা যায়, সামুদ্রার মত ক্ষুদ্র নগর- রাজ্যে মুসলিমরা রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের সাথে সাথে আশপাশের বিধর্মীদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর ও নির্মম জিহাদ শুরু করে দেয়।

পরমেশ্বরের ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার ঠিক চার বছর পর চীনা মুসলিম মা হুয়ান তাকে 'একজন অত্যন্ত কট্টর ধর্মবিশ্বাসী' রূপে দেখতে পান। তার অর্থ: ইতিমধ্যে তিনি তার সুলতানাতে শাফি আইন কঠোরতার সাথে প্রয়োগ করছিলেন। এ থেকে ধারণা পাওয়া যেতে পারে যে, সুলতান ইস্কান্দার ও তার পরবর্তী বংশধর শাসকরা অমুসলিম প্রজাদের উপর কিরূপ নীতি প্রয়োগ করেছিল। অনেক বেশী শক্তিশালী মালাক্কা সুলতানাত বিধর্মীদের উপর অধিকতর ভয়ঙ্কর ও মারাত্মক শক্তি ও নিষ্ঠুরতা প্রয়োগ না করলেও সামুদ্রার মতো ক্ষুদ্র সুলতানাতের পার্শ্ববর্তী বিধর্মীদের উপর নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত মালাক্কা সুলতানাতের জন্য অনুকরণীয় মডেল বা আদর্শ হিসেবে কাজ করে থাকতে পারে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কীভাবে মুসলিম শাসিত মালয় উপদ্বীপ ও ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে ইসলাম বিস্তার লাভ করে তার কিছুটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে তৎকালে গুজরাটে ঘটিত পাশাপাশি ধর্মান্তর থেকে, যার সঙ্গে দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ার মুসলিম সুলতানাতের ছিল ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক যোগাযোগ। গুজরাট ছিল সে সময়ে মালয় ও ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে আগত মুসলিম বণিক ও সূফীদের এক উল্লেখযোগ্য উৎসস্থল। তখন ভারতের, বিশেষ করে গুজরাটের,

180. Widjojoatmodjo, p. 49

সূফীরা ধর্মান্তরে যে ভূমিকা পালন করছিলেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সুলতানাতের সূফীদের অনুসরণের জন্য সম্ভবত তা মডেল হিসেবে কাজ করেছে। বাণিজ্যের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বন্দর-নগরীগুলোর সাথে তখন দক্ষিণ ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলের সূফীদেরও একই ধরনের কিংবা অধিককতর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বাস্তবতঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যেহেতু দক্ষিণ-ভারতের মতো একই শাফী আইন অনুসরণ করে, সুতরাং সেকালের দক্ষিণ ভারতের সূফী কর্তৃক বিধর্মীদেরকে ধর্মান্তরের পদ্ধতি খুব সম্ভব মালয় ও ইন্দোনেশীয় সূফীদের ধর্মান্তরে মডেল হিসেবে কাজ করেছে। ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, কীভাবে হিন্দুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য ভারতের উপকূলীয় শহর মা'বার থেকে পীর মা'বারি বিজাপুরে এসেছিলেন এবং কীভাবে তিনি এ অঞ্চলকে ইসলামীকরণে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও ব্রাহ্মণদেরকে পৈতৃক ভিটামাটি বা মাতৃভূমি থেকে নির্বাসিত করেছিলেন।

ভারতের তুলনায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মুসলিম শাসক, সূফী ও উলেমাদের বিধর্মীদের প্রতি অসহিষ্ণুতা সম্ভবত সর্বক্ষেত্রে অধিক মাত্রার ছিল (সম্ভবত দক্ষিণ ভারত বাদে)। কারণ এ অঞ্চলে প্রচলিত শা'ফী আইন বহুঈশ্বরবাদীদের জন্য মৃত্যু কিংবা ধর্মান্তরের রায় দেয়; অপরদিকে ভারতে অধিকতর সহনশীল হানাফী আইনের চর্চা তাদেরকে অধিক সুবিধাপ্রাপ্ত 'জিম্মি' প্রজার মর্যাদা দেয়। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম বিজিত ভূখণ্ডে বিধর্মীদের প্রতি আচরণে শা'ফী আইন অত্যন্ত কঠোর ও নির্মম। কুরআনের ৯:২ নং আয়াত - 'সমগ্র দেশে তোমরা চার মাস খুশীমতো সামনে বা পিছনে যেতে পার, কিন্তু জেনে রেখো, (মিথ্যাচার দিয়ে) তোমরা আল্লাহকে প্রতারিত করতে পারবে না। যারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্ তাদেরকে লজ্জায় ঢেকে দেবে' - এর ভিত্তিতে শা'ফী (হাম্বালিও) আইন অবিশ্বাসীদেরকে ধর্মান্তরের জন্য ঠিক চার মাস সময় দেয়; অন্যান্য মাযহাব সময় দেয় এক বছর পর্যন্ত।[181] আর হানাফী মাযহাম পৌত্তলিকদেরকে সে বাধ্যকতা থেকে পুরোপুরি রেহাই দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসার পর মুসলিমরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অন্যথায় ইসলাম বিমুখী বা প্রতিরোধী বিধর্মীদের ইসলামে

---

[181]. Peters R (1979) Islam and Colonialism: The Doctrine of Jihad in Modern History, Mouton Publishers, The Hague, p. 31

ধর্মান্তর ভারতের তুলনায় অনেক কম সময়ে অথচ অনেক বেশী সম্পূর্ণরূপে সাধিত করেছিল। ১৫১১ সালে পর্তুগীজরা এসে মালাক্কা সুলতানাত বিলুপ্ত করার আগে তা টিকে ছিল মাত্র এক শতাব্দী কাল। এসব দৃষ্টান্ত ঈঙ্গিত করে যে, এ অঞ্চলের হিন্দু- বৌদ্ধ- সর্বপ্রাণবাদী বিধর্মীদেরকে ইসলামে ধর্মান্তর করতে অধিকতর জোরজবরদস্তি প্রয়োগ করা হয়েছিল।

ইটন লিখেছেন, দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ার 'অত্যন্ত প্রভাবশালী সূফীরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুলতানকে ক্ষমতায় বসতে সহযোগিতা করতে, আবার কখনো গ্রাম্য জনগণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের প্রভাব খাটিয়ে সুলতানের ক্ষমতা ক্ষুণ্ন করতে দেখা যায়।'[182] এসব দৃষ্টান্তই ড. ইটনের এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য যথেষ্ট যে, ঐসব জনপ্রিয় বিপ্লবী বীর সূফীরা একটা অলৌকিক, আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনে উদ্যোগী হয়ে 'হিন্দু- বৌদ্ধ ও স্থানীয় জাভানীজ ধারণার' সমন্বয়ে একটা মিশ্র ইসলাম সৃষ্টি করে, যা 'হিন্দু জাভা'কে 'মুসলিম জাভা'য় রূপান্তরিত করে - এবং অবশ্যই তা ঘটে এক মানবিক ও শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

ইটন উপেক্ষা করেছেন বা লক্ষ্য করেন নি যে, শুধুমাত্র জাভা নয়, সূফীরা একই রকম রাজনৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত হয়েছেন সর্বত্রই। কখনো তারা অবিশ্বাসীদেরকে নির্যাতন্তনিপীড়ন করতে শাসকদের সাথে হাত মিলিয়েছেন; আবার কখনো তারা মুসলিম জনতার সাথে যুক্ত হয়ে মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছেন, বিশেষত যেসব মুসলিম শাসক অমুসলিমদের প্রতি সহনশীল ছিল, তাদের বিরুদ্ধে। বার্নার্ড লুইস লিখেছেন: মুসলিম শাসকরা 'সূফী দরবেশদের ভয়ঙ্কর রুদ্ধ শক্তিকে ভয় পেত, যা তারা খেয়াল- খুশী মত নিয়ন্ত্রণ বা ছেড়ে দিতে পারত। সেল্‌জুক ও অটোমান সুলতানদের আমলে দরবেশ বিদ্রোহ হয়েছিল, যা তখনকার প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রযন্ত্র বা কাঠামোর প্রতি প্রচণ্ড হুমকী হয়ে দাঁড়িয়েছিল।'[183]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সূফীবাদের বিকাশ ঘটেছিল আব্বাসীয় শাসকদের পথবিচ্যুতির বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়ারূপে। কারণ তারা অনৈসলামিক পারস্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা ও ইসলামের

---

[182]. Eaton (2000), p. 28
[183]. Lewis B (2000) *The Middle East*, Phoenix, London, p. 241

লঙ্ঘনে নৈতিক শিথিলতা প্রদর্শন করছিলেন। কাশ্মীর ও গুজরাটে সূফীরা হিন্দুদের উপর নির্যাতন চালানোর জন্য শাসকদের সাথে যোগ দেন। সূফী সাধক সাইয়িদ আলী হামদানী ইসলামের নীতি অনুযায়ী হিন্দুদের উপর নির্যাতনে কাশ্মীরের সুলতানকে প্ররোচিত করতে ব্যর্থ হলে প্রতিবাদে কাশ্মীর ত্যাগ করেন। অমুসলিমদের প্রতি সম্রাট আকবরের সহনশীল নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সূফী সাধক শেখ আহমদ সিরহিন্দি সাধারণ মুসলিম জনগণ ও উলেমাদের সাথে হাত মেলান।

ধার্মিক মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে সূফীদের যোগ দেওয়ার ঘটনা খুবই অপ্রতুল। এরকম একটা ঘটনা হলো, সম্রাট আওরঙ্গজেবের স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বুদ্দু শাহ নামক এক ক্ষুদে সূফী সাধক তার ৭০০ ভক্ত নিয়ে গুরু গোবিন্দ সিং-এর সাথে বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তার এ মিত্রতায় গোবিন্দ সিং- এর বাহিনীর হিন্দু ও শিখ সেনাদের মনে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার কোনো ছাপ ফেলতে পারেনি। মোটকথা, সূফীরা সাধারণত শাসকদের সাথে আঁতাত গড়ে তোলেন বিশেষ করে অমুসলিম প্রজাদের উপর ইসলামের নিষ্ঠুর ও নিষ্পেষণমূলক আইন কার্যকর করার জন্য; তারা মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে জনগণের সাথে হাত মিলিয়েছেন, যখন শাসকরা ইসলামের আইন প্রয়োগে শিথিলতা, বিশেষত বিধর্মীদের উপর নির্যাতন্তনিপীড়ন চালাতে ব্যর্থ হন বা অস্বীকৃতি জানান। শাসকদের বিরুদ্ধে কিংবা পক্ষে জাভার সূফীদের রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িত হওয়ার কারণ অন্যান্য অঞ্চলে ঘটিত কারণ থেকে ভিন্ন হওয়ার কথা নয়। আর তারা কখনো নির্যাতিত অবিশ্বাসীদের পক্ষে যোগ দিয়ে থাকলেও, এটা বিশ্বাস করার কোনোই কারণ নেই যে, সে মিত্রতা বিধর্মীদেরকে ব্যাপক হারে ইসলামে আকৃষ্ট করে।

ইসলামের ধর্মযোদ্ধারা বিধর্মীদেরকে ইসলামে অনুগত বা আনয়নের জন্য পরিচালিত যুদ্ধাভিযানে যে নির্মমতা প্রদর্শন করেছে, তা ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ার মুসলিম শাসকদের দ্বারা সংঘটিত জিহাদ অভিযান বা জিহাদী আক্রমণেও আতঙ্ক ও নিষ্ঠুরতা কোনো অংশে কম ছিল না। প্রফেসর অ্যান' নি রীড দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ায় ‘ইসলামকে অনেক বেশী রাজনৈতিক ও সামাজিক সমতাবাদী’ রূপে দেখেন। অথচ তিনিই উল্লেখ করেন: ‘১৬১৮-২৪

সালের মধ্যে মুসলিম শাসকদের দ্বারা আচেহ অভিযানের ফলে মালয় তার অনেক জনসংখ্যা হারায়।'[184] একইভাবে মাতারাম- এর সুলতান অগুঙ, যিনি দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ার এক মহান মুসলিম শাসক হিসেবে খ্যাত, তার ৮০, ০০০ সেনা সুরাবায়া ও তার নিকটবর্তী শহরসমূহ পাঁচ বছর ধরে (১৬২০- ২৫) অবরোধ করে রাখে। সে অবরোধে তার বাহিনী সমস্ত শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করে দেয়, এমনকি পানিতে বিষ প্রয়োগ ও নদীতে বাঁধ দিয়ে শহরমুখী পানি প্রবাহ বন্ধ করে দেয়। এ অভিযানের ফলশ্রুতিতে সেখানকার ৫০, ০০০ থেকে ৬০, ০০০ বাসিন্দার মাত্র ৫০০ জনের মত অবশিষ্ট থাকে। বাকী সবাই হয় মারা যায় অথবা চরম কষ্ট ও দুর্ভিক্ষ থেকে রেহাই পেতে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।[185]

তদুপরি দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ার মুসলিম শাসকদের যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে জোরপূর্বক গণহারে ধর্মান্তরিত করা। ষোড়শ শতাব্দীতে সুলাওয়েসির মাকাসারবাসীরা ইসলাম প্রতিরোধীদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিল। বুলো- বুলো (সিন্দজাই অঞ্চল)- র স্থানীয় উপাখ্যানে বলা হয়েছে, মাকাসার- এর মুসলিম শাসক ইসলাম গ্রহণের জন্য অবাধ্য মাকাসারবাসীদেরকে আমন্ত্রণ জানান ও তা অস্বীকার করলে যুদ্ধের হুমকী দেন। এক বিশিষ্ট মাকাসার নেতা 'অবজ্ঞা বা ঔদ্ধত্যের সাথে ঘোষণা করেন যে, বুলো- বুলোর জঙ্গলে খাবার জন্য যতদিন শুকর পাওয়া যাবে, ততদিন নদীতে যদি রক্তের বন্যাও বয়ে যায়, তবুও তিনি ইসলামের কাছে নতি স্বীকার করবেন না।' উপাখ্যানে আরো বলা হয়েছে, 'অলৌকিকভাবে সে রাতেই সমস্ত শুকর অদৃশ্য হয়ে যায়; সুতরাং সে নেতা ও তার সমস্ত লোকজন ইসলামে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হয়।'[186] এ ঘটনা একদিকে এ অঞ্চলের লোকদের মাঝে তথাকথিত ইসলামের উৎকৃষ্ট বার্তার প্রতি চরম বিদ্বেষ ও প্রতিরোধ প্রতীয়মান করে; অন্যদিকে অলৌকিকভাবে সত্যি সত্যি শুকরগুলো গায়েব হয়ে গেল, এটা কেউ বিশ্বাস করলে, সে হবে চরম ও হাস্যকরভাবে বিশ্বাসপ্রবণ। কিন্তু বাস্তবে কী মাকাসারবাসীকে

---

[184]. Reid A (1988) *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680,* Yale University Press, New Haven, Vol. I, p. 35,18

[185]. Ibid, p. 17

[186]. Ibid, p. 35

গণহারে ইসলাম গ্রহণে প্রবৃত্ত করেছিল: নির্মম সহিংসতার হুমকী না সত্যি সত্যি যুদ্ধ?

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বানজারমাসিন (ইন্দোনেশিয়া)- এর উপাখ্যান 'হিকায়াত বানজার' মোতাবেক 'বানজারমাসিনের ইসলামীকরণ কার্যকরভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায় যখন সিংহাসনের দুই দাবীদার গৃহযুদ্ধ পরিহারের জন্য দু'জনের মাঝে একক লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।'[187] এটা পুনরায় প্রমাণ করে যে, দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ার মুসলিম শাসকরা বিজিত জনগণকে গণহারে ধর্মান্তরিত করার সুস্পষ্ট লক্ষ্যেই যুদ্ধে লিপ্ত হতেন। যখন তারা জয়লাভ করতেন, সমস্ত জনগণকে বাধ্যগতভাবে ধর্মান্তরিত হতে হত, স্বেচ্ছায় নয়। এসব উদাহরণের ভিত্তিতে এম. সি. রিকলেফ্‌স বলেন: 'জাভায় অস্ত্রের মুখে ধর্মান্তরকরণ ঘটতে পারে যখন এক মুসলিম শাসক অমুসলিম শাসককে পরাজিত করে। যার ফলশ্রুতিতে পরাজিত বীর ও তার জনগণকে সম্ভবত ইসলাম গ্রহণ করতে হয়।'[188]

দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ায় মালাক্কা ও অন্যান্য সুলতানাত তাদের ভূখণ্ড বিস্তৃতির জন্য বহু জিহাদী অভিযানে অবতীর্ণ হয়। নিঃসন্দেহে এসব যুদ্ধে তারা অগণিত বন্দীকে ক্রীতদাস হিসেবে কব্জা করে, যারা বরাবরই ইসলাম গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। মুসলিমরা ক্ষমতা লাভের পর এ অঞ্চলে ক্রীতদাসকরণ ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। পর্তুগীজরা যখন ইসলাম- শাসিত দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ায় আগমন করে, তখন মজুরীর ভিত্তিতে কাজের লোক পাওয়া তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে, কারণ সে সময় সমস্ত লোক ছিল কোন না কোন প্রভুর ক্রীতদাস। পারস্যের ইতিহাসবিদ মোহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম ১৬৮৮ সালে লিখেন: 'ক্রীতদাস ভাড়া নেয়া তাদের প্রথা। ক্রীতদাসকে তারা কিছু টাকা দেয়, যা সে তার মালিকের হাতে তুলে দেয়। তারপর তারা সে ক্রীতদাসকে ঐ দিনের জন্য তাদের ইচ্ছামত কাজে লাগায়।' একইভাবে পর্তুগীজ লেখক ইয়োয়াও দা বারোস ১৫৬৩ সালে লিখেন: 'যত গরীবই হোক না কেন, তুমি এমন কোনো স্থানীয় মালয়ীকে পাবে না, যে তার নিজের কিংবা অপর কারো জিনিস পিঠে তুলে নিবে, তার জন্য তাকে

---

[187]. Ibid, p. 124

[188]. Ricklefs MC (1979) *Six Centuries of Islamization in Java,* in N. Levtzion ed., p. 106-07

যত মজুরীই দেওয়া হোক না কেন। তাদের সমস্ত কাজ করে ক্রীতদাসরা।'[189] চীনা পরিব্রাজক হুয়াং চুং ১৫৩৭ সালে ভ্রমণকালে লিখেন: '(মালাক্কার জনগণ) বলে যে জমি থাকার চেয়ে ক্রীতদাস থাকা ভাল, কারণ প্রধানত ক্রীতদাসরাই মালিকের রক্ষক।' [190] রীড- এর মতে: '(দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ার) দাস- মালিক শ্রেণীর বণিকদের অনেক সদস্যেরই শক্ত শেকড় ছিল ইসলামী বিশ্বে, যেসব দেশে সম্পদরূপে দাসদের ব্যাপারে পরিষ্কার কতকগুলো আইন ছিল।'[191] এতে বুঝা যায় যে, মুসলিম বা আরব দেশ থেকে আগত মুসলিম বণিক ও তাদের বংশধররা দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ায় ক্রীতদাস ব্যবসায় ব্যাপকভাবে লিপ্ত হয় ও দাসপ্রথার বিস্তার ঘটায়।

ইব্‌নে বতুতার সামুদ্রা সুলতানাত সফরকালে সুলতান তাকে দুই দাস- বালিকা ও দু'জন পুরুষ চাকর উপহার দেন।[192] বতুতা মুল্‌জাওয়ার বিধর্মী শাসক, যিনি বতুতাকে তিন দিন আপ্যায়ন করেছিলেন, তার মালিকানাধীন ক্রীতদাসের কথাও উল্লেখ করেন। বতুতা বলেন, ওই শাসকের প্রতি ভালবাসার প্রতীক হিসেবে তার এক ক্রীতদাস নিজ হাতে আত্মাহুতি দেয়।[193] তার মানে, ইসলাম- পূর্ব আমলেও দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ায় দাসপ্রথার প্রচলন ছিল। রীড উল্লেখ করেছেন, থাই রাজ্যের নাগরিকদেরকে বছরের অর্ধেক সময় রাজার জন্য কাজ করতে হতো।[194] এটাও এক ধরনের দাস প্রথা বা অর্ধ- দাসপ্রথা। ইসলাম- পূর্ব দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ায় সম্ভবত শাসক ও উচ্চ কর্মচারীরাই কেবল দাস- মালিক হতে পারত, সাধারণ বণিকরা নয়। সাধারণ বণিকরা ব্যাপক হারে দাস- মালিক হতে পেরেছে মুসলিম শাসনের অধীনে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মুসলিমদের মালিকানাধীন ক্রীতদাসদেরকে সাধারণত ইসলামে ধর্মান্তরিত হতে হতো, যে বাধ্যবাধকতা পূর্বে ছিল না।

দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ায় মুসলিম শক্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অমুসলিম ভূখণ্ডে হানা বা আক্রমণ একটা বিরামহীন দৃশ্য হয়ে দাঁড়ায়।

---

[189]. Reid (1988), p. 131
[190]. Ibid, p. 129
[191]. Ibid, p. 134
[192]. Gibb, p. 275
[193]. Ibid, p. 277-78
[194]. Reid (1988), p. 132

রিকলেফ্‌স বলেন: ‘এটা ছিল প্রায় অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহে ভরপুর জাভার ইতিহাসের একটা সময়।’ [195] জনসংখ্যার একটা বড় অংশ যাদেরকে আদিম বা বর্বর বলা হয়ে থাকে, তারা পাহাড়ে বাস করতো। পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে মুসলিমরা ক্ষমতায় আসার পর পাঁচ শতাব্দীরও বেশী সময় ধরে ঐসব সর্বেশ্বরবাদী পাহাড়ী মানুষকে ক্রীতদাস বানিয়ে মালয়, সুমাত্রা ও বোর্ণিওর মুসলিম জনগণের সাথে একীভূত করার ফলে তারা প্রায় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়; এবং তাদেরকে ক্রীতদাস করা হয়েছিল আক্রমণ, বশ্যতাকর পরিশোধ ও বিশেষত শিশুদেরকে ক্রয়ের মাধ্যমে।[196] রীড আরো উল্লেখ করেন, ‘কিছু কিছু ক্ষুদ্র সুলতানাত, যেমন সুলু, বুটোন ও টিডোর প্রভৃতি এক লাভজনক ব্যবসা শুরু করে পূর্ব-ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপিনে ক্রীতদাসের জন্য হানাকারী আক্রমণ ও তাতে ধৃত মনুষ্য শিকারকে ধনী শহরগুলোতে অথবা সপ্তদশ শতকের দক্ষিণ বোর্ণিওর বর্ধমান মরিচের জমিদারীগুলোতে বিক্রির মাধ্যমে।’ [197]

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসলিমদের যুদ্ধগুলোতে কখনো কখনো ক্রীতদাসকরণ প্রক্রিয়া ছিল সম্পূর্ণ: গোটা জনগোষ্ঠীকেই দাস বানিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হতো। উদাহরণস্বরূপ, টমাস আইভি ১৬৩৪ সালে জানান: এক ইংরেজ ব্যবসায়ী দল মরিচ ক্রয়ের জন্য একদা সমৃদ্ধশীল সুমাত্রা দ্বীপের শহর ইন্দেরাগিরির খুঁজে দুই দিন ধরে ঘোরাঘুরি করে ব্যর্থ হয়। শহরটির কোনো অস্তিত্ব বা চিহ্নই পাওয়া যায় না। পরে তারা জানতে পায় যে, ছয় বছর আগে আচেহ্‌র মুসলিমদের এক আক্রমণে পরাজিত হওয়ার ফলে শহরের সমস্ত বাসিন্দাকে তিন দিনের উজান পথের একটা স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।[198] পৌত্তলিক শ্রেণীর হিন্দু, বৌদ্ধ ও সর্বপ্রাণবাদী ধর্মের এসব দাসকৃত জনগণকে তাদের শাফী তরীকার মুসলিম কব্জাকারীরা স্বাভাবিকভাবেই নিজস্ব ধর্ম ধরে রাখতে দেয় নি।

যদিও স্পেনীয়রা ফিলিপিন দখল করে ও দক্ষিণের মুসলিম নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের উপর চাপ অব্যাহত রাখে, তথাপি মোরো মুসলিমরা দাস

---

195. Ricklefs in N. Levtzion ed., p. 106
196. Reid (1988), p. 133
197. Ibid
198. Ibid, p. 122-23

ধরার জন্য স্পেনঅধিকৃত ভূখণ্ডগুলোতে লাগাতার হানাকারী আক্রমণের মাধ্যমে জিহাদ চাঙ্গা রাখে। ১৬৩৭ সালে ম্যানিলার আর্চবিশপ লিখেন: তারা গত ৩০ বছর ধরে প্রতিবছর গড়ে ১০ হাজার ক্যাথলিক ফিলিপিনোকে দাস বানিয়েছে। হিসাব করে দেখা গেছে যে, ১৬৬৫ সাল থেকে শুরু করে ফিলিপিনে স্পেনীয়দের শাসনের প্রথম দুই শতাব্দীতে মোরো জিহাদীরা প্রায় দুই মিলিয়ন (কুড়ি লক্ষ) অমুসলিমকে দাসত্বের শৃঙ্খল পরায়।[199] অতঃপর স্পেনীয় ও পর্তুগীজ নৌ- পাহারা উত্তরোত্তর কার্যকর হয়ে উঠে মোরো জিহাদী আক্রমণ রুখতে। তথাপি এক রক্ষণশীল হিসাব মতে, ১৭৭০ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে দক্ষিণ ফিলিপিনো মুসলিমরা দাসকরণের মাধ্যমে ২০০, ০০০ থেকে ৩০০, ০০০ বিধর্মীকে সুলু সুলতানাতে আনে।[200] উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকেও মালয় উপদ্বীপ ও ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে দাসকরণ বিদ্যমান ছিল ব্যাপকহারে: ১৮৭৯ সালে পেরাক সুলতানাতে মোট জনসংখ্যার ছয় শতাংশ ছিল দাস; ১৮৬০- এর দশকে পশ্চিম সুমাত্রার পূর্বাঞ্চলসমূহে জনসংখ্যার এক- তৃতীয়াংশ দাস ছিল; ১৮৮০- র দশকে উত্তর সুলাওয়েশীর মুসলিম শাসিত অঞ্চলে ৩০ শতাংশ ও উত্তর বোর্ণিওতে দুই- তৃতীয়াংশ কিংবা তারও বেশী লোক ছিল দাস।[201] এখানে এটা বিবেচ্য যে, ১৮১৫ সালে ইউরোপ দাসপ্রথা নিষিদ্ধ করে ও মুসলিম বিশ্বকে সেপথ অনুসরণের জন্য চাপ দিতে থাকে এবং যখন সম্ভব বাহুবলের মাধ্যমে দাস- বাণিজ্য রুখতে হস্তক্ষেপ করে।

এরূপ ব্যাপকহারে দাসকরণের দৃষ্টান্ত পাঠককে ধারণা দিবে দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ায় কীভাবে ধর্মান্তর ঘটেছিল সে সম্পর্কে। জোরপূর্বক পরাজিত জনগণকে ধর্মান্তরিত করার সুস্পষ্ট লক্ষ্যে মুসলিম শাসকগণ যুদ্ধে লিপ্ত হতেন। অধিকন্তু মুসলিমদের বিরামহীন হানাকারী আক্রমণ, ইসলামী শাসনাধীনে বিধর্মী প্রজাদের প্রতি ভয়াবহ সামাজিক অমর্যাদা ও

---

199. Reid A (1983) Introduction: Slavery and Bondage in Southeast Asian History, in Slavery Bondage and Dependency in Southeast Asia, Anthony Reid ed., University of Queensland Press, St. Lucia, p. 32

200. Warren JF (1981) The Sulu Jone, 1968-1898: The Dynamics of the External Slave Trade, Slavery and Ethnicity in the Transformation of a Southeast Asian Maritime State, Singapore University Press, Singapore, p. 208.

201. Clarence-Smith WG (2006) *Islam and the Abolition of Slavery*, Oxford University Press, New York, p. 15-16

ভোগানি- , এবং খারাজ, জিজিয়া ও অন্যান্য দুর্বহ করের বোঝা নিঃসন্দেহে তাদের উপর ইসলাম গ্রহণের বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেয়। দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ার মুসলিম শাসকরা বিধর্মী জনগণের মাঝে কতটা সন্ত্রাস বা আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল তা অনুমান করা যায় ডাচ জেনারেল কোহেনের সাক্ষ্য থেকে (১৬১৫)। লোকেরা তাকে জানায়: 'বান্তেনের পান্জোরানরা কোনো স্পেনীয়, হল্যাণ্ডার বা ইংরেজকে ভয় পায় না, কিন্তু ভয় পায় কেবলমাত্র মাতারামকে (এর মুসলিম শাসককে)।' তারা বলে: 'মাতারামের কাছ থেকে কেউ পালাতে পারে না। কিন্তু অন্যদের হাত থেকে বাঁচতে গোটা পাহাড়টাই আমাদের জন্য যথেষ্ট, কেননা তারা তাদের জাহাজ নিয়ে আমাদেরকে পিছু ধাওয়া করতে পারে না।' [202] এরূপ বেপরোয়া বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে মুসলিম ধর্মপ্রচারক সূফী ও উলেমারা সেসব নির্যাতিত, নিগৃহীত, অসম্মানিত, নিঃস্ব ও আতঙ্কিত বিধর্মীদেরকে ধর্মান্তরে কিছুটা অবদান রেখে থাকতে পারেন। কিন্তু সেসব ধর্মান্তরের প্রভাব ছিল সম্ভবত খুবই গৌণ, কেননা 'চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রায় কোন রকম মুসলিম মিশনারী কর্মকাণ্ড দেখা যায় নি।'[203] ইটনের মত ইতিহাসবিদদের উচিত অস্পষ্ট ও অবাস্তব ঐতিহাসিক কল্পকাহিনীর ভিত্তিতে ইসলামে ধর্মান্তরের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে এ সত্যটি অনুধাবন করা। তার অর্থ দাঁড়ায়: সেখানে সুসংগঠিত কোনো মিশনারী কার্যক্রম ছিল প্রায় অনুপস্থিত (ভারতের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা), হোক তা সূফীদের দ্বারা কিংবা উলেমাদের। সুতরাং উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে ধর্মান্তরের ওসব ঘটনা ছিল নেহাৎই নগণ্য। অবশ্যই ধর্মান্তর সাধিত হয়েছিল প্রধানত রাষ্টযন্ত্রের প্রচেষ্টায়: তলোয়ারের ডগা, ব্যাপকহারে ক্রীতদাসকরণ ও অন্যান্য জবরদস্তিমূলক বাধ্যকতার মাধ্যমে, যেমনটা ঘটেছিল ভারতে।

মুসলিমরা যখন দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে, তখন স্পষ্টতই তারা মিশ্র বিয়ে বা ব্যবসায়িক সম্পর্কের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে স্বাধীনভাবে ইসলামে ধর্মান্তরিত করতে পারত। মুসলিমরা কখনো তাদের সহধর্মীদেরকে ইসলাম ত্যাগের অনুমতি দেয়

---

[202]. Reid (1988), p. 122

[203]. Van Nieuwenhuijze CAO (1958) *Aspects of Islam in Post-Colonial Indonesia,* W. van Hoeve Ltd., The Hague, p. 35

না, অথচ এখানে ইসলাম গ্রহণকারী অবিশ্বাসী কিংবা তাদের ইসলামে প্ররোচনাকারী মুসলিমরা স্বভাবত সহনশীল স্থানীয় লোকদের হাতে কোনো রকম নির্যাতনের মুখোমুখি হয় নি। ইসলামের বার্তায় বড় কোন আবেদন থাকলে এরূপ একটি সহায়ক পরিবেশে মুসলিম বিজয়ের পূর্বের সূফী বা বণিকদের উদ্বুদ্ধকরণমূলক ইসলাম প্রচার অন্তত সেরূপ সফলতা পেত, যেমনটি পায় শক্তিবলে অঞ্চলটির মুসলিম কর্তৃক বিজয়ের পর। প্রকৃতপক্ষে মুসলিমদের যুদ্ধ মারফত অঞ্চলটি বিজয়ের পূর্বে প্রচারের মাধ্যমে ধর্মান্তর যেহেতু খুবই সামান্য বা তুচ্ছ ছিল, সুতরাং দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ায় বিধর্মীদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরিতকরণে মূলত তরবারীর মহোল্লাসই ছিল প্রাথমিক অস্ত্র।
ভারতের ক্ষেত্রেও একই দৃষ্টান্ত খাটে। আল- মাসুদীর লেখায় সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় যে, মুসলিম হানাদার বাহিনী পৌঁছানোর পূর্বে মুসলিম জনসংখ্যার বিস্তৃতি ঘটেছিল প্রধানত ভারতের সহনশীল সংস্কৃতির মাঝে মিশ্র বিবাহের দ্বারা সন্তান জন্মদানের মাধ্যমে। উপরোল্লিখিত আল- মাসুদীর উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যায় যে, মিশ্র বিবাহ ব্যতীত ধর্মান্তর খুবই অপ্রত্যুল ঘটনা ছিল। কিন্তু মুসলিম হানাদার বাহিনী তিনটি ধাপে ভারতে ইসলামের তরবারী আনয়নের পর - প্রথমত অষ্টম শতাব্দীর গোড়ায় মোহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক, দ্বিতীয়ত একাদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে সুলতান মাহমুদ দ্বারা ও পরিশেষে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকে সুলতান মোহাম্মদ ঘোরীর দ্বারা - ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এবং তা ঘটে মূলত নিষ্ঠুর মুসলিম আক্রমণের মুখে ভারতের স্থানীয় জনগণকে ব্যাপকহারে দাসকরণ ও অন্যান্য নানা জবরদস্তিমূলক বাধ্যকতায় ধর্মান্তরিত করার মাধ্যমে।

উপসংহার

ইতিহাসবিদ দা লেইসি ও'লিয়ারি অমুসলিমদের ইসলামে ধর্মান্তরের বিষয়ে লিখেছেন: ‘ইতিহাস এটা স্পষ্ট করে যে, ধর্মান্ধ মুসলিমদের বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া ও বিজিত জাতিসমূহকে তরবারির মুখে জোরপূর্বক ইসলামী করার কাহিনী একেবারেই কাল্পনিক ও হাস্যকর অতিকথা, যা ইতিহাসবিদরা এযাবৎ বলে এসেছেন।’ [204]

---

[204]. O'Leary DL (1923) *Islam at the Cross Roads*, E.P. Dutton and Co., New York, p. 8

ইতিহাস যদি পরবর্তী বংশধরদের জন্য রেখে যাওয়া সমসাময়িক পণ্ডিত ও লেখকদের বাস্তব তথ্যমূলক সাক্ষ্য সম্পর্কিত দলিল বা আলোচনা হয়ে থাকে, তাহলে ও'লিয়ারি সম্ভবত ইসলামের বিস্তার সম্পর্কিত এ ধারণাকে 'একেবারে কাল্পনিক ও হাস্যকর অতিকথা' বলতে পারতেন না। অবশ্য তিনি সঠিক হতেন যদি কল্পকথা বা অতিকথা বাস্তবতার সমার্থক হতো। ও'লিয়ারির মতো বহু আধুনিক মুসলিম ইতিহাসবিদ ও অনেক সমমনা, বিশেষত বাম-মার্ক্সবাদ ঘেঁষা, অমুসলিম অনুসারী রয়েছেন, যারা মনে করেন যে, সত্য উদঘাটন ও উল্লেখ করা ইতিহাস গবেষণার বিষয় নয়, বরং তা গোপন করে কুতর্ক বা স্তুতি লেখাই হলো প্রকৃত ইতিহাস। বিশেষত ইসলামের ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে এটাই প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু যারা ইসলামের ইতিহাসের অবিকৃত প্রকৃত সত্যকে উদঘাটন করতে চান - দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতে - তাদের উচিত আল-কাফি (চাচনামা), আল বিলাদুরী, আল-বেরুনী, ইব্‌নে আসির, আল-উত্‌বী, হাসান নিজামী, আমীর খসরু, জিয়াউদ্দিন বারানী, সুলতান ফিরোজ তুঘলক, সম্রাট বাবর ও জাহাঙ্গীর, বাদায়ূনি, আবুল ফজল, মোহাম্মদ ফেরিস্তা এবং আরো অনেক মধ্যযুগীয় লেখকের লেখায় ফিরে যাওয়া।

একজন স্বনামখ্যাত ফিলিস্তিনী সমাজতত্ত্ববিদ ও জাতিসংঘের শিক্ষা বিষয়ক 'রিলিফ অ্যান্ড ওয়ার্ক এজেন্সি'র উপদেষ্টা ড. আলী ঈসা ওসমান ইসলামের বিস্তার সম্পর্কে বলেন: 'ইসলামের বিস্তার ঘটে সামরিক পন্থায়। মুসলিমদের মাঝে এ ব্যাপারে কৈফিয়ত দেওয়ার একটা ঝোঁক রয়েছে এবং আমাদের সেটি করা উচিত নয়। ইসলামের বিস্তারের জন্য তোমাকে অবশ্যই লড়াই করতে হবে - এটা কুরআনেরই নির্দেশ।' [205] মধ্যযুগীয় উপাখ্যান লেখক, ইতিহাসবিদ এবং শাসকদের লেখা ও প্রাথমিক সাক্ষ্য-প্রমাণ অকপটভাবে ওসমানের দাবীকে আন্তরিকভাবে সমর্থন দেয়।

পরিশেষে এ কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, ভারতে বিধর্মীদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরিতকরণে যে পন্থা অনুসরণ করা হয়, তা ছিল সবচেয়ে নম্র প্রকৃতির। চলুন এ আলোচনার ইতি টানি এটা স্মরণ করে

---

[205]. Waddy, p. 94

যে, ইসলামের সবচেয়ে মহান আধ্যাত্মিক শক্তিধর প্রচারক নবী মুহাম্মদও তলোয়ার ব্যতীত তাঁর নিজের জ্ঞাতিবর্গসহ অন্যান্য আরব বিধর্মীদেরকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ধর্মান্তরিতকরণে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

Bibliography

Al- Tabari (1988) The History of Al-Tabari, State University of new York Press. New york, Vols. 6-10.

Al-Attas SN (1963) Some Aspects of Sufism as Understood and Practice Among the Malays, S Gordon ed., Malaysian Sociological Research Institute Ltd., Singapore

Armstrong K (1991) Muhammad: A Western Attempt to Understand Islam, Gollanz, London

Arnold TW (1896) The Preaching of Islam, Westminster?

Ashraf KM (1935) Life and Conditions of the People of Hindustan, Calcutta

Bernier F (1934) Travels in the Mogul Empire (1656-1668), Revised Smith VA, Oxford

Bostom AG (2005) The Legacy of Jihad, Prometheus Books, New York

Chadurah MH (1991) Tarikh-i-Kashmir, ed. & trans. Razia Bano, New Delhi

Clarence-Smith WG (2006) Islam and the Abolition of Slavery, Oxford University Press, New York

Eaton RM (1978) Sufis of Bijapur 1300-1700, Princeton University Press

Eaton RM (2000) Essays on Islam and Indian History, Oxford University Press, New Delhi

Elliot HM and Dawson J, The History of India As Told by the Historians, Low Price Publications, New Delhi, Vols. 1-8

Elst K (1993) Negationism in India, Voice of India, New Delhi

Esin E (1963) Mecca the Blessed, Medina the Radiant, Elek, London

Ferishtah MQHS (1829) History of the Rise of the Mahomedan Power in India, translated by John Briggs, D.K. Publishers & Distributors (P) Ltd, New Delhi

Fregosi P (1998) Jihad in the West, Prometheus Books, New York

Gibb HAR (2004) Ibn Battutah: Travels in Asia and Africa, D.K. Publishers, New Delhi

Glubb JB (Glubb Pasha, 1979) The Life and Times of Mohammad, Hodder & Stoughton, London

Goldziher I (1981) Introduction to Islamic Theology and Law, Trs. Andras & Ruth Hamori, Princeton

Habibullah ABM (1976) The Foundations of Muslim Rule in India, Central Book Depot, Allahabad

Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, trs. A Guillaume, Oxford University Press, Karachi, 2004 imprint

Ibn Warraq (1995) Why I am not a Muslim, Prometheus Books, New York

Khan M M (1987) Introduction, in the Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari, Kitab Bhavan, New Delhi

Lal KS (1973) Growth of Muslim Population in Medieval India, Aditya Prakashan, New Delhi

Lal KS (1995) Growth of Scheduled Tribes and Castes in Medieval India, Aditya Prakashan, New Delhi

Lal KS (1999) Theory and Practice of Muslim State in India, Aditya Prakashan, New Delhi

Lal, KS (1990) Indian Muslims: Who Are They, Voice of India, New Delhi

Levi S (2002) Hindus Beyond the Hindu Kush: Indian in the Central Asian Slave Trades, Journal of the Royal Asiatic Society, 12(3)

Levy R (1957) The Social Structure of Islam, Cambridge University Press, U.K.

Lewis B (2000) The Middle East, Phoenix, London

Maimonides M (1952) Moses Maimonides' Epistle to Yemen: The Arabic Original and the Three Hebrew Versions, ed. AS Halkin, Trans. B. Cohen, American Academy for Jewish Research, New York

Maududi AA (1993) Historical Background to Surah Al-Hashr, In Towards Understanding the Quran, (Trs. Ansari ZI), Markazi Maktaba Islamic Publishers, New Delhi

Milton G (2004) White Gold, Hodder & Stoughton, London

Moreland WH (1995) India at the Death of Akbar, Low Price Publication, New Delhi

Muir W (1894) The Life of Mahomet, London

N. Levtzion ed., Conversion to Islam, Holmes and Meier Publishers Inc., New York

Naik Z (1999) Was Islam Spread by the Sword? Islamic Voice, Vol. 13-08, No. 152

Nazami KA (1991a) The Life and Times of Shaikh Nizamuddain Auliya, New Delhi

Nazami KA (1991b) The Life and Times of Shaikh Nizamuddain Chiragh-I Delhi, New Delhi

Nehru J (1946) The Discovery of India, The John Day Company, New York

O'Leary DL (1923) Islam at the Cross Roads, E.P. Dutton and Co., New York

O'Shea S (2006) Sea of Faith: Islam and Christianity in the Medieval Mediterranean World, Walker & company, New York

Owen S (1987) From Mahmud Ghazni to the Disintegration of Mughal Empire, Kanishka Publishing House, New Delhi

Pipes D (1983) In the Path of God, Basic Books, New York

Pipes D (2003) Militant Islam Reaches America, WW Norton, New York

Pundit KN (1991) A Chronicle of Medieval Kashmir, (Translation), Firma KLM Pvt Ltd, Calcutta

Quran, The; http://www.cmje.org/religious-texts/quran/

Qureishi IH (1962) The Muslim Community of the Indo-Pakistan Subcontinent (610-1947), S-Gravenhage

Rabbi KF (1895) The Origins of the Musalmans of Bengal, Calcutta

Reid A (1983) Introduction: Slavery and Bondage in Southeast Asian History, in Slavery Bondage and Dependency in Southeast Asia, Anthony Reid ed., University of Queensland Press, St. Lucia

Reid A (1988) Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680, Yale University Press, New Haven

Rizvi SAA (1978) A History of Sufism in India, Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi

Robinson F (2000) Islam and Muslim History in South Asia, Oxford University Press, New Delhi

Roy Choudhury ML (1951) The State and Religion in Mughal India, Indian Publicity Society, Calcutta

Peters, R (1979) Islam and Colonialism: The Doctrine of Jihad in Modern History, Mouton Publishers, The Hague

Runciman S (1990) The Fall of Constantinople, 1453, Cambridge

Sachau EC (1993) Alberuni's India, Low Price Publications, New Delhi (first print 1888)

Sachau EC (2002) Alberuni's India, Rupa & Co., New Delhi (first print 1888)

Sahih Muslim by Imam Muslim, Translated by Siddiqi AH, Kitab Bhavan, New Delhi, 2004 edition

Said EW (1997) Islam and the west In Covering Islam: How the Media and Experts Determine How We See the Rest of the World, Vintage, London

Sharma SS (2004) Califs and Sultans: Religions Ideology and Political Praxis, Rupa & Co, New Delhi

Smith VA (1958) The Oxford History of India, Oxford University Press, London

Sobhy as-Saleh (1983) Mabaheth Fi 'Ulum al-Qur'an, Dar al-'Ilm Lel-Mayayeen, Beirut

Tagher J (1998) Christians in Muslim Egypt: A Historical study of the Relation Between Copts and Muslims from 610 to 1922, Trs. Makar RN, Oros Verlag, Altenberge

Triton AS (1970) The Caliphs and Their Non-Muslim Subjects, Frank Cass & Co. Ltd., London

Umaruddin M (2003) The Ethical Philosophy of Al-Ghazzali, Adam Publishers & Distributors, New Delhi

Van Nieuwenhuijze CAO (1958) Aspects of Islam in Post-Colonial Indonesia, W van Hoeve Ltd., The Hague

Waddy C (1976) The Muslim Mind, Longman Group Ltd., London

Walker B (2002) Foundation of Islam, Rupa & Co, New Delhi

Warren JF (1981) The Sulu Zone, 1968-1898: The Dynamics of the External Slave Trade, Slavery and Ethnicity in the Transformation of a Southeast Asian Maritime State, Singapore University Press, Singapore

Watt WM (1961) Islam and the Integration of Society, Routledge & Kegan Paul; London

Watt WM, Muhammad in Medina, Oxford University Press, Karachi, 2004 imprint

Widjojoatmodjo RA (1942) Islam in the Netherlands East Indies, in the Far Eastern Quarterly, 2 (1)

Zwemer S (1908) Islam: A Challenge to Faith, New York